দশকুমার চরিত

মহাকবি দণ্ডী

অনুবাদ :

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

প্রথম 'রূপা' সংস্করণ
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক :
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১
১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

মুদ্রক :
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০০৯

আমার জ্যেষ্ঠ-পুত্র

শ্রীমান সন্দীপকুমারের

কল্যাণ-কামনায়

॥ ক থ ক তা ॥

প্রশ্ন উঠেছে—কে এই 'দণ্ডী' ?

বিভিন্ন উত্তর ভেসে আসছে…কানে।

জার্মান আচার্য উইলসন (১৮৪৬) মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলছেন,

"কে, কবে, কোথায়…এই নিয়েই যত গোলমাল! আমার কিন্তু মনে হয়, উনি একজন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। হতে পারে ওঁর গল্পগুলির মধ্যে ধর্মমোক্ষের কোন বালাই নেই, তবু পড়লে মনে হয়, উনি একজন ধার্মিক।…গল্পগুলির কল্পনায় সুখে বিভোর হয়ে বোধ হয় অবসর-বিনোদন করতেন। একাদশ শতাব্দীর কবি।"

জার্মান আচার্য বুহ্লার (১৮৭৩) বলছেন,

"না, উনি ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি। আমার হাতেই তো প্রথম এসে পড়ে 'দশকুমারচরিতে'র পুরো পুঁথি—শতাব্দী-প্রাচীন।…নাসিকের "গোবিন্দ শাস্ত্র নিরন্তর" আমাদের পড়তে ধার দিয়েছিলেন ঐ পুঁথি।"

ইংরেজ আচার্য পিটরসন (১৮৯১) বলেছেন,

"ডক্টর বুহ্লার আর আমার এটি একটি রত্ন-উদ্ধার।…এখন মুশকিল হয়েছে কি জানেন? দণ্ডীর আর একখানি পুঁথি পাওয়া গেছে—'কাব্যাদর্শ,' সেটি অলঙ্কারশাস্ত্র।…দুই দণ্ডী, না, এক দণ্ডী—এই নিয়েই সমস্যা।…আবার ওদিকে কাশ্মীরের কবি রাজশেখর বলছেন, 'ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ।'—দণ্ডীর তিনটি প্রবন্ধ! এখন 'দশকুমারচরিত' পাওয়া গেছে, 'কাব্যাদর্শ' পাওয়া গেছে,…তৃতীয় প্রবন্ধটি তা হ'লে কোথায়? সমস্যারই কথা। তবে এই 'দশকুমারচরিতে'র পুঁথিখানার মধ্যে দুটি প্রবন্ধ পাই—"পূর্বপীঠিকা" আর "অথ দশকুমারচরিতম্'। এক পাখীর দুটি ডানা। এ নিয়েই তা হ'লে তিন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' যখন কবি দণ্ডীর নাম পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমাদের 'দশকুমারচরিতে'র দণ্ডীটি হতেও পারেন বাণভট্টের পরের কবি। 'বামনে'র পরে যে ইনি এসেছেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ…এঁর লেখনীর বৈদর্ভী রীতি থেকে। ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি ইনি।"

জার্মান আচার্য ওয়েবর (১৯১৪) সোচ্ছ্বাসে বলছেন,

"হিন্দুদের গল্প-রচনের গড়নটিই আলাদা। এ যেন একটি নায়কী ফ্রেমের মধ্যে আর একটি ফ্রেম, তার মধ্যে আর একটি, তার মধ্যে আর একটি···চলেইছে। আর সেই এক একটি মধ্য-ফ্রেমে আঁটা হয়ে চলেছে হরেক রকমের গল্প···অদ্ভুত গল্প। আরবী, পারসী, পশ্চিমী—রূপকথা ও আষাঢ়ে গল্পগুলোর উৎপত্তিস্থল এই হিন্দুদের গল্পকল্পনা। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' তাদের মধ্যে ভাবের আর উদ্দাম কল্পনার এক পুষ্পবন। কী যে নেই তাতে জানি নে। কুমারদের চুরিবিদ্যাও শেখানো হয়েছে তাতে,···কলাবিদ্যার যেন পাঠ!"

ভারতীয় আচার্য আগাশে (১৯১৯) বলছেন,

"নৈতিকতার দিক দিয়ে দণ্ডীর গল্প নিতান্তই অপরাধী। তবে হ্যাঁ, লিখেছেন বটে গল্প। আমাদের দেশে নবম শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত 'দশকুমারচরিত'··· অজ্ঞাত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দণ্ডীর গল্পসার-সংগ্রহ কেউ কেউ করেছেন, কেউ বা উল্লেখ করেছেন তাঁর নাম।···একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতেই দণ্ডীর আবির্ভাব মনে হয়।"

বিভিন্ন মতবাদ আরও অনেক রয়েছে অনেকের।

এই-হেন গবেষণার গোলক ধাঁধার মধ্যে আমিও বিব্রত হয়ে পড়েছি। দণ্ডী কে?"—এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে আমি অপারগ। আমি প্রত্নতাত্ত্বিক নই, অনুবাদক মাত্র, আমার কাছে দণ্ডী কেবল একটি কবি,—তপস্যানিষ্ঠ এবং তপস্যাসিদ্ধ। সে-ই যথেষ্ট।

কিন্তু তিনি যে কতদিনের পুরনো কবি—সে বিষয়ে আমার মধ্যে ধীরে ধীরে জেগেও তো উঠতে পারে একটি নবীন ধারণা। জ্ঞাপন করাই বিধেয়।

গ্রন্থের 'দীনার' শব্দের প্রয়োগটি আমাকে বিচলিত করেছে। সাধারণত আমরা মনে করি, সংস্কৃত ভাষায় ঐ দীনার-শব্দটি প্রবেশ করেছে মুসলিম একাদশ শতাব্দী থেকে। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর 'পঞ্চতন্ত্রে'ও ঐ শব্দটির অবস্থান রয়েছে। আবার এদিকে দীনার শব্দটির উৎপত্তি···**denarius**—গ্রীক শব্দ থেকে! অতএব, অথৈ অবস্থা।

'যবন' শব্দের ব্যবহার গ্রীক অর্থে নেওয়াই সঙ্গত।

তৃতীয় উচ্ছ্বাসে আর একটি নাম-বাচক শব্দ পাওয়া যায়—'খনতি'। পাঠান্তর পাওয়া গেছে 'খানেতি'। অতএব অনেকে ঐ মুসলিম 'খান' শব্দ থেকে দণ্ডীর একাদশ-শতাব্দীবর্তিত্বই কল্পনা ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু ধ্বনিমূলে পাঠ করলে, সহজেই ধরা পড়ে…'খনতি' পাঠই সিদ্ধ। নামটি গ্রীক বা ফারসী শব্দও হতে পারে।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে 'রামেষু' শব্দ…'র‍্যামিউস্'-জাতীয় গ্রীক-শব্দের অপভ্রংশও হতে পারে।

সর্বশেষে, অষ্টম উচ্ছ্বাসের 'ইদানীং' শব্দটি। রাজার মোসায়েব 'বিহারভদ্র' তামাশা ক'রে প্রমদা-সভায় বলছেন :

"মৌর্যদের হিতার্থে আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত ইদানীং ছ হাজার শ্লোকে সেটিকে সংক্ষিপ্ত ক'রে ফেলেছেন। (দণ্ডনীতিম্।…ইয়মিদানীমাচার্যবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্যার্থে ষড়ভিঃ শ্লোকসহস্রৈঃ সংক্ষিপ্তাঃ)।"

সংস্কৃত 'ইদানীং' শব্দের অর্থ 'একান্তই ইদানীং'—আট শো বছর পরের কবি কখনও এরূপ স্থলে ইদানীং শব্দটি প্রয়োগ করতে পারতেন না। তাঁর কাছে তখন বিষ্ণুগুপ্তকে হতেই হবে 'ফসিল'।

তাই আমার মনে হয় দণ্ডী হয়তো ছিলেন আচার্য বিষ্ণুগুপ্তের সমসাময়িক… খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগেব মানুষ। প্রাচীন বরাহমিহিরও উল্লেখ করেছেন 'বিষ্ণুগুপ্তে'র নাম। 'দশকুমারচরিতে' বাৎসায়ন ও চাণক্যের অদ্ভুত প্রভাবটিও সমর্থন করে আমার পূর্বপক্ষ। এবং 'দশকুমারচরিতে'র সু-বর্ণিত সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক দীন পরিচয়,—ইঙ্গিত করে দণ্ডীর উক্ত শতাব্দীবর্তিত্ব।

এই নবালোকে বিষয়টির মীমাংসার প্রতি আমি আকর্ষণ করি প্রত্নতাত্ত্বিকদের সুধী দৃষ্টি।

এই মানস-কথাই আজ আমাকে নিয়ে চলেছে—সেই শতাব্দীতে, যেখানে… রাজপরিবার-সংক্রান্ত রূপকথায় বা নীতিশাস্ত্রে বা কাহিনীতে, রাজপুরীর ক্রূরতা খলতা ব্যভিচারিতার উদাহরণের অভাব নেই, নাগরিক যৌবনের বালিশতায় যেখানে এক স্বাধীন কোটিপতি সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও উচ্ছল, এবং যেখানে অস্ত্রশস্ত্রের ও ক্ষাত্রতেজের পূর্ণ ছড়াছড়ি। সেদিনের সেই সমাজের এক সংযত বর্ণাশ্রমী,

ব্রাহ্মণ কবির ছবিই আমার চোখে ভাসছে। এই গ্রন্থে সেই কবি 'দণ্ডী'ই যেন স্নেহাচ্ছন্ন চোখে দেখছেন—তাঁরই সমাজের এক বিকারগ্রস্ত অধোগতি; এবং লিখছেন…তার বিবরণ ও সাহিত্যিক প্রতিবাদ। মহর্ষি চ্যবনমুনিরও বিভ্রান্তিজনক এক হীন সমাজ-ব্যবস্থা যেন আঘাত করেছে তাঁর কবি-দৃষ্টিকে, এবং তিনি তার প্রতিবিধান করতে উদ্যত হয়েছেন এক বিচিত্র উপায়ে। সংযত ও বলিষ্ঠ ভাষার মাধ্যমে সমাজের চোখে তিনি তাই ছুঁড়ে মেরেছেন বাৎসায়নের 'কামসূত্রে'র ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র শুচি-শুদ্ধতা। গ্রন্থ-প্রণামের প্রাথমিক 'দণ্ড'-শব্দটি থেকেই তিনি দণ্ড-ধারী কবি-'দণ্ডী'।

পাণিনির 'মহাভাষ্যে'র চিত্র-সরল ভাষা-নৈপুণ্যের যেন রসিক-সংস্করণ… দণ্ডী-কবির এই কাব্যভাষা। প্রাকৃত শব্দের নামগন্ধও এতে নেই। ভাষার প্রাচীনতাই প্রকাশ পেয়েছে বহু শব্দের আর্ষপ্রয়োগে। নবসমাজ-সৃষ্টিকামী কর্ণকুণ্ডলধারী জনৈক রস-প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ…আমার এই কবিটি। এই আমার চিত্র-ধারণা।

'সাঁটে-কথা-কওয়া'র মতো তাঁর ঐ 'চাঁচা' ভাষা আমায় মুগ্ধ করেছে। অতএব, আমার এই…'দশকুমারচরিত'-খানির মহাপ্রকাশ-প্রযত্ন। আমার ভাল-লাগাটিকে যদি এখন এই অনুবাদ-সখী বহন ক'রে নিয়ে যান পাঠক-শ্রোতার ভাল-লাগাটির দ্বারে, তা হ'লেই আমি সার্থক।

অনুবাদ-রচনায় আমায় একদা অনুপ্রাণিত করেছিলেন আমার প্রিয়-সখা শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ও ব্রতী করেছিলেন আমার সাহিত্য-সখা 'বসুমতী'-মাসিকপত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, এবং প্রকাশে সাহায্য করেছেন সুহৃদ্বর শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের আলিঙ্গন জানিয়ে এখন তবে আরম্ভ করি গল্পমন্ত্র…'ব্রহ্মাণ্ড-ছত্র-দণ্ড…'। শুনুন, ভারতসাহিত্যের কীটদষ্ট দুখানি পুঁথির…পাতার…কাব্য…

৩৫, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
১লা শ্রাবণ ১৩৬৩

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দশকুমার চরিত

রূপকের মধ্য দিয়ে যাঁর প্রতীতি,—
যিনি—
ব্রহ্মাণ্ড-ছত্রের দণ্ড,
ব্রহ্মভবন অরবিন্দের মৃণালদণ্ড,
ধরণী-তরণীর কূপদণ্ড,
মন্দাকিনীর পট্টিকা-কেতুদণ্ড,
জ্যোতিশ্চক্রের অক্ষদণ্ড,
ত্রিভুবন-বিজয়ের স্তম্ভদণ্ড, এবং যিনি
দেবশত্রুদের কালদণ্ড,
সেই ত্রিবিক্রম শ্রীবিষ্ণুর প্রসিদ্ধ অঙ্ঘ্রি দণ্ড
তোমাদের মধ্যে বিতরণ করুক কল্যাণ ॥

পূর্বপীঠিকা

প্রথম উচ্ছ্বাস

মগধের রাজধানীর নাম 'পুষ্পপুরী'। এই পুষ্পপুরী নগরীর কষ্টিপাথরে যাচাই করা হ'ত দেশের অন্য সমস্ত নগর নগরীর মূল্য। দোকানে দোকানে ছড়াছড়ি; পণ্যের ভারে দোকান যেন ভেঙে পড়েছে; থরে থরে সাজানো রয়েছে মণিমুক্তার বিপুল সম্ভার; মহিমায় যেন একটি রত্নাকর।

সেখানকার রাজা ছিলেন—শ্রী'রাজহংস'।

আকাশ-হংস সূর্যই তাঁর একমাত্র তুলনা। শত্রু-সন্তাপী কী তাঁর রুদ্র প্রতাপ! সমুদ্রমন্থী মন্দর-পাহাড়ের মতো সমুদ্দণ্ড ছিল তাঁর ভুজদণ্ড। এবং কী আয়াসহীন বিক্রমেই, উত্তাল তরঙ্গের মতো শত্রু-সমুদ্রের তুরঙ্গ-কুঞ্জর-মকর-সমান বীর যোদ্ধাদের মাতিয়ে দিয়েই না সেটি ঘুরত! দিগন্ত পূর্ণ ক'রে সৌরভের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর অতিশুভ্র কীর্তি। সে শুভ্রতার সঙ্গে তুলনা দিতে হ'লে ডেকে আনতে হয়—শরতের চাঁদকে, কুন্দ-কাশ-ঘনসারকে, নীহারকে, মরালকে, ঐরাবতকে, গিরীশের অট্টহাস্যকে। রাজার কীর্তিগাথা বারংবার গান ক'রে বেড়াত ইন্দ্রপুরীর তরুণ অপ্সরাদের দল।

ভাগ্যবান ছিলেন বটে নৃপতি রাজহংস। যে ধরণীর শিখরদেশে জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলে রত্নসুমেরু, সমুদ্রের বেলা-বলয় যার মেখলা—সেই হেন ধরণী-রমণীর সৌভাগ্য-উপভোগে যিনি ভাগ্যবান, তাঁকে আর অন্য কোন্ বিশেষণে বিশেষিত করা চলে? এত সম্ভোগের মধ্যেও যাগযজ্ঞে এবং বিদ্যায় ছিল রাজার বিশেষ আকর্ষণ; এবং তাঁর

চতুর্দিকে মোহবিস্তার ক'রে রাখত শিষ্ট বিশিষ্ট অনেক প্রতিভা। দেহসৌষ্ঠবের কথা এখনও বলা হয়নি রাজহংসের। বেশি বলব না; এই বললেই চলবে—ঘনদর্প কন্দর্পের সৌন্দর্যসহোদর ছিল তাঁর অনবদ্য হৃদয়গ্রাহী রূপ।

রূপের বর্ণনায় যখন পৌঁছোনো গেছে তখন আমাদের ক্ষণেক থামতেই হবে রাণী বসুমতীতে,—লীলাবতীকুলের যিনি শেখরমণি। মহেশ্বরের নয়নবহ্নিতে যখন ভস্মীভূত হয়েছিলেন শ্রীমদন, তখনই বোধ হয়, ভয়ে—মদনের ভ্রমরগুলি রূপায়িত হয়ে গিয়েছিল বসুমতীর কেশকলাপে,

মদনের প্রেমের খনিখানি—বসুমতীর পদ্মজয়ী মুখে,

তাঁর জ্যা—বসুমতীর ভ্রূভঙ্গিতে,

তাঁর জয়ধ্বজের মীন দুটি—বসুমতীর জোড়া চোখে,

তাঁর সেনা মলয়-সমীর, নবপল্লব এবং জয়শঙ্খ,—বসুমতীর নিঃশ্বাসে, অধরবিম্বে এবং লাবণ্যধর গ্রীবায়,

তাঁর রথের পূর্ণকুম্ভ দুটি—বসুমতীর চক্রবাকের মতো স্তনযুগে,

তাঁর কর্ণের কহ্লার—বসুমতীর গঙ্গার আবর্তের মতো নাভিতে,

তাঁর যোগীজয়ী জৈত্ররথ—বসুমতীর অতিঘন জঘনে,

এবং তাঁর অস্ত্রভূত ফুলদল রূপায়িত হয়ে গিয়েছিল বসুমতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনবদ্যতায়।

অমরাবতীর চেয়েও সুন্দরী এই পুষ্পপুরী নগরীতে, অনন্ত ভোগের মধ্যে লালিত হয়ে সুখে বাস করতেন রাণী বসুমতী। এবং শ্রীরাজহংসও সুখী হয়েছিলেন বসুমতীর মতোই তাঁর রাণী বসুমতীকে লাভ ক'রে।

রাজহংসের রাজকার্যসাহিত্য ধীর প্রজ্ঞার সঙ্গে বিচার ক'রে দেখতেন তিন জন পরমবিধান অমাত্য—ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব, এবং সিতবর্মা।

সিতবর্মার দুটি পুত্র—সুমতি ও সত্যবর্মা। ধর্মপালের তিনটি পুত্র—সুমন্ত্র, সুমিত্র ও কামপাল। এবং পদ্মোদ্ভবের দুটি পুত্র—সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব। সর্বসাকুল্যে সাতটি পুত্র।

এই পুত্রসমষ্টির মধ্যে সত্যবর্মা ছিল অত্যন্ত ধর্মশীল। একদা তার মনে হ'ল, সংসারের কোথাও তো কিছু সার দেখি না; তীর্থযাত্রায় চ'লে গেল তার মন, এবং সে হ'ল তাই দেশান্তরী।

কামপাল বড় হয়েই দুবির্নীত হয়ে উঠল;—তার চারদিকে কেবল বিট, নট এবং বারাঙ্গনাদের ভিড়। অগ্রজ দু'ভায়ের শাসন সে মানল না;—শেষে একদিন বেরিয়ে পড়ল পৃথিবীতে,—চরতে।

রত্নোদ্ভবও অন্য ধরনের লোক ছিল। তার মন ব'সে গেল বাণিজ্যে। নিপুণ হয়ে উঠল সে। বাণিজ্যে সাফল্যলাভের আশায় তাকে চ'লে যেতে হ'ল সমুদ্রের পরপারে।

মহাকালের অনুশাসনে একে একে ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব এবং সিতবর্মাকেও চ'লে যেতে হ'ল স্বর্গধামে। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের চারটি পুত্র কুলামাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলেন।

কিছু দিন গত হয়েছে। মধ্যে মগধরাজ্যে অবিশ্রান্ত চলেছিল যুদ্ধের আয়োজন, অস্ত্র-সংগ্রহ। রাজন্যেরা অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে কত যে বিচিত্র ভীষণ ভীষণ অস্ত্র রচনা ক'রে ফেলেছিলেন তারও ইয়ত্তা নেই। সেই সব অস্ত্র রাজন্যদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, চতুরঙ্গবল সঙ্গে নিয়ে, যেন শেষনাগের ফণা কাঁপিয়ে, হঠাৎ একদিন মগধনায়ক শ্রীরাজহংস সংগ্রামাভিলাষে রূঢ়রোষে বেরিয়ে পড়লেন; হেলাভরে আক্রমণ করলেন মালবনাথ 'মানসার'কে। হাঁ, মান-সারই বটে। উৎকট মান ছাড়া আর কী কিছু সার রয়েছে তাঁর? হঠাৎ উঠল রণভেরীর ঝঙ্কার,—সমুদ্রগর্জনের চেয়েও ভীষণগম্ভীর সেই ঝঙ্কারের অহঙ্কার। সেই হঠ-নির্ঘোষের আক্রমণে ভয়ে চণ্ডমূর্তি ধারণ করল

দিক্‌হস্তীদের বলয়। কিন্তু মালবরাজ মানসার হ'টে যাবার পাত্র নন। নব নব অভিযানে তিনিও বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ;—সাধ মেটেনি যুদ্ধের। অসংখ্য হস্তিসেনার শিরোভাগে মূর্তিমান সংগ্রামের মতো সাগ্রহে তিনিও পড়লেন বেরিয়ে।

তুই সেনা যখন মিলিত হ'ল রণস্থলে, রণসম্মর্দে, তখনকার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব, এবং আমি মনে করি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর। কাব্য হিসাবে শুধু বলতে পারি—সেই শস্ত্রের উপর শস্ত্র, সেই হস্তের উপর হস্ত, সেই সংগ্রাম, সেই সংঘর্ষধ্বনির উপরে, সেই মৃত্যুবাহুল্যের মধ্যে, কবির চোখে পড়েছিল একখানি দেবপ্রয়াণ পথ ; সেই পথখানি যেন নির্মিত হয়ে গিয়েছিল তুরঙ্গ-ক্ষুর-ক্ষুণ্ণ পৃথিবীর ধূলিজালে ; এবং সেই পথখানির শেষে ধূলিযবনিকার অন্তরালে যেন নববল্লভ বীর সন্তানদের সংবর্ধনার্থ, বরণমাঙ্গলিক হাতে নিয়ে,—দাঁড়িয়ে ছিলেন মোহিন দিব্য-কন্যারা।

শেষ পর্যন্ত পরাজয় হ'ল মালবরাজ মানসারের। ক্ষীণ হয়ে গেল তাঁর সৈন্যবল। মানসার বন্দী হলেন। মগধরাজ রাজহংসের মুঠোর মধ্যে এল তাঁর জীবন। কিন্তু মগধরাজ কৃপালু হয়েই,—শত্রু মানসারকে প্রতিষ্ঠাপিত ক'রে দিলেন মালবরাজ্যতেই। শান্তি নামল নিখিল রাজত্বে। রত্নাকর-মেখলা এই নিখিল পৃথিবী রাজহংসের এখন আয়ত্তাধীন।

কিন্তু রাজহংসের সন্তান ছিল না। তাই তিনি তাঁর মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে দিলেন—একমাত্র যিনি কারণ—সেই নারায়ণের আরাধনায়।

তুঃখের পর সুখের মতো একদা তাঁর অগ্রমহিষী বসুমতী—ভোর হয় হয় এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন—কে যেন তাঁকে বলছে—"নাও, নাও এই কল্পলতার ফল।" বসুমতীর হ'ল গর্ভসঞ্চার। সারা রাজত্বে, আনন্দ যেন আর ধরে না ; যেন খুলে গেল ইন্দ্রের ভাণ্ডার। যেখানে

যে আছে সুহৃৎ, যেখানে যে আছে রাজন্, সবাই আহূত হলেন। আনন্দিত আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল মহারাণীর সীমন্ত-মহোৎসব।

একদা সভায় সিংহাসনে সমাসীন রয়েছেন গুণাধীশ রাজহংস এবং তাঁকে বেষ্টন ক'রে রয়েছেন সুহৃদ্‌বর্গ, মন্ত্রিপুত্রেরা এবং পুরোহিত,—এমন সময় দ্বারপাল ললাটে বদ্ধাঞ্জলি ন্যস্ত ক'রে নিবেদন করল, "হে দেব, মহারাজের দর্শন-কামনায় জনৈক সাধু দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি পূজার যোগ্য।"

অনুমতি এল। সেই সংযমী সাধুটি তখন ধীরে নীত হলেন রাজসমক্ষে সভায়। সাধুটির গতিভঙ্গি দেখেই রাজহংস তখনি বুঝে নিলেন সমস্ত ব্যাপার। ইঙ্গিতে অন্তর্হিত হ'ল সমস্ত অনুচর। কেবল সভায় র'য়ে গেলেন মন্ত্রীরা। সাধুটি আর কেউ নয়,—ছদ্মবেশী এক গুপ্তচর। তার প্রণাম শেষ হ'ল। মৃদু হেসে তাকে রাজহংস জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে তাপস, দেশ-দেশান্তর তো তুমি ঘুরে এলে ছদ্মবেশে; কী সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনলে?—দ্বিধা ক'রো না বলতে।"

বঙ্কিম হয়ে গেল গুপ্তচরের ভ্রূ। ললাটে একটি চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলে অঞ্জলি রচনা ক'রে সে বললে:

"মহারাজের আদেশ শিরোধার্য ক'রে নির্দোষ তাপসবেশে—আমি মালবেন্দ্রনগরে প্রবেশ করেছিলুম। সেখানে নিতান্ত গুপ্তভাবে অবস্থান ক'রে, আমি মালবরাজের জ্ঞাতব্য যাবতীয় বৃত্তান্ত বিশদ্ অবগত হয়ে তবে ফিরে এসেছি। এতকাল মানসার পরাজয় স্বীকার ক'রে প্রবল নৈরাশ্যের ভিতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। দেহের সমস্ত কষ্ট মন থেকে নির্দয়ভাবে দূর ক'রে দিয়ে মহাকাল-নিবাসী কালী-বিলাসী অনশ্বর মহেশ্বরের আরাধনায় এত কাল ছিলেন মগ্ন। কিন্তু মহারাজ তপঃপ্রভাবে এত দিনে মানসার তুষ্ট করতে পেরেছেন মহেশ্বরকে।

ফলে, তিনি লাভ করেছেন এক ভয়ঙ্করী গদা, 'বীরারাতিঘ্নী' তার নাম। গদা লাভ ক'রে মানসার নিজেকে বিবেচনা করছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সম্প্রতি বিরাট অভিমানের বশবর্তী হয়ে তিনি আপনার বিরুদ্ধে বিপুল অভিযানের উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এখন মহারাজ যা ভাল বিবেচনা করেন।"

বৃত্তান্ত শুনে মন্ত্রীরা মন্ত্রণায় বসলেন। তার পরে কর্তব্য স্থির ক'রে মহারাজকে উপদেশ দিলেন ঃ

"মহারাজ, দৈববলে বলী হয়ে শত্রু আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করছে। দেবতা যেখানে সহায়, মানুষ সেখানে নিরুপায়। আমাদের পক্ষে যুদ্ধসংসর্গ এখন সমীচীন ব'লে বিবেচনা করি না। সহসা দুর্গ-সংশ্রয়ই বিধেয়।"

মন্ত্রীরা রাজহংসকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু অখর্ব-গর্বভরে রাজহংস অগ্রাহ্য করলেন তাঁদের উপদেশ। আদেশ দিলেন—'রণসজ্জা', 'প্রতিযুদ্ধ'।

এদিকে মানসার নীলকণ্ঠ-দত্ত সেই 'বীরারাতিঘ্নী' গদাটির আনুকূল্যে রণসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে অক্লেশে প্রবেশ করলেন মগধরাজ্যে।

সন্দেহাতীতভাবে মানসারের অভিযানের সংবাদ শুনে, রাজপুরীতে মন্ত্রীরা অবহিত হয়ে উঠলেন। মগধরাজ শ্রীরাজহংসকে তাঁরা অনেক করলেন অনুনয়। শান্ত করতে পারলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটি উপকার করতে পেরেছিলেন রাজকুলের। শত্রু যেখানে প্রবেশ করতে পারে না, বিন্ধ্যাটবীর এমন একটি নিরাপদ স্থানে তাঁরা মূলসৈন্যবলের সাহচর্যে সরিয়ে ফেললেন শ্রীরাজহংসের অবরোধ—মহিষী, সন্তান-সন্ততি।

দৈবের দিব্যাস্ত্রের সম্মুখেও অপরাজিত রইল রাজহংসের চিত্ত; অপরাজিত অ-দীন রইল সৈন্যদের আগ্রহ; মৃত্যুর প্রশস্ততার মধ্য

দিয়ে তারা তীব্রগতিতে অতিরোষে রুদ্ধ করল শক্রর অভিযান। তারপরে ঘ'টে গেল আশ্চর্য এক যুদ্ধ! দেবরাজ ইন্দ্রের মতো যুদ্ধ করতে লাগলেন রাজহংস; বিচিত্র আয়ুধের এবং বাণের স্থিরমুক্তি সত্ত্বেও জয়াকাঙ্ক্ষী মালবরাজকে তিনি ব্যাহত করতে পারলেন না। নীলকণ্ঠদত্ত বীরারাতিঘ্নী গদা—মানসারের হাত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রচার ক'রে দিল মহেশ্বরের শাসনের অবন্ধ্যতা। মৃত্যু হ'ল মহারাজ রাজহংসের সারথির এবং মহারাজ নিজে হলেন সংজ্ঞা-হীন। তাঁর রথের তুরঙ্গদল—মুখে বল্‌গা নেই, অক্ষত তাদের অঙ্গ, মূর্ছিত মহারাজকে বহন ক'রে নিয়ে দৈবগতিকে প্রবেশ করল সেই মহারণ্যে সেই বিন্ধ্যাটবীতে, সেখানে স্থাপিত হয়েছিল মহিষীদের অবরোধ।

জয়লক্ষ্মী বরণ ক'রে নিলেন মালবরাজকে। মানসার প্রবেশ করলেন পুষ্পপুরীতে; প্রজা এবং দেশ অবনত হয়ে স্বীকার করল তাঁর প্রভুত্ব।

এদিকে মহারাজ রাজহংসের রণক্লান্ত অমাত্যেরা—যাঁরা কোনো-ক্রমে প্রাণে গিয়েছিলেন বেঁচে—তাঁরা—রাত্রি-শেষের বাতাসে সংজ্ঞালাভ ক'রে কোনোমতে আশ্বস্ত হয়ে চতুর্দিকে খুঁজতে লাগলেন মহারাজকে। কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না। মাথা নীচু ক'রে দীনের মতো তখন অমাত্যেরা উপস্থিত হলেন রাণী বসুমতীর নিকটে। তাঁদের মুখে নিখিল সৈন্যক্ষতি এবং রাজহংসের অদৃশ্য হওয়ার বার্তা শ্রবণ ক'রে বসুমতী মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারলেন না। শোকের তরণী তলিয়ে গেল পাথারে। তিনি স্থির করলেন "স্বামীর অনুমরণ—এই স্ত্রীর ধর্ম।"

ভাষণের ভূষণে শীর্ণযুক্তিগুলিকে বিভূষিত ক'রে, অনেক মিনতি এবং অনেক অনুনয়ের শেষে অমাত্য এবং পুরোহিতেরা বললেন:

"কল্যাণি, মহারাজ রাজহংসের মৃত্যু এখনও অনিশ্চিত। তার উপর আর একটি সংবাদ আপনাকে আমাদের জানাবার রয়েছে। দৈবজ্ঞেরা জানিয়েছেন—অদূরভবিষ্যতে আমাদের রাজবংশে মহারাজের ঔরসে ও আপনার গর্ভে যে সুকুমার কুমার জন্মগ্রহণ করবেন, সেই কুমারই একদা উদ্ধত শত্রুদের মথিত ক'রে সার্বভৌম নরপতিত্ব লাভ করবেন। সুতরাং এখন আপনার অনুমরণের অভিলাষ, আমাদের মতে, অনুচিত।"

তাঁদের শেষ যুক্তি কর্ণে গ্রহণ করলেন রাণী বসুমতী, কিন্তু যেন মূর্ছার মধ্য দিয়ে। কোনো কথা বললেন না, স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

তার পরে এল রাত্রি। রাত্রির অর্ধেক যখন অতিবাহিত হয়ে গেছে, নিদ্রায় নিলীঢ় হয়ে রয়েছে পরিজনদের নেত্র, শব্দের লেশমাত্র নেই সেনানিবেশে কোথাও, চারিদিকে কেবল বিরাজ করছে একখানি অনাবিল বিজনতা,—দেবী বসুমতী নূপুরহীন-পদ-সঞ্চারে বেরিয়ে এলেন অবরোধের মধ্য থেকে। দীর্ঘ শাখা বিস্তার ক'রে নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল একটি বিজন বট। মরণ-রেখার মতো বটের সেই শাখা। সেই শাখায় ওড়নার আধখানি বেঁধে মহারাণী নিরঙ্কুশ করলেন মৃত্যুর পথ। কিন্তু তখনি চলতে পারলেন না সেই পথে। কেঁদে ফেললেন, গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলেন। কণ্ঠের বাক্য-মাধুরীকে বিরস ক'রে দিয়ে, বেরিয়ে এল এক প্রলাপ ঃ

"একদিন ফুলের ধনুক নিয়ে লাবণ্যের কন্দর্পের মতো তুমি এসেছিলে—আজ বিদায়ের সময়—দেখা হ'ল না—জন্মান্তরে যেন তেমনি ক'রেই তোমায় পাই।"

কিন্তু—যে বটবৃক্ষটির তলদেশে এই মৃত্যুপ্রবন্ধ চলেছিল, মহারাণী জানতেন না—সেইখানেই ভাগ্যদেবের লীলায়, পলায়নপর তুরঙ্গেরা মহারাজ রাজহংসের সংগ্রাম-রথখানিকে বহন ক'রে নিয়ে এসেছে এবং সেইখানেই চন্দ্রদেবের শীতল কিরণের সুখস্পর্শ লাভ ক'রে

জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন মহারাজ; যদিও প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়াতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর আঙ্গিক সমস্ত চেষ্টা। মহারাণীর বিলাপ শুনেই রাজহংস বুঝতে পারলেন—কার এই কণ্ঠস্বর! তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল। তার পর নিত্যকালের আদরের আহ্বানখানি—তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে গেল—মর্মের দিকে বসুমতীর। চমকে উঠলেন বসুমতী। দৌড়ে এলেন। দেখতে পেলেন।

একেই কি বলে আনন্দ? এই-ই কি সেই আনন্দ, যা দুঃখঝঞ্ঝার মধ্যেও ফুটন্ত পদ্মের একখানি ছবি এঁকে দিয়ে যায় মুখে? ভুল ক'রেও আর পড়ছে না তো চোখের পাতা? চোখ দিয়ে দেখা নয়—এ যেন চোখের মধুপান! কণ্ঠ আপনা হ'তেই তার ধর্ম-ধ্বনি উচ্চারণ করল।

অমাত্যেরা পুরোহিতেরা শুনতে পেলেন সেই ধ্বনি। দৌড়িয়ে এলেন সকলে। মহারাণী এবং মহারাজকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ললাট দিয়ে তাঁরা ভজনা করলেন মহারাজের চরণপদ্ম, ভাষা দিয়ে তাঁরা প্রশংসা করলেন দৈবমাহাত্ম্য। অমাত্যেরা বললেন, "মহারাজ, নিশ্চয় সারথির মৃত্যুর পরেই, রথ নিয়ে তুরঙ্গেরাই মহারাজকে অতিবেগে অরণ্যের মধ্যে নিয়ে এসেছে।"

রাজহংস তাঁদের বললেন, "সংগ্রামে আমার সমস্ত সৈন্য নিহত হয়েছে। শঙ্করদত্ত গদাটিকে নিক্ষেপ ক'রে আমাকে নির্মম আঘাত করেছিল মালবরাজ; আমি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলুম। নিশান্ত বাতাসে এখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছি।"

রাজহংসকে ফিরে পাওয়াতে আনন্দের আতিশয্যে মন্ত্রীবৃন্দের মনে হ'ল, দৈব এবার সুপ্রসন্ন হয়েছেন;—তাই তাঁরা উৎসবের মধ্যে দিয়েই মহারাজকে শিবিরে নিয়ে গেলেন। তাঁর অঙ্গ থেকে শল্যগুলিকে অতি যত্নে মুক্ত ক'রে নেওয়া হ'ল এবং পরিজনদের মুখ-পদ্মে আনন্দ ফুটিয়ে শ্রীরাজহংস হলেন ব্রণ-হীন।

শল্য এবং ব্রণের যাতনার লাঘব হ'ল বটে, কিন্তু বৃদ্ধি পেল মহারাজের মানসিক যন্ত্রণা। প্রতিকুল দৈবের ধিক্কারে ভেঙে পড়েছে যার পুরুষকার, তার কি বেঁচে থাকায় সুখ আছে? মহারাজের সমস্ত শরীরের উপর অদ্ভুত একটি ছায়া পড়ল—দীনতার। মহারাণী তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের সম্মতি লাভ ক'রে, স্থির ক'রে ফেললেন কর্তব্য। মহারাজকে বললেন :

"দেব, ভূপালদের মধ্যে আপনি একদিন তেজে ছিলেন বরিষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ। আজ আপনাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে বিন্ধ্যবনের বিজনতা। সম্পদ বুদ্‌বুদের মতো,—বিদ্যুতের লতার মতো, উদয়েই তার বিনাশ। সেইজন্যেই আমি বলি, সমস্ত কিছুই দৈবায়ত্ত; এই বিবেচনা ক'রে যা করণীয় এখন তা আমাদের করা উচিত। পুরাকালের রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র,—তাঁরা বিরাট বিরাট রাজা ছিলেন—ঐশ্বর্যে তাঁরা ইন্দ্রের তুল্যমূল্য ছিলেন। কিন্তু তাঁদেরও প্রথমে ভোগ করতে হয়েছিল—বিশেষরূপে—দৈবতন্ত্র দুঃখযন্ত্র। পরে তাঁরা রাজ্যসুখ ভোগ করেন। আপনারও তাই হবে। কিছুকাল দৈব-সমাধি বিরচন ক'রে মানসিক ব্যথাটিকে দূর ক'রে দিন।"

রাজহংস তখন সকলের অনুমতি নিয়ে নিজের ইষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে একদা উপস্থিত হলেন তপস্যারত তপোধন বামদেবের কুটীরে। বামদেবকে প্রণাম ক'রে গ্রহণ করলেন তাঁর আতিথ্য; দুঃখের কাহিনী নিবেদন করলেন তাঁর চরণে। আশ্রমের অপূর্ব শান্তির মধ্যে কিছুকাল বিশ্রাম ক'রে দূর করলেন শ্রান্তি। কারোর সঙ্গে বেশি কথা বলতেন না। কিন্তু তবু, মন থেকে কিছুতেই বিদায় নিতে চাইল না রাজ্যাভিলাষ। ভুলতে পারলেন না যে, তিনি সোমকুলাবতংস মহারাজ শ্রীরাজহংস। শেষে একদিন মুনিবরকে বললেন :

"ভগবন্, প্রবল দৈববলে বলী হয়ে মানসার আমাকে পরাস্ত করেছে। সে আজ উপভোগ করছে আমার রাজ্য। তার মতই

উগ্র তপস্যা বিরচন ক'রে ঐ শত্রুকে আমি ধ্বংস করব, উচ্ছেদ করব। এখন লোক-শরণ্য আপনার কারুণ্যই আমার সম্বল। সেই জন্যেই আপনার মতো নিষ্ঠাবানের কুটীরে আমার আগমন।"

ত্রিকালজ্ঞ তপোধন উত্তর দিলেন :

"সখে, তপস্যায় তোমার প্রয়োজন নেই; শরীরকে কৃশ কর ছাড়া অন্য কোনো উপকারেই লাগবে না তোমার এই তপস্যা। মহারাণী বসুমতীর গর্ভে তোমার যে পুত্র রয়েছে সে শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবে। সে-ই মর্দন করবে শত্রু। তাই বলি, কিছুকাল এখন তূষ্ণী অবলম্বন ক'রে অবস্থান কর।"

বামদেবের বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে সহসা উত্থিত হ'ল এক গগনচারিণী বাণী—"সত্য, বাক্য স ত্য।"

শুভমুহূর্তে পূর্ণগর্ভা মহারাণী বসুমতী প্রসব করলেন সর্বসুলক্ষণযুক্ত একটি পুত্রসন্তান। ব্রহ্মকান্তি পুরোহিতদের বিধান-অনুযায়ী মহারাজ রাজহংস কুমারের জাত-সংস্কারাদি ক্রিয়া করলেন সম্পন্ন; এবং অলঙ্কার ও সাজসজ্জা পরিয়ে আনন্দের ভিতর দিয়ে পুত্রের নামকরণ করলেন 'রাজবাহন'।

সেই সময়ে মহারাজের চারজন মন্ত্রী, যথা সুমতি, সুমন্ত্র, সুমিত্র ও সুশ্রুত—তাঁদেরও যথাক্রমে দীর্ঘায়ুঃ চারটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। তাদের নাম—প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত ও বিশ্রুত। নতুন-জাগা চাঁদের মতো তাদের দেখতে।

শৈশবক্রীড়া ও চাপল্যের রঙ্গমঞ্চে, রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রদের মধ্যে বন্ধুত্বের সুখাভিনয় চলতে লাগল।

দুঃখসুখের মধ্য দিয়ে এই রকম ক'রে দিন কাটে। এমন সময় একদিন রাজসভায় উপস্থিত হলেন বৃদ্ধ এক তাপস। তাঁর সঙ্গে সুকুমার একটি কুমার। দেখলেই চোখে জাগে আনন্দ। আবার তার

উপর কুমারটির অঙ্গে রাজলক্ষণ! মহারাজের হস্তে তাকে সমর্পণ ক'রে স্নেহকাতরকণ্ঠে তাপস বললেন :

"রাজন, অদ্ভুত এক ঘটনা!

কিছুদিন পূর্বে কুশ সমিৎ ইত্যাদি আহরণের জন্য আমি এক গুল্মাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ে—একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে, টপ টপ ক'রে চোখ দিয়ে ধারা ঝরছে—সঙ্গে কেউ নেই, নিতান্ত অনাথা। নির্জন বনের মধ্যে কেন কাঁদছ—এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে কোন রকমে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে—

'হে তাপস, মিথিলানাথ আমার প্রভু। তাঁর কীর্তির কথা দেবতারাও জানেন। তিনি তাঁর প্রিয়বন্ধু মগধরাজের রাজধানী পুষ্পপুরীতে পরিবারবর্গ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সীমন্তিনী বসুমতীর তখন সীমন্তমহোৎসব। কিছুদিন সেখানে আমরা আছি—এমন সময় শঙ্করের বরে দৃপ্ত হয়ে মালবরাজ আক্রমণ করেন মগধরাজকে। ভীষণ যুদ্ধ হয়। আমাদের মিথিলানাথ মগধরাজের সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মালবরাজ জয়যুক্ত হন, বন্দী করেন আমাদের মিথিলানাথকে। শেষে বিজয়ী মানসারের দয়ায় এবং নিজের পুণ্যবলে, কোনক্রমে মুক্তিলাভ ক'রে আমাদের মিথিলানাথ হতাবশেষ সৈন্য নিয়ে মিথিলার দিকে অগ্রসর হন। দুর্গম অরণ্যপথে সামান্য লোকবল নিয়ে তিনি চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করে দুর্ধর্ষ শবরেরা। মূল সৈন্য মিথিলানাথের অবরোধটিকে রক্ষা করছিল বটে, কিন্তু চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হওয়াতে মহারাজকে পালাতে হয়। আমি তাঁরই দুটি পুত্রের ধাত্রী। আমার মেয়েটিকে এবং কুমার দুটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি মহারাজের অনুসরণ করি। কিন্তু চ'লে উঠতে পারলুম না। পিছিয়ে পড়লুম জনহীন অরণ্যে। দৈবের দুর্বিপাক যখন আসে

তখন এমনি ক'রেই আসে। হঠাৎ দেখি, সেই অরণ্যপথের মাঝখানে একটি ব্যাঘ্র রয়েছেন দাঁড়িয়ে ;—রূপ-ধরা যেন চণ্ডরোষ ! বিকট হাঁ ক'রে আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে আমি দৌড়তে যাব এমন সময় প্রকাণ্ড একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে নীচে প'ড়ে যাই। আমার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে মিথিলানাথের একটি ছেলে পাথরের নীচে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য্য ! সেখানে ছিল—গরুর শব। তারই কোলের মধ্যে শিশুটি গড়িয়ে পড়ে—আশ্রয় পায়। বাঘ লাফিয়ে পড়ে সেই মরা গরুটার উপর। গাঁক্-গাঁক ক'রে যেই বাঘ সেই মরা গরুটাকে টানাটানি করতে যাবে, অমনি কোথা থেকে একটি বাণ ছুটে এল ; বাঘটার বুকে গিয়ে বিঁধল। বাঘ-মারা 'বাণযন্ত্র' পাতা ছিল—তাতেই সেদিন রক্ষে। বাঘটা তো মরল, কিন্তু হায় হায়, চক্ষের নিমিষে শবরেরা সেখানে উপস্থিত হয়ে গেল ; বালকটিকে তুলে নিয়ে—আহা, কি সুন্দর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো তার কালো চুল—আমার চোখের উপর দিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল। অন্য কুমারটিকে নিয়ে আমার মেয়েও যে তখন কোথায় অন্তর্ধান হ'য়ে গেছে জানি না। আমি তো অজ্ঞান। জ্ঞান হতে দেখি, একটি রাখাল আমার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই-ই দয়া ক'রে আমাকে নিয়ে যায় তার কুটীরে। ক্ষত ধুইয়ে দেয়। এখন কিছু সুস্থ হয়েছি। আমি চলেছি মিথিলানাথের কাছে। কী যে করব জানি না, আমার মেয়েই বা কোথায় গেল তাও জানি না।'

এই বলে, স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যায়।

মহারাজ, আমার দুঃখ হয়। চিন্তিত হয়ে পড়ি। চিন্তা ক'রে দেখলুম মিথিলানাথ আপনার মিত্র। এই ঘোর বিপদের দিনে তাঁর বংশের অঙ্কুরটি বিনষ্ট হয়ে যাবে—এই চিন্তাই আমাকে আরো বেশি কষ্ট দিতে লাগল। খুঁজতে বেরলুম। শেষে সুন্দর একটি চণ্ডিকামন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখি, কিরাতেরা যুদ্ধে সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে,

দেবীর সম্মুখে উপহারস্বরূপ একটি শিশুকে বলি দিতে নিয়ে এসেছে জড়ো হয়েছে মন্দিরে। তাদের মধ্যে তখন তর্ক চলেছে কী ভাবে বলি দেওয়া যায়!—গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে খড়্গ দিয়ে কাটা, না, বালিমাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে কোমর পর্যন্ত পুঁতে তাগ ক'রে বাণ দিয়ে বেঁধা, না, ওকে পালাতে দিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো!

আমি তাদের এই সব কথা শুনে এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'কিরাত-শ্রেষ্ঠ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ভীষণ অরণ্যের মধ্যে পথ ভুলে গিয়েছিলুম। আমার ছোট্ট ছেলেটিকে গাছের ছায়ায় রেখে, পথ খুঁজতে একটু মাত্র এগিয়ে গিয়েছিলুম। সামান্য ক্ষণ। ফিরে এসে আর তাকে দেখতে পেলুম না। কোথায় গেল, কেই বা নিয়ে গেল—আতিপাঁতি খুঁজেও বার করতে পারছি না। অনেক দিন হ'ল তার মুখ দেখি নি। কি যে করব ভেবে কুল পাচ্ছি না। কোথায়ই বা যাব? তোমরা কি তাকে কেউ দেখেছ?' কিরাতশ্রেষ্ঠ তখন বললে, 'ব্রাহ্মণ, একটি ছেলেকে আমরা পেয়েছি। এখানেই আছে। দেখুন তো, এইটিই কি আপনার সেই ছেলে?—আচ্ছা, তাই না কি? চোখের মণি? তবে নিয়ে যান একে—'

মহারাজ, একেই বলে—দৈব। কিরাতদের আশীর্বাদ দিয়ে শিশুটিকে কাছে টেনে নিলুম। মুখে চোখে মাথায় ঠাণ্ডা জল বুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত ক'রে শঙ্কাহীন চিত্তে চণ্ডিকামন্দির থেকে বেরিয়ে পড়লুম। সেই শিশুটিকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আপনি এর পিতৃস্থানীয়—একে আশ্রয় দিন। দীর্ঘায়ুঃ হোক।"

মিথিলানাথ—মহারাজ রাজহংসের সুহৃদ্। তাঁর বিপদে শোকে মুহ্যমান ছিলেন রাজহংস—এতদিন। কিন্তু এখন হঠাৎ তাঁর পুত্রটিকে দেখে বিষাদের মধ্যেও যেন একটু সুখ পেলেন। শোকটিকে ঠোঁটের মধ্যে চেপে রেখে তিনি বালকটির নামকরণ করলেন 'উপহারবর্মা।'

স্নেহে উপহারবর্মা লাভ করল রাজবাহনের সমকক্ষতা।

আর একদিন। শ্রীরাজহংস শবর-পল্লীর সমীপস্থ পথ দিয়ে তীর্থস্নানে চলেছেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল, একটি শবরী। তার কোলে অনুপম-শরীর একটি শিশু। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভামিনি, ভারি সুন্দর এই ছেলেটি তো? অঙ্গে রাজচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তোমার গোত্র-সন্তান ব'লে তো মনে হয় না? আমাকে সত্য ক'রে বল, এই নয়নের আনন্দটি কার, কেনই বা এর এমন দীনবেশ, কেমন ক'রেই বা তোমার হাতে এসে এ পড়ল?"

মহারাজকে প্রণাম করল শবরী। গোপন না ক'রে সহজভাবেই বললে, "রাজন, মিথিলানাথ যখন আমাদের পল্লীর নিকটে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নেয় শবরসৈন্যেরা। আমার স্বামী এই শিশুটিকে অপহরণ ক'রে নিয়ে আসেন, কোলে সঁপে দেন। আমার কাছেই এ মানুষ হচ্ছে।"

শবরীর কথা শুনে মহারাজের স্মরণে পড়ল সেই তাপসকথিত দ্বিতীয় রাজকুমারের কথা। স্থির বিশ্বাস জন্মাল। সাম এবং দানের অনুগ্রহে শবরীকে আপ্যায়িত ক'রে শিশুটিকে নিয়ে এলেন। নাম রাখলেন 'অপহারবর্মা'। দেবী বসুমতীর হাতে তাকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে বললেন, "মানুষ কর।"

কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার একটি শিশু। বামদেবের শিষ্য সোমদেবশর্মা মহারাজের সম্মুখে একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত। মহারাজ আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। সোমদেব বললেন, "মহারাজ, আশ্চর্য ব্যাপার! রামতীর্থে স্নান ক'রে ফিরে আসছিলুম, পথে দেখি, অরণ্যপ্রান্তে একটি বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার কোলে একটি সদ্যোজাত জ্বলজ্বলে ছেলে। বৃদ্ধা কেন বনের মধ্যে এই ছেলেটিকে নিয়ে এত কষ্ট ক'রে ঘুরছে—এই কথা সাদরে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে :

'মুনিবর, আপনি বোধহয় বৈশ্যশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য কালগুপ্তের নাম শুনেছেন, যিনি কাল-যবন দ্বীপে থাকেন। মগধরাজের মন্ত্রীর পুত্র—'রত্নোদ্ভব'—সারা পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে বাণিজ্যের জন্যে সেই দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। কালগুপ্তের মেয়ে সুবৃত্তাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অনেক যৌতুক লাভ করেন। নতাঙ্গীর গর্ভসঞ্চার হয়। এদিকে রত্নোদ্ভব নিজের সহোদরদের দেখবার জন্য উতলা হয়ে ওঠেন। অনেক কষ্টে শ্বশুরের অনুমতি গ্রহণ ক'রে শেষে একদিন সুবৃত্তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবহণে আরোহণ ক'রে পুষ্পপুরী যাত্রা করেন। কিন্তু এমনি ভাগ্য! সমুদ্রে ঝড় উঠল—ঢেউয়ের উপর ঢেউ, ভেঙে পড়ল পোত, তলিয়ে গেল সমুদ্রের অতল জলে। গর্ভবতী সুবৃত্তার আমি ধাত্রী। একটি কাঠের তক্তা ভেসে যাচ্ছিল, সুবৃত্তাকে নিয়ে সেইটিতে কোনরকমে উঠি এবং দৈবগতিকে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে লাগি। রত্নোদ্ভব আর তাঁর বন্ধুরা সমুদ্রে তলিয়ে গেছেন, অথবা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন ক'রে তীরে এসে পৌঁছছেন কি না কিছুই জানি না। আজ এই বনের মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করতে করতে সুবৃত্তাদেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। নির্জন বনের মধ্যে থাকা অসম্ভব, কোথাও কাছে কোনো লোকালয় আছে কি না খুঁজে বার করতেই হবে, অথচ কচি শিশুটিকে ফেলে রেখে কোথাও যাওয়া যায় না—তাই হতবুদ্ধি হয়ে শেষে স্থির করি,—নাঃ, শিশুটিকে কোলে নিয়েই খুঁজি। শিশুটিকে নিয়ে কিছু দূরে তাই আমি এগিয়ে এসেছি।'

এইরকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় মহারাজ, হঠাৎ দেখি, চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রকাণ্ড বন্য হস্তী। তাকেও দেখা, আর সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীর হাত থেকে ঘাসের উপর খ'সে পড়া কচি শিশুটির! নিকটেই একটি লতাগুল্ম ছিল। তার মধ্যে আমিও ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করি। কী হয়, কী হয়। তারপর, মহারাজ, যা দেখলুম তা এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড! দেখি, বন্য হস্তী শুঁড় দিয়ে যেই তুলে নিয়েছে

বাচ্চাটিকে—যেমন ক'রে সে তুলে নেয় একখানা ঝরা পাতা—অমনি কোথা থেকে তার কুম্ভের উপর লাফিয়ে পড়ল একটা বিরাট সিংহ। কী ভীষণ তার গর্জন! কেঁপে উঠল কানন। ভীত হস্তী আকাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল শিশুটিকে। কিন্তু, মহারাজ, বলতেই হবে—দীর্ঘজীবী হবে শিশুটি। গাছের ডালে একটি বানর ব'সে ছিল—সে টপ ক'রে, বোধহয় পাকা ফল ভেবে, বাচ্চাটিকে লুফে নেয়। পরক্ষণেই দেখলুম—ফল নয় দেখে বাচ্চাটিকে গাছের প্রশস্ত স্কন্ধমূলে সে রাখল। রেখেই মর্কটটা পালাল। আমি তো ভয়ে অর্ধমৃত। দেখছিই তো দেখছি। নিশ্চয়ই শিশুটি সত্ত্বসম্পন্ন, তাই এত কষ্ট সহ্য করতে পেরেছিল। সিংহও হস্তীটাকে বধ ক'রে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে চ'লে গেল। তখন আমি লতাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে সোজা উঠে গেলুম গাছের উপরে। তেজঃপুঞ্জ শিশুটিকে নামিয়ে নিয়ে বনান্তরে অন্বেষণ ক'রেও যখন সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেলুম না, তখন আশ্রমে ফিরে এসে গুরুদেব শ্রীবামদেবের পাদপদ্মে শিশুটিকে রাখি। তাঁরই আদেশ মতো আপনার কাছে আজ এই শিশুটিকে আমার নিয়ে আসা।"

সমস্ত সুহৃদের উপর একই রকম দৈবানুকূল্য দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন রাজহংস; কিন্তু তাঁর মন কেবল বলতে লাগল—রত্নোদ্ভবের তা হ'লে কী হ'ল! কী হ'ল!

বালকটির নাম রাখলেন 'পুষ্পোদ্ভব'। সুশ্রুতকে আহ্বান ক'রে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে মহারাজ তাঁর হাতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে সমর্পণ ক'রে দিলেন।

এবার কিন্তু অন্যরকম। একটি শিশুকে বুকে ক'রে রাণী বসুমতী নিজে রাজহংসের নিকট এসে উপস্থিত। 'এটিকে আবার কোথায় পেলে?'—এই বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে মহারাণী বললেন, "আর্য, ভয়ানক আশ্চর্য ব্যাপার! রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে—আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন; হঠাৎ মনে হ'ল, কে যেন আমাকে জাগাচ্ছে!

চেয়ে দেখি, স্বর্গের একটি দিব্য কন্যা,—চোখ ঝলসে যায় এমন তার রূপ—আমার সামনে এই শিশুটিকে রেখে বিনয়মধুর কণ্ঠে বলছেন, 'দেবি, আপনাদের মন্ত্রী ধর্মপালের পুত্র কামপালের আমি প্রেয়সী, যক্ষকান্তা। মণিভদ্রের আমি নন্দিনী,—নাম 'তারাবলী'। আপনার পুত্র রাজবাহন যথাসময়ে এই সমুদ্রবলয়িত-পৃথ্বীর অধীশ্বর হবেন— এই কথা জেনে এবং যক্ষেশ্বরের অনুমতি লাভ ক'রে আমি আমার এই পুত্রটিকে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। এ পরিচর্যা করবে বিশুদ্ধ-যশোনিধি রাজবাহনের। আশা করি আপনি একে মনের মতো ক'রে মানুষ করবেন।'

বিস্ময়ে আমার চোখ বুঝি ফেটে পড়ে। সবিনয় কিছু নিবেদন করতে যাব—এমন সময় তিনি মিলিয়ে গেলেন,—ভোরের আকাশে। যক্ষিণীর সে কী সুন্দর বড় বড় দুটি চোখ!"

মহারাজেরও বিস্ময়ের অন্ত রইল না; তার উপর কামপাল আবার যক্ষকন্যাকে বিবাহ করেছে! রঞ্জিতমিত্র মন্ত্রী সুমিত্রকে আহ্বান ক'রে মহারাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র 'অর্থপাল'কে তার হাতে তুলে দিলেন সর্ববৃত্তান্ত জানিয়ে।

তার পরের দিন—বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!—বামদেবের অন্য একটি শিষ্য—সেই আশ্রমেই তিনি থাকেন—আর একটি সুন্দর শিশুকে মহারাজের সম্মুখস্থ ক'রে বললেন:

"দেব, তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কাবেরী নদীর তীরে, একটি স্থবিরার ক্রোড়ে আমি দেখতে পাই এই শিশুটিকে। কী সুন্দর ভাঙাভাঙা এর মাথার চুল। স্থবিরাটি অসম্ভব কাঁদছিল। এটি কে, এত কান্নার অর্থই বা কী—এই সব প্রশ্ন করাতে সে ক্লান্তকণ্ঠে বলে:

'দ্বিজোত্তম, আমার শোকের কাঁটা আপনিই উৎপাটন করতে পারবেন। তবে শুনুন। মহারাজ রাজহংসের মন্ত্রী সিতবর্মার কনিষ্ঠপুত্র সত্যবর্মা তীর্থভ্রমণ করতে করতে এই দেশে আসেন। তিনি এই

দেশের রাজার কাছ থেকে একটি অগ্রহার উপহার পান। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণকন্যা কালীদেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু সন্তান না হওয়াতে তাঁরই ভগ্নী গৌরীদেবীকে পুনর্বার বিবাহ করেন। গৌরীর এই ছেলেটি হয়, আমি এর ধাত্রী। কালীদেবীর হৃদয় কিন্তু ভ'রে যায় অসূয়ার বিষে। ছলনা ক'রে আমাকে সঙ্গে নিয়ে, এই ছেলেটিকে বাটীর বার ক'রে নিয়ে চ'লে আসেন কালীদেবী। তার পরে হঠাৎ আমার চোখের সামনেই, ছেলেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেন কাবেরীর জলে। আমি প্রথমে অতটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু ঘটনাটি যখন ঘটে গেল, তখন মুহূর্তও স্থির থাকতে পারলুম না। আমিও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এক হাতে ছেলেটিকে ধরলুম, আর অন্য হাতে জল ভেঙে সাঁতার কাটতে লাগলুম। কিন্তু নদীর স্রোত বড় প্রখর। ভেসে গেলুম। এমন সময় একটি গাছের ডাল হাতে এসে ঠেকল। ধ'রে ফেললুম। শিশুটিকে তার উপর শোয়ালুম বটে, কিন্তু আমি তখন কী ক'রে জানব যে, সেই ডালের উপরেই একটি বিষধর সর্প রয়েছে? আমায় দংশন করে। তার পরে এইখানে তীরে এসে লেগেছি। বিষের জ্বালা—বাড়ছে। তাই কাঁদছি—আমার এই বোঝাটিকে কোথায় কার কাছে এই বনের মধ্যিখানে রেখে যাই? কার কাছে রেখে যাই?'

বলতে বলতে স্থবিরার ভাবান্তর লক্ষ্য করলুম। বিষের ক্রিয়া তখন বিশেষ আরম্ভ হয়ে গেছে, জ্বালায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব শিথিল হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে স্থবিরাটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মন্ত্র প'ড়ে বিষ নামাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ফল হ'ল না। ওষধি-বিশেষ যদি সমীপ-কুঞ্জে পাওয়া যায়,—এই খোঁজে বেরিয়ে ফিরে এসে দেখি, সব শেষ হয়ে গেছে। তার অগ্নিক্রিয়া করলুম। একবার মনে হ'ল, ছেলেটিকে নিয়ে সত্যবর্মার অগ্রহারে যাই। কিন্তু মহারাজ, স্থবিরার কাছে সেই অগ্রহারের নামটি আমার জেনে নেওয়া হয় নি। বৃথা

অন্বেষণ হবে এই ভেবে, এবং মহারাজের অমাত্যতনয়ের মহারাজই একমাত্র ন্যাসরক্ষক, এই বিচার ক'রে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সভায় এখন উপস্থিত হয়েছি।"

রাজহংস সবই বুঝলেন, — সত্যবর্মা কোথায় আছে জানতে না পেরে মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু কী করবেন — নিরুপায়। শেষে মন্ত্রী সুমতিকে আহ্বান ক'রে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র 'সোমদত্তকে' তাঁর হাতে সঁপে দিলেন।

·

মহারাজের স্নিগ্ধদৃষ্টিতে বাড়তে লাগলেন কুমারেরা। শৈশব-চাপল্যের অনাবিল উপভোগে এবং কুমারমণ্ডলীর সম্মিলিত বন্ধুত্বে, — রাজবাহনও ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলেন। দশটি কুমারের চূড়াকরণ, উপনয়নাদি সংস্কার সুসম্পন্ন হয়ে গেল। তার পরে সকলের এল শিক্ষার সময়। নিখিল-লিপিজ্ঞান, নিখিল দেশীয় ভাষায় পাণ্ডিত্য, ষড়ঙ্গবেদ, কাব্য, নাটক, আখ্যানক, আখ্যায়িকা, ইতিহাস এবং চিত্রকথা-সহিত পুরাণগুলিতে তাঁরা সকলেই অর্জন করলেন অসামান্য নৈপুণ্য। চাতুর্য দেখাতে লাগলেন ধর্ম-শব্দ-জ্যোতিস্তর্ক-মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে, কৌটিল্য-কামন্দকীয় প্রভৃতি নীতিতে। প্রশংসা লাভ করলেন বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের আলাপে, সংগীত-সাহিত্যের মনোহরণ প্রকাশে। বিদ্যা শিক্ষার মধ্যে কিছুই বাদ পড়ল না। তাঁরা লাভ করলেন হস্তীবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যায় পটুত্ব, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণতা, মণিমন্ত্র-ওষধি প্রভৃতি মায়াপ্রপঞ্চে পারদর্শিতা, এমন কি চৌর্য এবং পাশাক্রীড়া প্রভৃতি কপটকলা-বিষয়েও প্রৌঢ়ত্ব।

আচার্যদের চরণ-প্রান্তে সাশীর্বাদ সর্ববিদ্যা আহরণ ক'রে যখন এই কুমারমণ্ডলী যৌবনের উল্লাসে অনলসভাবে যথা-কর্তব্য পালন করতে লাগলেন, তখন বৃদ্ধ রাজা রাজহংস পরমানন্দে ভাবলেন — "আর ভয় নেই, — আমি এখন শত্রুসুদুর্লভ।"

॥ ইতি কুমারোৎপত্তির্নাম প্রথম উচ্ছ্বাসঃ ॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

ব্রাহ্মণের উপকার

একদা বামদেব মহারাজ রাজহংসের সভায় প্রবেশ ক'রে সানন্দে ছাখেন মহারাজকে ঘিরে ব'সে রয়েছেন কুমারমণ্ডলী। তাঁরা যেন শ্রীমান্ মদনের সহোদর, এবং তাঁদের সাহস যেন উপহাস করছে দেব সেনাপতি কার্তিকেয়কে। তাঁদের হস্তে জয়ধ্বজ, ছত্র এবং বজ্রাঙ্কিত রেখা। বামদেবকে দেখতে পেয়েই মহারাজ রাজহংস আনত করলেন নিজের মস্তক এবং কুমারেরা তাঁর পাদপদ্মে প্রণত করল নিজেদের শিরোভাগ। প্রণতির সময়টিতে সুন্দর দেখতে হ'ল কুমারদের। তাঁদের কাকপক্ষ কেশরাশি মধুকরের ধারার মতো ঢ'লে পড়ল তপোধনের চরণকমলে।

কুমারদের গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে মিত এবং সত্য বাক্যে আশীর্বাদ ক'রে রাজহংসকে বামদেব বললেন, "ভূ-বল্লভ, মনের পুষ্পফলের মতোই, তারুণ্যের লাবণ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আপনার পুত্র রাজবাহন। রাজকুমারের মিত্রেরাও প্রশংসার্হ। এখন দিগ্‌বিজয় আরম্ভ করবার সময় হয়েছে। মনে হয়, রাজবাহন অক্লেশে সহ্য করতে পারবে সমস্ত ক্লেশ। সহচরদের সঙ্গে দিয়ে রাজবাহনের দিগ্‌বিজয় যাত্রার ব্যবস্থা করা এখন বিধেয়।"

তপোধনের বাণীতে অভিনন্দিত হয়ে, 'মারে'র মতো অভিরাম, সেই কুমারেরা—রাম প্রভৃতি মহাবীরদের মতোই তাঁদের পৌরুষ,—রোষেই যেন ভস্ম ক'রে ফেলতে লাগলেন শত্রুদের; বাতাসকে উপহাস করল তাঁদের চঞ্চল গতিবেগ, গতিবেগেই প্রকাশ পেল রণাভিযানের সংশয়হীন জয়। আশ্বস্ত হলেন মহারাজ। তিনি শীঘ্র

দেখলেন—অভ্যুদয়! দিগ্‌বিজয়ের আদেশ দিলেন রাজবাহনকে; অন্য কুমারদের দিলেন সাচিব্য। এবং যথাযোগ্য উপদেশ ও আশীর্বাদ-সহ শুভমুহূর্তে ব্যবস্থা ক'রে দিলেন বিজয়যাত্রার।

চতুর্দিকের মঙ্গলসূচক শুভলক্ষণে সংবর্ধিত হয়ে রাজবাহন একদা মিত্রদের সঙ্গে প্রবেশ করলেন বিন্ধ্যাটবীর গহনতায়।

সেই অরণ্যে অকস্মাৎ তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘ'টে গেল এক অদ্ভুত মনুষ্যের। মনুষ্যটির অঙ্গে তখনও স্পষ্ট লেগে ছিল যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। দেহখানি কৃষ্ণলৌহের মতো কর্কশ, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, বিপ্র-ভাব, অথচ দেহের সমগ্রতায় কেমন যেন কিরাতের প্রৌঢ় লক্ষণ। চোখ দেখলে বুক কাঁপে।

সেই মনুষ্যটি এগিয়ে এসে রাজবাহনকে—পূজা করলেন। অদ্ভুত মনুষ্যের এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখে রাজবাহন সাগ্রহে বললেন, "মানব, এই ঘোর অরণ্যে আপনি দেখছি একলাই বসবাস করেন। এখানে চোখে পড়ছে না কোনো বসতি, এমন কি পশুপক্ষীও না। আপনার কাঁধের ঐ যজ্ঞোপবীতখানি বলছে আপনি ব্রাহ্মণ, অথচ অস্ত্রাঘাত দেখে আমার মন বলছে আপনি কিরাত। বিস্মিত বোধ করছি।"

অদ্ভুত মনুষ্যটি কিন্তু রাজবাহনকে একটি তেজোময় পুরুষ ব'লেই বিবেচনা ক'রে নিয়েছিলেন; প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে যতটুকু পৌরুষ থাকে, তার চেয়েও অধিক পৌরুষ যেন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন রাজবাহনের মধ্যে। বয়স্যদের নিকট থেকে তাই রাজবাহনের নাম এবং গোত্র জেনে নিয়ে তিনি বললেন:

"রাজনন্দন, এই অরণ্যে একদল মনুষ্য বাস করেন, নামেই যাঁরা ব্রাহ্মণ। বেদপাঠ বিদ্যাভ্যাস তাঁদের নেই, দূরে ঠেলে দিয়েছেন কুলাচার, পরিত্যাগ করেছেন সত্য-শৌচাদি ধর্মকর্ম। ঘুরে বেড়ান, অনিষ্ট করেন, পাপকর্ম করতে দ্বিধা করেন না। পুলিন্দদের পুরোভাগে

তাঁরা চলেন, তাদের সঙ্গেই মাখামাখি, তাদেরি অন্ন-ভোগী—এমনিধারা তাঁরা ব্রাহ্মণ। তাঁদেরি কারও আমি পুত্র,—'মাতঙ্গ' আমার নাম। আমার চরিত্র বিষয়ে সর্বত্রই শুনতে পাবেন নিন্দা। আমি কিরাত-সৈন্য সঙ্গে নিয়ে জনপদে প্রবেশ করতুম, দয়া মায়া ছিল না, গ্রামে গ্রামে আক্রমণ ক'রে ফিরতুম ধনীদের, তাদের স্ত্রী পুত্রদের বেঁধে এনে সর্বস্বান্ত করতুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতুম তাদের ;—এই ছিল আমার কাজ।

সেদিন হয়েছে কি, হঠাৎ দেখি আমার দলবলের লোকেরা বনের মধ্যে একটি খাঁটি ব্রাহ্মণকে ধরেছে ;—তাঁকে হত্যা করতে যাচ্ছে। তাদের বাধা দিয়ে বলি, 'আরে, করছ কি ! ব্রহ্মহত্যা কোরো না। মহাপাপ লাগবে।' আমার কথা শুনে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে তারা সকলে মিলে আমাকে ভীষণ ভর্ৎসনা করতে লাগল। তাদের পরুষ ভাষায় অসহিষ্ণু হয়ে আমি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে যাই ; অনেকক্ষণ ভীষণ যুদ্ধ করি। কিন্তু তাদের আক্রমণে আমি,—রাজকুমার,—প্রাণ হারাই।

প্রাণ হারিয়ে দেখি প্রেতপুরীতে উপস্থিত হয়ে গেছি। সভার মধ্যে এক রত্নখচিত সিংহাসন,—সমাসীন রয়েছেন সাক্ষাৎ শমনদেব—এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য দেহধারী প্রেত। তাঁকে দেখে দণ্ড-প্রণাম করলুম। কিন্তু,—তিনি আমাকে অনেকক্ষণ ধরে কেবল নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তার পরে অমাত্য চিত্রগুপ্তকে আহ্বান ক'রে বললেন, 'দেখুন, অমাত্য, এর তো এখনও মৃত্যু-সময় উপস্থিত হয় নি। দোষ এ অনেক করেছে, সত্য, কিন্তু একটি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। দেখবেন, এর পর থেকে ওর মন আর পাপপথে যাবে না, পুণ্যকর্মে রুচি হবে। পাপিষ্ঠকে একবার দেখিয়ে দিন এখানকার যন্ত্রণাভোগ। তার পরে ও ফিরে পাবে ওর পূর্বশরীর।'

চিত্রগুপ্ত তখন আমাকে নরক-যন্ত্রণা দেখালেন। উঃ, সে কী

ভীষণ! একদল পাপী দেখি—লোহার থামে বাঁধা রয়েছে, আগুনের তাতে থামের রঙ গনগনে লাল। আর এক দলকে দেখি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়ায় তপ্ত তৈলে তাদের ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, তার পরে লগুড় দিয়ে তাদের পীড়ন। আর এক দল দেখি,—দাঁড়িয়ে রয়েছে, ধারাল কুড়ুল দিয়ে তাদের মাংস ছুলে ছুলে কাটা হচ্ছে।

কী যে দেখলুম, কত যে দেখলুম, বীভৎসতার চরম, তার ইয়ত্তা নেই। শেষে আমাকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলুম কিছু পুণ্যবুদ্ধি।

আমার পূর্ব-দেহখানি প্রাণ ফিরে পেল। জেগে দেখি—সেই ব্রাহ্মণ যাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার প্রাণহানি ঘটেছিল—সেই ব্রাহ্মণ—ঘোর অরণ্যের মধ্যে তখনও আমার দেহটিকে আগলিয়ে ব'সে রয়েছেন, শীতল উপচার দিয়ে সেবা করছেন, পরীক্ষা করছেন; আর আমি শুয়ে আছি শিলাতলে। ক্রমে আমার বেঁচে ওঠার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। সহসা বন্ধুরা এলেন; আমাকে তুলে নিয়ে মন্দিরে চ'লে গেলেন; ব্রণশুদ্ধি করলেন।

কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিন্তু ধীরে ধীরে আমাকে সুস্থ ক'রে তুললেন, এবং দান করলেন অক্ষর-শিক্ষা; বিবিধ আগমতন্ত্রের ব্যাখ্যা ক'রে, পাপক্ষয়ী সদাচারে আমার মনটিকে ব্রতী করিয়ে দিলেন। শেষে একদিন চন্দ্রমৌলি মহাদেবের পূজা-বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দিয়ে, এবং আমার পূজা গ্রহণ ক'রে কোথায় যেন চ'লে গেলেন। সেই থেকে আমি সকলের সংসর্গ ত্যাগ করেছি, কিরাতদেরই বলুন, আর বন্ধুদেরই বলুন। এই কাননে বাস করি, দিবারাত্র এখন আমার হৃদয়ে নিবাস করছেন কলঙ্কমোচন জগৎগুরু চন্দ্রশেখর। কিন্তু রাজনন্দন, নিভৃতে আমার কিছু কথনীয় রয়েছে। একান্তে আসুন।"

রাজবাহন তখন বয়স্যদের প্রেরণ করলেন অন্যত্র। পুনর্বার বলতে লাগলেন মাতঙ্গ—"গতকাল, রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে, হঠাৎ

স্বপ্নের মধ্যে দেখি—আমার চোখ থেকে যেন নিদ্রাটিকে সরিয়ে নিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিলেন গৌরীপতি।—প্রসন্নবদনকান্তি গৌরীপতি, —প্রশ্রয়নত আমাকে বললেন—

'মাতঙ্গ, দণ্ডকারণ্যের অন্তরাল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ঐ যে তটিনী, তার তীরভূমিতে স্থাপিত রয়েছে একটি স্ফটিক-লিঙ্গ ; সিদ্ধেরা এবং সাধ্যেরা সেটিকে আরাধনা করেন। সেই স্ফটিক-লিঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে পার্বতীর চরণ-চিত্রাঙ্কিত যে বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডটি শায়িত রয়েছে, সেইটির নিকটেই তুমি দেখতে পাবে একটি গহ্বর ;—বিধাতাপুরুষের আননের মতো পবিত্রসুন্দর। সেই গহ্বরটির মধ্যে নিক্ষিপ্ত রয়েছে একখানি তাম্রশাসন। বিধাতার শাসন ব'লেই সেটিকে বিবেচনা কোরো। সেটিকে গ্রহণ কোরো। লক্ষ্য কোরো তার উপরে কী লিখন লেখা রয়েছে। সেই লিখনটিকে তোমার সৌভাগ্যবিজয় ব'লে জেনো। তাম্রশাসনের নির্দেশ পালন করলে তুমি অনাগতকালে ঈশ্বরত্বলাভ করবে পাতালের। তোমাকে সাহায্য-দানের জন্য আজ কিংবা কাল এখানে সমুপস্থিত হবেন জনৈক রাজকুমার।'

রাজনন্দন, তাঁর সেই আদেশের গুণানুযায়ীই যেন আজ এখানে আপনার হয়েছে আবির্ভাব। আমি সাধনার অভিলাষী ; সুখী হব, যদি আপনি সহায় হন।"

রাজবাহন সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে দৈবাদেশ শিরোধার্য ক'রে বললেন, "বেশ, তাই হবে।" মাতঙ্গকে বিদায় দিলেন। মস্তক আনত ক'রে প্রস্থান করলেন মাতঙ্গ।

তারপর রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর, মিত্রগণ গভীর নিদ্রায় মগ্ন, রাজবাহন ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান ক'রে অলক্ষিতে প্রস্থান করলেন, চ'লে গেলেন বনান্তরে।

পরের দিন প্রভাত হতেই অনুচরেরা দেখতে পেল রাজবাহন নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল সকলে। অরণ্যের চতুর্দিকে তারা বেরিয়ে পড়ল, আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজল, কিন্তু রাজবাহনকে কোথাও পাওয়া গেল না। রাজবাহনের ন-জন সুহৃৎ তখন সম্মিলিত হয়ে স্থির করলেন—দেশদেশান্তরে সর্বত্র তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, এবং তখুনি তাঁদের যাত্রা করতে হবে। বিলম্ব অসহনীয়।

পুনর্মিলনের সঙ্কেতস্থান নির্ধারণ ক'রে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে—বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে বীরশ্রেষ্ঠ রাজবাহনের রক্ষণাবেক্ষণে নির্ভয় হয়ে অন্তরঙ্গ মাতঙ্গ নিশীথে পৌঁছে গেলেন গহ্বরদ্বারে,—গৌরীপতির নির্দেশ অনুসরণ ক'রে। নিঃশঙ্কপ্রবেশ। তাম্রশাসনখানি পেলেন এবং সেই গহ্বরপথেই দুজনে উপনীত হলেন রসাতলে। পৌঁছে দেখেন, রসাতলে একটি পত্তনের অনতিদূরে তাঁরা নেমেছেন। কাছেই ক্রীড়াকানন, কাননের মধ্যে সরোবর। পশুপক্ষীর নামগন্ধ সেখানে নেই। তারি তীরে তাম্রশাসনের অনুশাসন মতো হবির্বিধান করলেন মাতঙ্গ, এবং বিরচন করলেন হোম। যজ্ঞের বাধাগুলিকে দূর করতে লাগলেন রাজবাহন। ঘৃত ও সমিধের সম্ভারে সুপুষ্ট হয়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে জ্বলে উঠল হোমানলের শিখা। মাতঙ্গ তখন রাজবাহনের বিস্মিত চক্ষুর সম্মুখেই মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে আহুতি দান করলেন আত্মার পুণ্যগেহ তাঁর ঐ দেহ। কিন্তু আশ্চর্য! পরমুহূর্তেই হোমানল থেকে বেরিয়ে এলেন মাতঙ্গ। দিব্যতনু—বিদ্যুতের মতো চোখঝলসানো রূপ।

এবং পরক্ষণেই রাজবাহন শুনতে পেলেন,—নূপুরনিক্কণ। কর্ণের বিস্ময় মিটতে না মিটতেই রাজবাহন দেখতে পেলেন কলহংস-গতিতে সেই হোমানলের নিকটে উপস্থিত হলেন একটি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা। তাঁর সারা অঙ্গে মণিময় অলঙ্কার। হ্যাঁ রূপসী বটে, ললনাকুলের যেন

সিঁথিমৌর। বিনয়াবনতা অনেকগুলি সখী তাঁর পিছনে পিছনে এলেন। কন্যাটি এসে দিব্য-দেহ মাতঙ্গের সম্মুখে ধীর চরণে অগ্রসর হয়ে তাঁকে উপহার দিলেন—একটি উজ্জ্বলকান্তি মণি। "তুমি কে?" —প্রশ্ন করলেন মাতঙ্গ।

কলকণ্ঠে উৎকণ্ঠার মন্দমন্দ ধ্বনি তুলে, উদঞ্জলি-মুদ্রায় হাতদুটিতে প্রণাম রচনা ক'রে, কন্যাটি বললেন,

"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমি 'কালিন্দী' অসুররাজনন্দিনী। একদিন এই রসাতলের শাসনকর্তা ছিলেন আমার পিতা। কিন্তু, দেবাসুরসংগ্রামে অমরদের বিদূরিত করার ফলে, পরাক্রম-অসহিষ্ণু হয়ে শ্রীবিষ্ণুদেব আমার পিতাকে অতিথি করিয়েছেন যমনগরের। আমি যখন শোকের পাথারে মগ্ন, তখন জনৈক কারুণিক সিদ্ধতাপস আমাকে আশ্বাস দান করেন, বলেন—'বৎসে, তুমি চিন্তা কোরো না। দিব্যদেহধারী এক মানব তোমায় পত্নীত্বে বরণ ক'রে সমগ্র রসাতলের পালনকর্তা হবেন।'

সেই আদেশ লাভের পর থেকে আমি উন্মুখী হয়ে রয়েছি,—যেমন থাকে নবীন বর্ষণ-দিনের প্রতীক্ষায় আষাঢ়ের ঘনোন্মুখী চাতকী। আজ আপনি এসেছেন। আমার মনে হ'ল এতদিনে বুঝি সফল হতে চলেছে মনস্কামনা। মন্ত্রীরা এতদিন গ্রহণ করেছিলেন রাজ্য পরিচালনার ভার। তাঁদের অনুমতি নিয়ে আমি এখানে এসেছি। মনোরথের সারথিত্ব করেছেন শ্রীমদন। রসাতলের রাজ্য-লক্ষ্মীকে অঙ্গীকার ক'রে আমাকে দান করুন তাঁর সপত্নী-পদ; এই আমার ঐকান্তিক বাসনা।"

এর পরে যা স্বাভাবিক তাই হ'ল। রাজবাহনের অনুমতি নিয়ে তরুণীটিকে বিবাহ করলেন মাতঙ্গ; এবং দিব্যাঙ্গনালাভ ক'রে, ও রসাতল-রাজত্বটিকে নিজের জন্মভূমির মতো বরণ ক'রে নিয়ে কালাতিপাত করতে লাগলেন,—পরমানন্দে। কিন্তু বয়স্যদের বঞ্চিত ক'রে চ'লে এসেছিলেন রাজবাহন; তাই তাঁর মন পৃথিবীর উন্মুক্ত

বাতাসের জন্যে, মিত্রদের দেখ্‌বার জন্যে, ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। শেষে তিনি মাতঙ্গ ও কালিন্দীকে জানালেন 'বিদায় দিতে হবে'।

বিদায়কালে মাতঙ্গ তাঁকে উপহার দিলেন,—কালিন্দী-দত্ত সেই অদ্ভুত মণি। মণিটি সঙ্গে থাকলে ক্ষুধা কিংবা পিপাসা,—কিছুই থাকে না মানবের। কৃত-সাহায্যের জন্যে এ বুঝি তাঁর কৃতজ্ঞতার প্রতিদান! কিছু পথ রাজবাহনকে এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন মাতঙ্গ।

গহ্বরপথে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরে এলেন রাজবাহন। কিন্তু কোথায় গেল?—তাঁর বন্ধুরা? সন্ধান করতে লাগলেন, দেশে দেশান্তরে।

ঘুরতে ঘুরতে একদা রাজবাহন পৌঁছলেন এসে বিশালা-নগরীর উপকণ্ঠে। শৈলপ্রান্তে একটি বিজন ক্রীড়াকুঞ্জ, তাতে বিশ্রাম করবেন ভাবছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, জনৈক নাগরিক আন্দোলিকায় আরোহণ ক'রে, একটি রমণী ও তাঁর জ্ঞাতিকুটুম্বদের সঙ্গে নিয়ে সেই ক্রীড়াকুঞ্জের উদ্যানে এসে প্রবেশ করলেন। নিকটে আসতেই সেই আন্দোলিকার আরোহীটির কেমন যেন প্রকাশ পেল ভাবান্তর। মনে হ'ল, তাঁর হৃদয়ে যেন হঠাৎ গজিয়ে উঠ্‌ল নব পল্লব, মুখে ফুটে উঠ্‌ল আনন্দের পদ্ম। আরোহীটি হঠাৎ চীৎকার দিয়ে উঠলেন:

"একি আমার প্রভু যে! সোমকুলের অবতংস, বিশুদ্ধযশোনিধি আমার প্রভু, রাজবাহন যে! মহাসৌভাগ্যে দর্শন পেয়েছি। আশ্চর্য, হঠাৎ পদমূলে এসে স্থান পেয়ে গেছি। একি আমি চোখ মেলে দেখছি, না, এ আমার নয়নের মহোৎসব?"

আন্দোলিকা থেকে সসম্ভ্রমে তিনি নেমে এলেন। দ্রুতচরণের ধ্বনি যেন উল্লসিত হর্ষের সঙ্গীত। রাজবাহনের চরণপদ্মে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। আমোদী মল্লিকাফুলের শেখর-বলয়খানি খসে প'ড়ে গেল চরণে।

রাজবাহনের নয়নেও বন্যার মতো উচ্ছল হয়ে উঠল আনন্দ। রোমাঞ্চিত অঙ্গে ঢেউ খেলে গেল আলিঙ্গনের নিবিড়তা! শুধু মুখ ফুটে তিনি বলতে পারলেন "সোমদত্ত, তুমি!"

রাজচম্পক বৃক্ষের শীতল ছায়ায় ব'সে দুটি বন্ধুর কথা আর ফুরোতে চায় না। রাজবাহন শেষে প্রণয়ভরে বললেন - "সখা, তা, এতকাল তুমিই বা ছিলে কোথায়? কোন্ সে দেশ? ছিলেই বা কেমন ক'রে? চলেছই বা কোথায়? আবার সঙ্গে দেখছি -- একটি তরুণী। তরুণী আর পরিজন। গোড়া থেকে সব বলো।"

এতদিন বাদে, বন্ধুর দর্শন পেয়ে সোমদত্তেরও যেন ছেড়ে গিয়েছিল চিন্তাজ্বর। করপদ্মখানি মুকুলের মতো বদ্ধ ক'রে উৎসাহভরে রাজবাহনকে সে তখন শোনাতে লাগল নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

সোমদত্তের আত্ম-কথা

"হে দেব, আপনার চরণপদ্মের সেবা করব, যে ক্রোরেই হোক আপনাকে খুঁজে বার করবই—এই কথাটা হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে দেশ-দেশান্তরে আমি ঘুরতে লেগে যাই। একদিন হয়েছে কি, ঘুরতে ঘুরতে এক বনের মধ্যে এসে পড়েছি। তৃষ্ণায় প্রাণ বুঝি যায় যায়। এমন সময় চোখে পড়ল একটি শীর্ণনদ; কী শীতল তার জল, দুটি তীর ঘনলতায় আচ্ছন্ন, গভীর নয়। প্রাণের আশ মিটিয়ে অঞ্জলিভরে জল পান করছি, এমন সময় দেখি জলের তলায় কী একটা পদার্থ ঝক্ঝক্ ক'রে জ্বল্‌ছে। তুললুম। দেখি অমূল্য একটি মণি। হাতের মুঠোর মধ্যে মণিটিকে নিয়ে ভাল ক'রে দেখতে দেখতে অগ্রসর হতে লাগলুম, কিন্তু অম্বরমণি সূর্যের তখন এত তীব্র জ্বালা যে চলা হ'ল দায়। বনের মধ্যে দেবায়তন ছিল—সেইখানেই প্রবেশ করলুম, বিশ্রামের আশায়। কিন্তু নির্জন ছিল না দেবায়তন। একটি দীনহীন ব্রাহ্মণ সেখানে ম্লানমুখে বসেছিলেন। সঙ্গে অনেকগুলি সন্তানসন্ততি। তাঁদের দেখে কেমন যেন আমার দয়া হোলো। জিজ্ঞাসা করলুম, "কুশল তো?"

মনের মধ্যে কিসের যেন একটি বিরাট আশা পোষণ ক'রে, ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে বললেন, "মহাভাগ, এই মাতৃহারাদের নানান্ উপায়ে রক্ষা করতে করতে এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে এসে পৌঁছেছি। ভিক্ষা ক'রে কোনোরকমে এদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিচ্ছি, আর এই শিবালয়ে আছি।"

আমি তখন তাঁকে প্রশ্ন করলুম, "ব্রাহ্মণ, নিকটেই ঐ দেখতে

পাচ্ছি একটি সৈন্যশিবির। বলতে পারেন তার অধিপতি কোন্ দেশের রাজা, তাঁর নামই বা কি ? আর এখানে এসেছেনই বা কেন ?”

উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন—

“সৌম্য, লাটেশ্বর ‘মত্তকাল’,—এই দেশের রাজা ‘বীরকেতু’র কন্যা তরুণীরত্ন ‘বামলোচনা’র অসামান্য রূপলাবণ্যের কাহিনী শুনে অধীর হয়ে কিছুদিন পূর্বে বিবাহপ্রস্তাব ক’রে পাঠান। কিন্তু বীরকেতু প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। মত্তকাল তখন অবরোধ করেন “পাটলী”-নগরী। শেষে ভীত হয়ে কন্যাটিকে মহান একটি উপঢৌকনের মতো মত্তকালের কাছে পাঠাতে বাধ্য হন বীরকেতু। তরুণীরত্নটিকে লাভ ক’রে সানন্দে লাটেশ্বর এখন নিজের রাজধানীতে ফিরে চলেছেন এবং তাঁর অভিলাষ, —দেশে ফিরে গিয়ে নিজের রাজপুরীতেই বিবাহবিধি সুসম্পন্ন করবেন। কিন্তু মৃগয়ায় তাঁর অত্যন্ত প্রীতি। তাই এই অরণ্যে সৈন্যদের কিছুদিন বসিয়ে দিয়েছেন। বীরকেতুর কন্যার সঙ্গে চলেছেন মন্ত্রী মানপাল। মানই তাঁর কাছে ধন। চতুরঙ্গবল নিয়ে তিনিও এখানেই শিবির রচনা ক’রে রয়েছেন। প্রভুর অপমানে তাঁর মন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ, —এবং কী উপায়ে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায় সেই চিন্তাতেই তিনি সদা মগ্ন।”

ব্রাহ্মণের অনেকগুলি সন্তান, ব্রাহ্মণ বিদ্বান অথচ নির্ধন, বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন—কিছু দান করা যাক্ তাঁকে,—এই মনে ক’রে দয়া ক’রে, ব্রাহ্মণটিকে দান ক’রে দিলুম সেই মণি। পরম আহ্লাদে অনেক আশীর্বাদ করতে করতে ব্রাহ্মণ বিদায় নিয়ে কোথায় যেন চ’লে গেলেন। আমিও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। গভীর নিদ্রায় অতি শীঘ্রই আচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম।

হঠাৎ একটা তীব্র নাড়া পেয়ে,—ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম চোখে দেখি, সেই ব্রাহ্মণ যেন চীৎকার ক’রে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে

বলছেন, "দস্যু, এই সেই দস্যু।" ঘুম ছুটে গেল। দেখলুম ব্রাহ্মণের হাত পা শিকল দিয়ে বাঁধা, সারা গায়ে কশাঘাতের লাঞ্ছনা, খড়্গ-হাতে কতকগুলি রাজপুরুষ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, এবং ব্রাহ্মণ চীৎকার করছেন 'এই সেই দস্যু, দস্যু'।

রাজপুরুষেরা তখন ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দিয়ে আমাকেই নির্দয়ভাবে বাঁধল একগাছি মোটা দড়ি দিয়ে। কোথায় কেমন ক'রে রত্নটি আমি কুড়িয়ে পেয়েছি সে কথা বলতে গেলুম, কিন্তু তারা কালা হয়ে রইল, শুনলেও না, টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গেল ; কারাগারের কবাট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে আমাকে তার ভিতরে ; বললে "এবার, বন্ধুদের নিয়ে থাক।" এই ব'লে আমায় আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে কারাসঙ্গীদের। তাদেরও হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা।

নিজেকে মূঢ়ের মতো বোধ হতে লাগল। কী যে করব ভেবেই পেলুম না। নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে গেলুম। সঙ্গীদের মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণপরে বললুম, "ভাই-গণ, তোমাদের দেখে তো নির্বীর্য ব'লে মনে হচ্ছে না। তবে এই কারাগারে এ যন্ত্রণা ভোগ কেন? ওরা যে ব'লে গেল তোমরা আমার বয়স্য—তার অর্থটাই বা কি?"

চৌর্যবিশারদেরা আমার কাছে তখন লাটেশ্বর মত্তকালের—সেই ব্রাহ্মণ বর্ণিত—বৃত্তান্তটি জ্ঞাপন ক'রে বললে ঃ

"মহাভাগ, আমরা মহারাজ বীরকেতুর মন্ত্রী 'মানপালে'র বিশ্বস্ত কিঙ্কর। তাঁরই আদেশমতো লাটেশ্বরকে বধ করবার জন্যে শয়নকক্ষ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন করেছিলুম। সুড়ঙ্গদ্বার দিয়ে কক্ষে প্রবেশও করেছিলুম। কিন্তু মত্তকাল সেখানে ছিলেন না। বিষাদের ব্যাপার! শয়নকক্ষে যা কিছু মণিমাণিক্য ধনরাশি ছিল সেগুলিকে হস্তগত ক'রে মহারণ্যে প্রবেশ করি। তার পরের দিন পদান্বেষী রাজ-অনুচরেরা লুণ্ঠন-সামগ্রীসমেত আমাদের ধ'রে ফ্যালে, বেঁধে নিয়ে আসে এখানে। মণিমাণিক্য মিল করবার সময় দেখা যায়—একটি মণি পাওয়া যাচ্ছে

না। সেইটিই নাকি অমূল্য মণি। সেটিকে ফিরত না পাওয়া গেলে আমাদের প্রাণ হারাতে হবে, ঘাতকের হাতে। তাই এই শৃঙ্খলের ব্যবস্থা।”

বৃত্তান্ত শুনে বুঝতে পারলুম ব্যাপারটি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কারাগারবয়স্যদের কাছে আমি তখন প্রাণ খুলে ব'লে গেলুম—এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার কতখানি সংশ্রব, আমার নাম, ধাম, পরিচয়,—আপনাকে খোঁজবার জন্য আমার পৃথিবী-পর্যটনের কাহিনী। সময়োচিত সংলাপে বিশেষ মিত্রতা পাতিয়ে ফেললুম তাদের সঙ্গে। তার পরে অর্ধরাত্রে, কারাগৃহ যখন সুপ্ত, বয়স্যদের এবং আমার—ভেঙে ফেললুম শৃঙ্খল। শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে তারা আমার অনুসরণ করল। প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাদের অস্ত্রগুলি হস্তগত ক'রে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসি। পুররক্ষীরা আমাদের আক্রমণ করেছিল, কিন্তু চাতুর্য এবং পরাক্রমের সহায়তায় আমরা অবলীলাক্রমে তাদের দমন করি; প্রবেশ করি মানপালের শিবিরে, রক্ষা পাই। মানপাল কিঙ্করদের মুখে আমার কুলাভিমানবৃত্তান্ত ও তৎকালীন বিক্রমের কাহিনী শুনে খুশী হয়ে আমাকে প্রচুর আদরযত্ন করেন।

তার পরের দিন মত্তকালের শিবির থেকে কয়েকজন রাজপুরুষ আসেন এবং মানপালের নিকটে নিবেদন করেন মত্তকালের ক্রূরতর ভাষণ—“মন্ত্রী, আমাদের রাজমন্দিরে সুড়ঙ্গ খনন ক'রে ঐশ্বর্য অপহরণ করেছে চৌরবীরেরা। তারা আশ্রয় লাভ করেছে আপনার শিবিরে। আমাদের হস্তে তাদের সমর্পণ করুন। নচেৎ মহান্ অনর্থ ঘটবে।”

মন্ত্রী মানপালের লোচন ক্ষোভে ও অপমানে আরক্ত হয়ে ওঠে। তীব্রকণ্ঠে তিনি বলেন, “লাটেশ্বর আবার কে? তাঁর সঙ্গে আবার মৈত্রী! কী হবে মূর্খের সেবা ক'রে? কি লাভ তাতে?”

ভর্ৎসিত হয়ে মত্তপালের অনুচরেরা ফিরে যায় এবং মত্তপালের

কাছে নিবেদন করে মানপালের বিপ্রলাপ। লাটেশ্বর তখন ক্রোধে এবং বাহুবীর্যের অতি গর্বে অন্ধ হয়ে, অল্পসংখ্যক সৈনিক নিয়েই মানপালের শিবিরের দিকে ধাবমান হন।

খণ্ডযুদ্ধ হয়। মানী মন্ত্রী মানপাল কিন্তু আগে থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। মন্ত্রীদত্ত রথে আরোহণ ক'রে আমিও যুদ্ধে নামলুম। অশ্ববাহিত রথ, চতুর সারথি, দৃঢ়তর কবচ, অনুরূপ ধনু, বিবিধবাণপূর্ণ দুটি তূণীর, আয়ুধের সংগ্রহ—কাজেই নিজের বাহুবলে বিশ্বাস না থেকে যায় না মানুষের ; মত্তকালের বিরুদ্ধে অভিযান চালালুম। বাণের বর্ষণে বর্ষণে তাঁকে শ্রান্ত ক'রে দিলুম, তার পরে বেগবান্ অশ্ববাহিত রথে উভয়সৈন্যকে অতিক্রম ক'রে, মত্তকালের রথের নিকটে নিজের রথখানিকে নিয়ে গিয়ে, লাফিয়ে পড়লুম তাঁর রথে। দেরি হ'ল না ; মুহূর্তের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শত্রুর দ্বিখণ্ডিত শির। মত্তকালের বিনিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই হতাবশিষ্ট সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। হস্তী অশ্ব ধনসামগ্রী, সমস্ত সংগ্রহ ক'রে রণক্ষেত্র থেকে ফিরে আসি, এবং মন্ত্রী মানপালের নিকটে লাভ করি প্রভূত সম্মান এবং সেবা। রাজা বীরকেতুর নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল সংবাদ। আমার বীরত্বে বিস্মিত হয়ে তিনিও আমাকে অভ্যর্থনা করলেন এবং বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যদের অনুমতি নিয়ে একদা শুভদিনে মহোৎসবের মধ্য দিয়ে আমাকে সম্প্রদান ক'রে দিলেন তাঁর কন্যা,—'বামলোচনা'কে।

তিনি আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। কিন্তু এত সুখ এত আনন্দ, রাজা বীরকেতুর এত প্রসন্নতা, বামলোচনার এত সঙ্গসৌখ্য, সমস্তের মধ্যেও আপনার বিরহ আমাকে বিঁধছিল শল্যের মতো, বিকল ক'রে রেখেছিল আমার হৃদয়।

মাত্র সেদিন এক সিদ্ধ পুরুষ আমাকে আদেশ দেন,—'সুহৃদের মুখাবলোকনফল যদি পেতে চাও, উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরে

যাও, পরমেশ্বরের আরাধনা কর, পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে যেও।' তাই এখানে এসেছি। ভক্তবৎসল গৌরীপতি তাঁর অপার করুণায় আমাকে লাভ করিয়ে দিয়েছেন আপনার চরণ-কমল-দর্শনের পরমানন্দ।"

সোমদত্তের আত্ম-কথা শুনে রাজবাহন অভিনন্দন করলেন তাঁর পরাক্রমের। দৈবকে দিলেন ধিক্কার।—নিরপরাধীকে দণ্ড দেওয়া কি দৈবের শোভা পায়! নিজের আত্মবৃত্তান্ত সোমদত্তকে বলতে যাবেন, এমন সময় দেখতে পেলেন—একি, সামনে যে 'পুষ্পোদ্ভব'! তারপর মুহূর্তের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেল প্রণাম, গাঢ় আলিঙ্গন, আনন্দাশ্রু-পতনের পূর্ণ সমারোহ। এই দেখ, কে এল, এখানে কে এল! সোমদত্ত, দেখ, পুষ্পোদ্ভব এসেছে।

তার পরে তাঁরা সকলে মিলে রাজচম্পক-বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করলেন। রাজবাহন বললেন,

"বয়স্য পুষ্পোদ্ভব, সেদিন—ব্রাহ্মণের কিছু উপকার করতে হবে, অথচ বন্ধুদের জানালে তারা যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আবার মুশকিলেও পড়তে হবে,—এই চিন্তা ক'রে, ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাদের ফেলে রেখে আমি চ'লে গিয়েছিলুম রাত্রে। তার পর তোমরা জেগে উঠে আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলে। এবার বল, একলা কোথায় তুমি গিয়েছিলে?"

ললাটতটে অঞ্জলির চুম্বন দিয়ে, আলাপে বিনয় ফলিয়ে পুষ্পোদ্ভব বলতে লাগল—

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

পুষ্পোদ্ভবের আত্মকথা

ব্রাহ্মণের উপকার করবার জন্যে নিশ্চয় আপনি চ'লে গেছেন ;—সকলে মিলে এই সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছেছিলুম। কিন্তু কোথায় কোন্ দেশে যে আপনি যেতে পারেন, সেইটির নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হ'ল। তখন সকলের পরামর্শ মতো, এক-এক দিকে আমরা এক-একজন, আপনাকে খুঁজতে বেরই।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন, মাটি ফাট্‌ছে সূর্যের তেজে,—অসহ্য গরম,—বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হ'ল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সেই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে ছিল প্রকাণ্ড একটি ছায়াঘন গাছ। তারই তলদেশে ব'সে পড়লুম। ব'সে আছি,—এমন সময় আমার সামনেই,—মাটির উপর একটা ছায়ার ছবি পড়ল। কূর্মাকৃতি একটি মনুষ্যছায়া ; সারা অঙ্গ যেন সিঁটিয়ে কুঁচকিয়ে আছে সেই রকমের একটা ছায়ার ছবি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, তাইতো, পাহাড়ের চুড়ো থেকে একটা মানুষ খসে প'ড়ে যাচ্ছে—ভয়ানক বেগে সেটি নেমে আসছে মাটির দিকে ;—ভৃগুপতন! হঠাৎ মনটা কেমনধারা হয়ে গেল, বোধ হয় জাগল দয়া। যাক্, পড়ন্ত মনুষ্যটিকে কোন রকমে ধ'রে ফেলি। সংজ্ঞা লোপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। শীতল উপচারের ব্যবস্থা ক'রে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। এ রকম ভৃগুপতনের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করাতে চোখের জল মুছে তিনি বললেন,—

"সৌম্য, আমার নাম রত্নোদ্ভব ; মগধরাজ্যের মন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের আমি পুত্র। বাণিজ্য-ব্যপদেশে 'কালযবন দ্বীপে' যাই। সেখানকার একটি বণিক্-কন্যাকে বিবাহ ক'রে ফিরে আসছিলুম—সমুদ্রে পোতখানি ডোবে। তীরের কাছেই ডুবেছিল। দৈবগতিকে আমি

রক্ষা পেয়েছি বটে, কিন্তু কোথায় যে গেলেন আমার পত্নী তার কোনো দিশাই পাই নি। এক লবণ-সমুদ্র থেকে পড়েছি আর এক লবণসমুদ্রে অশ্রুর। পরে একটি সিদ্ধ তাপসের সঙ্গে দেখা হয়, তিনিই আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন—বলেছিলেন—'ষোলটা বছর কোনো রকমে কাটিয়ে দে—সব ফিরে পাবি—তোর দুঃখের অবসান হবে।' ষোল বছর কেটে গেল কিন্তু দুঃখের অবসান তো হ'ল না। তাই পাহাড়ের চুড়ো থেকে এই ভৃগুপতনের আশ্রয় নিয়েছিলুম।"

এমন সময়ে রাজকুমার, হঠাৎ একটা চীৎকার ভেসে উঠল অরণ্যে। নারীকণ্ঠের চীৎকার! চমকে উঠলুম। কে যেন চীৎকার ক'রে বলছে "কোরো না, সিদ্ধপুরুষের আদেশ অমান্য কোরো না; তিনি বলেছেন, স্বামী, পুত্র তুমি ফিরে পাবে। অধীর হয়ে ঝাঁপিয়ে পোড়ো না আগুনে···।"

ততক্ষণে আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, যে এঁরাই আমার জনক এবং জননী। আমি বললুম, "তাত, আপনাকে বলবার অনেক কিছু রয়েছে আমার। কিন্তু এখন থাক। পরে সমস্ত বল্‌ব। আমাকে ঐ স্ত্রী-কণ্ঠের আর্তধ্বনির দিকে এখনি ছুটতে হবে। অপেক্ষা করতে পারছি না। আপনি বরং এইখানেই কিছুকাল বিশ্রাম করুন।"

কিন্তু তিনি সেখানে রইলেন না। আমরা দু'জনে ছুটলুম সেই দিকে, যেখান থেকে ভেসে এসেছিল আর্তচীৎকার। গিয়ে দেখি—সামনেই জ্বলছে প্রচণ্ড এক শিখাশালী আগুন, আর তাতে অবগাহন করবার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটি সাহসিকা—স্থির বদ্ধাঞ্জলি। কোনো কথা না ব'লে তাঁকে আগুনের নাগালের বাইরে ক'রে দিলুম, এবং নিয়ে এলুম সেখানে, যেখানে পিতৃদেব ছিলেন—দাঁড়িয়ে। আগুনের কাছেই একটি বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিই চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন। তাঁকেও টেনে নিয়ে এলুম। "এই হেন ঘন বনের

মাঝখানে এ কি সব কাণ্ড আপনারা আরম্ভ করেছেন ?" এই প্রশ্ন করাতে স্থবিরাটি তখন ধরা-গলায় থেমে বলতে লাগল :

"বাছা, কালযবন দ্বীপের বণিক্ কালগুপ্তের ইনি মেয়ে,—'সুবৃত্তা', স্বামী রত্নোদ্ভবের সঙ্গে ফিরছিলেন, ভরাডুবী হয়। আমি ওঁর ধাত্রী। কাঠের একটা ফালি ধ'রে আমরা বেঁচে যাই। তার উপর ওঁর তখন সন্তান-সম্ভাবনা। তীরে এক বনের মধ্যে ছেলেটি কোলে এলো। কিন্তু আমাদের কপাল এত মন্দ—বুনো হাতী ছেলেটিকে শুঁড়ে জড়িয়ে নিয়ে সেই যে চ'লে গেল আর ফিরল না। তার পরে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের দুজনের ষোল বছর কেটে গেছে। সিদ্ধপুরুষ বলেছিলেন 'ষোল বছর অপেক্ষা কর, স্বামীপুত্র ফিরে পাবে'; কিন্তু সিদ্ধ পুরুষের বাক্য ফলল না। চোখের সামনে আমাকে তাই দেখতে হচ্ছে দেবীর অগ্নিপ্রবেশ। এত দিন আমরা সেই সিদ্ধ পুরুষের পুণ্যাশ্রমেই আশ্রয় পেয়েছিলুম।"

ব্যাপার কি, বুঝতে বাকি রইল না। জননীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম। সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললুম, এবং সর্বশেষে আমার পিতৃদেবকে ধ'রে দিলুম মায়ের সামনে। কী বিস্ময়, কী অপার আনন্দ! ষোল বছর পার হয়ে গেছে—তবু তাঁদের দুজনকার এক মুহূর্তও সময় লাগল না চিনে নিতে নিজেদের। আনন্দাশ্রুর ধারাজল দিয়ে আমাকে স্নান করাবার সে কি ধূম! কী সুখে যে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে, আঘ্রাণ করলেন মস্তক! তারপরে গাছের ছায়ায় ব'সে নিশ্চিন্ত মনে আমাকে সুধালেন,

"পুষ্পোদ্ভব, মহারাজ রাজহংস কেমন আছেন ?"

তাঁদের প্রথম কথা পরিচয়ের!

জানালুম সব,—মহারাজ রাজহংসের কেমন ক'রে রাজ্য গেল, তারপরে আপনি জন্মালেন, দশটি কুমার আমরা কেমন ক'রে সম্মিলিত হলুম, তার পরে আমাদের দিগ্‌বিজয়ে প্রয়াণ ইত্যাদি।

এর পরে আমরা আশ্রয় নিই একটি মুনির আশ্রমে।

এ তো গেল আমার জনক-জননী-লাভ। কিন্তু রাজকুমার, তখনও আমি, এত চেষ্টা সত্ত্বেও আপনার কোনো খবর করতে পারি নি। নবীন উৎসাহে আবার আরম্ভ করলুম সন্ধান। হঠাৎ মনে হ'ল—অর্থ না থাকলে কিছু হয় না। সফলতার বেদী হচ্ছে অর্থ। আপনার অনুগ্রহে আমি লাভ করেছিলুম ইন্দ্রজাল বিদ্যা। শিষ্য-সৃষ্টি করলুম; যারা আমার কার্যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে এমন সব দক্ষ শিষ্য। সমৃদ্ধশিষ্য-সমভিব্যাহারে আমি তখন বিন্ধ্যারণ্যের অনেক প্রদেশে,—যেখানে যেখানে পুরাতন পত্তন ছিল, সেখানে সেখানে, পৃথ্বীচর্মের নিম্নে, মহীরুহের তলদেশে,—কমলার উল্লসিত শিবির অনুসন্ধান-ব্যাপারে নিয়োজিত ক'রে দিলুম নিজেকে। ফল ভাল হ'ল। সিদ্ধাঞ্জনের আনুকুল্যে জানতে পারতুম কোথায়, কোন গাছের তলায় লুকোনো রয়েছে নিধি। রক্ষীদের চোখের উপর দিয়েই খুঁড়ে তুলে ফেলতে লাগলুম কলসী কলসী ধনরত্ন, রাশি-রাশি দীনার। নিকটেই বণিকদের কটক ছিল, সেখান থেকে খরিদ করলুম কতকগুলো বলীবর্দ। ডবল থলেয় ভ'রে ভ'রে তাদের পিঠে চাপিয়ে মাল নিয়ে কোথায় যাচ্ছি, কার সওদা কোথায় চালান করছি তা কেউ বুঝে উঠ্‌তে পারত না। লোক-চক্ষুকে এড়িয়ে নগরে নিয়ে আসতে লাগলুম রত্ন। 'চন্দ্রপাল'—বণিকের সে ছেলে, সেই কটকের অধিকারী—আমার মহা বন্ধু হ'ল;—তাকে সঙ্গে নিয়ে উজ্জয়িনীতে ব'সে গেলুম। অদ্ভুত ঐশ্বর্যে আমি তখন মহীয়ান্। জনক-জননীকেও নিয়ে এলুম উজ্জয়িনীতে। চন্দ্রপালের পিতা 'বন্ধুপাল'—তিনিও এক অসামান্য গুণী লোক। আমার জনক-জননীর সঙ্গেও তাঁর বিশেষ হ'ল হৃদ্যতা। মালবরাজের সঙ্গে তিনিই ঘটিয়ে দেন আমার দর্শন ও পরিচয়, এবং রাজার অনুমতি নিয়েই আমি গূঢ় বসতি করতে থাকি উজ্জয়িনীতে।

এতোর মধ্যেও আপনার কিন্তু অন্বেষণ চলছিল। বনে বনে আমি ঘুরে বেড়াতুম, খুঁজতুম। আমার দুশ্চিন্তা দেখে একদিন শকুন-বিদ্যাবিশারদ বন্ধুপাল পরমমিত্র আমাকে ডেকে বললেন, "দেখুন, পৃথিবী ঘুরে একটা মানুষ খোঁজা অত সহজ কথা নয়। মন থেকে গ্লানি দূর ক'রে দিয়ে কিছুদিন চুপ করে থাকুন। যখন আপনার নায়কের সঙ্গে আপনার দেখা হবার শুভশকুন দেখব তখন আমিই আপনাকে জানিয়ে দেব।"

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলুম তাঁর বচনামৃতে। সেই থেকে তাঁর কাছে কাছেই ফিরি। কখন কোন্ পাখীর মুখে কী খবর যে তিনি পান!

এই রকম চলেছে, হঠাৎ একদিন একটি 'বালচন্দ্রিকা' চোখে পড়ল। আহা, চোখে যেন জ্যোৎস্না ঝরাল! তরুণীরত্নটিকে দেখাও যা পুষ্পধনুর বাণ খাওয়াও তা। নব যৌবন জড়িয়ে ধরেছিল তার প্রত্যেকটি অঙ্গ। বণিকমন্দিরের লক্ষ্মীরাণী—লাবণ্যের তরঙ্গ তুলে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমার প্রাণের ধীরতাকে।

ক্ষণপরেই বুঝতে পারলুম বালচন্দ্রিকাও আমাকে ফিরে ফিরে লক্ষ্য করছে। কটাক্ষ তো নয়—যেন ফুলবাণের বাণ-ছোঁড়া। দেখলুম সেও কাঁপছে, যেমন ক'রে লতা কাঁপে—হাল্কা হাওয়ার দোল খেয়ে। হঠাৎ তার চোখের কোণটি কুঁচকে গেল, চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল অনুরাগ আর লজ্জা, আর তার মনের কথাটি যেন সেই চাহনির রাজপথ ধ'রে আমার দ্বারে এসে পৌঁছে গেল। গূঢ় চতুর প্রচেষ্টায় তার মনের অনুরাগটিকে ভাল করে বুঝে নিলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘন হয়ে উঠল চিন্তা, কেমন ক'রে হতে পারে আমাদের সুখ-মিলন।

তারপর সেদিন আমি এবং বন্ধুপাল, পাখীদের কাছ থেকে আপনার গতিবিধি জানবার বাসনায়, উজ্জয়িনীর উপান্তে একটি

বিহার-কাননে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ বিরাট একটি গাছের তলায় পৌঁছতেই বন্ধুপাল দাঁড়িয়ে গেলেন। কী যেন কি শুনতে লাগলেন মন দিয়ে। আমি আর কি করি, মনের উৎকণ্ঠা মনেই রেখে বনান্তে পরিভ্রমণ করতে করতে উপস্থিত হলেম কানন-সরোবরের সুন্দর তীরে। চেয়ে দেখি,—বালচন্দ্রিকা! ব'সে রয়েছে। চিন্তায় আক্রান্তচিত্ত, মুখে অদ্ভুত দীনতা। আমি কিন্তু বেশ একটু অনুভব করলুম, প্রেম-লজ্জা কৌতুক-মনোরম দর্শন-সুখ। মনে হ'ল, ওর পদ্মমুখে ঐ যে দেখা যাচ্ছে একটি বিষণ্ণতা—ওটির জন্ম বোধ হয় ভালবাসার বেদনা থেকেই। কাছে এগিয়ে গেলুম—জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললুম, "সুন্দরি, পদ্মের মতো তোমার মুখখানিতে, ছায়া কেন বিষাদের?"

তখন কেউ ছিল না সরোবরের তীরে। এবং আমার উপর বোধ হয় অকারণ বিশ্বাস জন্মিয়ে গিয়েছিল ব'লেই, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ ক'রে বালচন্দ্রিকা ধীরে ধীরে বললে :

"সৌম্য, মালবরাজ মানসার অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন। নিজের ছেলে দর্পসারকে অভিষিক্ত করেছেন উজ্জয়িনীতে। সাত সাগর পৃথিবী —শাসন করতে করতে কিন্তু যুবরাজ দর্পসারের বৈরাগ্য আসে। নিজের পিতৃষ্বসার উদ্দণ্ডকর্মা দুটি পুত্র—চণ্ডবর্মা এবং দারুবর্মা—তাঁদের হাতে রাজ্যপরিচালনের ভার সমর্পণ ক'রে তিনি তপস্যার জন্যে 'রাজরাজগিরি'তে যাত্রা করেন। চণ্ডবর্মা সত্যিই সুন্দরভাবে রাজ্য শাসন করছেন, কিন্তু দারুবর্মা একটি পাষণ্ডবিশেষ। দর্পসারকে তিনি অগ্রাহ্য করেন ; পরস্ত্রী লুণ্ঠন, পরদ্রব্য অপহরণ—কোনো দুষ্কর্মই বাদ দেন না। আপনার সঙ্গে দেখা হবার পরে দারুবর্মা কোথায় না জানি আমাকে দেখেছেন। কন্দর্পের মতো একজনের লাবণ্যকে আমি যে ভালবেসেছি তিনি তা জানেন, তবুও কন্যা-দূষণ-দোষ—অত বড় যে অপরাধ—সেটিকে ধর্তব্যের মধ্যেই তিনি আনছেন না। বলপ্রয়োগ,

ক'রে আমাকে তাঁর রতিমন্দিরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। তাই ভাবছি কি করব।"

বালচন্দ্রিকার কথা শুনে, তার চোখে জল দেখে, এবং কথার ভঙ্গিতে ভালবাসার নৈবেদ্যলাভ ক'রে ভাবতে লাগলুম—আমার মনোরথ সিদ্ধির অন্তরায় ঐ দারুবর্মাটাকে ইহলোক থেকে কেমন ক'রে সরাই? বালচন্দ্রিকাকে আশ্বাস দিয়ে অনেক বিচার ক'রে শেষে বলি :

"তরুণি, পাষণ্ড দারুবর্মাকে নিকাশ করবার একটি মৃদু উপায় আমি ঠিক করেছি। তোমার লোকজনদের কাছে গিয়ে বলো, তারা যেন এই অতি-সত্য খবরটিকে নগরময় রাষ্ট্র ক'রে দেয়। তারা ঘোষণা করুক,—'বালচন্দ্রিকাতে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন এক যক্ষ। বালচন্দ্রিকাকে ভালোবাসেন, বা সম্পদের আশায় তাঁকে বিবাহ করতে চান এমন যদি কোন সম্বন্ধযোগ্য সাহসিক থাকেন—তাঁর পক্ষে তাঁকে লাভ করবার একটি মাত্র উপায় রয়েছে। একটি মাত্র সখী সঙ্গে নিয়ে মৃগনয়না বালচন্দ্রিকা রতিমন্দিরে প্রবেশ করবেন। সেখানে যক্ষকে বধ ক'রে সংলাপের অমৃতবর্ষণে যে সাহসিক জয় করতে পারবে তাঁর হৃদয়, তাঁরই সঙ্গে শুভবিবাহ ঘটবে রূপসীর। এটি সিদ্ধাদেশ।'

এই ঘোষণার পরে, বুঝেছ সুন্দরি,—দারুবর্মা যদি যক্ষের ভয়ে চুপচাপ থেকে যায় তা হ'লেই মঙ্গল। কিন্তু যদি দৌর্জন্যের আশ্রয় নিয়ে তোমাকে কামাধীন করতে চায় তা হ'লে তাকে এই কথা ব'লো, 'দেখুন, আপনি পৃথ্বীপতি দর্পসারের অমাত্য। আমার নিবাসে উপস্থিত হয়ে এই হেন দুঃসাহসের কাজ করা আপনার শোভা পায় না। পৌরজনদের সাক্ষী ক'রে আপনার মন্দিরে আমাকে নিয়ে চলুন। সেখানে যদি সিদ্ধাদেশ অনুযায়ী কর্তব্য পালন ক'রে আপনি আয়ুষ্মান হন তা হ'লে আমাকে বিবাহ ক'রে মনোরথ পালন করবেন।'

তন্বি, তুমি দেখো, দারুবর্মা এ কথা মেনে নেবে, স্বীকার করবে। সখী-বেশধারী আমাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি তখন তার মন্দিরে যাবে। আমিও সেই একান্ত-নিকেতনে মুষ্টি, জানু আর পদাঘাতে তাকে কৃতান্তপুরে পাঠিয়ে দিয়ে, তোমার সখীর ছলে আবার তোমার সঙ্গেই নিঃশঙ্কে বেরিয়ে আসব। পরেরটুকু সুন্দরি তোমার কাজ। কিন্তু এই সব কথা তোমায় খুলে বলতে হবে তোমার জনক জননীর কাছে। আমাদের ভালবাসার ফুল যাতে পরিণয়-ফলে পৌছয়, তার ব্যবস্থা নির্ভর করছে তোমার অনুনয়ের সফলতার উপর। তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবেন। বংশের সম্পৎ লাবণ্য বাড়বে বই কমবে না। তাঁদের কাছে দারুবর্মার এই মারণ উপায়টিকে কিন্তু ব'লো। জানিও তাঁরা কি বলেন।"

আমার কথা শুনে একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠল বালচন্দ্রিকার পদ্মমুখ। সে বললে "আপনার সৌভাগ্যই যদি ঐ পাষণ্ড দারুবর্মার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে—তো পারবে। যদি মরে, তবেই সফল হবে তোমার মনোরথ। আপনি যা বললেন, সেই মতোই আমি কাজ করব।" এই রকমের উল্টোপাল্টা বলতে বলতে বালচন্দ্রিকা ধীরে ধীরে চ'লে গেল বাড়িতে। যাবার বেলায় ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে দেখার সে কি সুন্দরীপনা!

ভাবতে ভাবতে বন্ধুপালের কাছে ফিরে এলুম। এসেই, গভীর আনন্দের সঙ্গে শুনলুম, বন্ধুপাল পাখীদের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন আপনার গতিবিধির। বন্ধুপাল জানালেন,—তিরিশটি দিন কাটলেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়ি ফিরে এলেন বন্ধুপাল এবং আমাকে দিলেন বিদায়। বাড়ি এলুম, ভাবতে লাগলুম।

শেষে বালচন্দ্রিকার কাছ থেকে দূতী এল। ব'লে গেল "দারুবর্মা ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাঁর রতিমন্দিরে তিনি বালচন্দ্রিকাকে

বিহারের জন্যে আহ্বান করেছেন এবং বালচন্দ্রিকাও জানিয়েছেন—যাবেন।”

আমি তখন বেরুলুম। কিন্তু পুরুষ বেশে নয়, স্ত্রীবেশে। পায়ে পরলুম মণিনূপুর, কোমরে দিলুম মেখলা; হাতে বাঁধলুম কটক কঙ্কণ, কানে দোলালুম তাড়ঙ্ক; গলায় হার, ক্ষোমবাস, নয়ন দুটিতে কজ্জল—। যেখানকার যেটি সেখানে সেটি নিপুণভাবে বসিয়ে নিয়ে যখন আমি বেরুলুম, তখন একেবারে চেনা যায় না আমাকে। আমি সখী হয়ে গেছি!!—বালচন্দ্রিকার সঙ্গে দারুবর্মার মন্দিরে এসে পৌঁছলুম। দ্বারদেশে সাদর অভ্যর্থনা। আহ্বান ক'রে আমাদের নেওয়া হ'ল ভিতরে; দ্বারপ্রান্তে নিবারিত হ'ল অশেষ পরিবার। সঙ্কেতাগারে প্রবেশ করলুম।

সারা নগরে তখন রাষ্ট্র হয়ে গেছে যক্ষ-বৃত্তান্ত। যক্ষ-কথা পরীক্ষা করবার জন্যে অনেক নাগরিক কুতূহলী হয়ে জড়ও হয়েছেন দারুবর্মার প্রতিহার ভূমিতে।

দারুবর্মা প্রবেশ করলেন রতিমন্দিরে। ঘরের মধ্যে—যেখানে অন্ধকারখানি গাঢ়—সেখানে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। আমি যে পুরুষ, মনোরম স্ত্রীবেশে এসেছি, দারুবর্মা তা বুঝতে পারলেন না। তাঁর তখন মস্তিষ্কে বিবেক ব'লে কি কিছু ছিল? অনুরাগের আতিশয্যে তিনি স্ফীত হয়ে উঠছিলেন। রত্নখচিত হৈম পালঙ্ক, তার উপর হংসতূলগর্ভ শয্যা,—তরুণী বালচন্দ্রিকাকে—সেখানে নিয়ে তিনি বসালেন। তরুণীর হাতে এবং আমারও হাতে দৃকপাত না ক'রে দারুবর্মা সত্বর তুলে দিতে লাগলেন—মণিমুক্তা বসানো জড়োয়া অলঙ্কার, সূক্ষ্ম চিত্র বসন, কস্তুরী মেশানো হরিচন্দন, কর্পূরবাসিত তাম্বুল এবং সুরভিপুষ্প! তুলে দিয়ে দারুবর্মা হেসে হেসে একটু কথা কইলেন। মাত্র দুটি মুহূর্ত। তার পরেই কামান্ধ হয়ে যৌবনপুষ্প চয়ন করতে উদ্যত হলেন সুমুখীর।

আমিও আর বিলম্ব করলুম না। রোষে আমার সর্বশরীর তখন

আগুন হয়ে উঠেছে। নিঃশব্দে পালঙ্ক থেকে দারুবর্মাকে টেনে মাটিতে ফেললুম, ফেলে দিয়ে মুষ্টি, জানু এবং পদাঘাতে তাকে প্রহার করতে লাগলুম—জর্জর প্রহার। দারুবর্মাকে আর চোখ মেলতে হ'ল না। বাহুযুদ্ধে অলঙ্কারগুলি স্থানভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল; সেগুলিকে যথাস্থানে আরোপণ ক'রে নতাঙ্গী বালচন্দ্রিকাকে ক্ষণকাল সেবা করলুম। ভয়ে সে তখন থরথর ক'রে কাঁপছে। তার পরে স্ত্রীবেশে অঙ্গনে বেরিয়ে এসে স্ত্রী-কণ্ঠে চীৎকার দিলুম "হায়, হায়! সেই ভয়ানক যক্ষটা, যেটা বালচন্দ্রিকাকে ভর করেছিল, দেখ, সে খুন করছে দারুবর্মাকে। দৌড়ে এস, বাঁচাও।"

পৌরজন যারা দ্বারোপান্তে ভিড় করেছিল তারা আকাশ ফাটিয়ে রব তুলে চতুর্দিক বধির ক'রে প্রথমে হা-হা ধ্বনি ক'রে উঠল। কিন্তু পরেই বলাবলি করতে লাগল "জেনে শুনে গায়ের জোর ফলাতে গিয়েছিলেন যক্ষের সঙ্গে!—নিজের কর্মে নিজেই মরেছেন!—কে বলেছিল মূর্তিমানকে এমন মদান্ধ হয়ে সাক্ষাৎ মরণকে নেমন্তন্ন করতে?—এর জন্য আবার শোক করা কিসের?" তার পরে পৌরজনেরা দারুবর্মার রতিমন্দিরে প্রবেশ করে। আমিও সেই হট্টগোলের ফাঁকে, অবসর বুঝে চটুলনয়নাকে সঙ্গে নিয়ে নিপুণ ভাবে সহসা অন্তর্ধান হই। সোজা গৃহে আসি।

তার পরে কয়েক দিন কেটে গেল। পৌরজন সমক্ষে সিদ্ধাদেশ অনুসারে আমার বিবাহ হ'ল বালচন্দ্রিকার সঙ্গে। বহু দিন ধ'রে যে সব ভালবাসার ও মিলনের ছবি এঁকেছিলুম মনের মধ্যে, সেগুলিকে সাজানোর সুবিধা হ'ল বালচন্দ্রিকার দেহ-মন্দিরে। আজ আমি নগরের বাইরে এসেছি—বন্ধুপালের পাখীর নির্দেশ মতো। এসেই আপনাকে দেখতে পেলুম—নয়নের যেন উৎসব!

পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত শুনলেন রাজবাহন; কিন্তু, কই, মলিন হ'লু

না তো তাঁর মন! রাজবাহন তখন পুষ্পোদ্ভবকে জানালেন নিজের এবং সোমদত্তের বৃত্তান্ত। তারপর সোমদত্তকে আদেশ দিলেন, "মহাকালের আরাধনা সেরে নিজের রাজধানীতে তোমার পত্নী-পরিবারবর্গকে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে এস।" সোমদত্ত বিদায় নিল। পুষ্পোদ্ভবের সেবা-চাতুর্যে আনন্দিত হয়ে রাজবাহন তখন প্রবেশ করলেন ভূস্বর্গায়মান অবন্তিকাপুরে।

সেখানে বন্ধুপাল প্রভৃতি বান্ধবদের নিকট পুষ্পোদ্ভব,—"ইনি আমার স্বামীকুমার"—ব'লে পরিচয় ঘটিয়ে দিল রাজবাহনের, এবং অবন্তিকাপুরে রটিয়ে দিল—"ইনি একজন কলাকুশল ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ।"

পুষ্পোদ্ভবের মন্দিরেই স্নানাহারাদির সুখ উপভোগ করতে করতে আস্থান নিলেন রাজবাহন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

অবন্তি-সুন্দরী পরিণয়

তাবপবে একদা অবন্তিকাপুরে আবির্ভূত হ'লেন ঋতু বসন্ত;—সঙ্গে তাঁব মদন-সেনাপতি দক্ষিণ সমীব। এ সেনানায়কটিকে দেখতে পাওয়া যায় না। - সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতব এঁব শবীব। মলয় পবতেব চন্দন-বনবাসী ভুজঙ্গেবা এঁকে যেন পান ক'বে ক'বেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক'রে তবে ছেড়েছেন। তবু কী সুন্দব এঁব মৃত্ব-দোলন গতি!—অঙ্গ থেকে উড়ে যাচ্ছে ঐ যে হবিচন্দর্নেব পবিমল—সেই গন্ধভাবেই যেন ঈষৎ তুলে বইলেন দক্ষিণ সমীবণ।

ঋতু বসন্ত এলেন;—বিবহীদেব হৃদয়ে হৃদয়ে উজ্জ্বল জ্ব'লে উঠল—-মন্মথেব অনল;

আম্রমঞ্জবীব মধু পান ক'রে রক্তকণ্ঠ হ'ল ভ্রমব, তাদেব গুঞ্জনে যেন বাচাল হয়ে উঠল দিক্‌চক্র; এবং মানিনীদেব মনেব মধ্যে ফুটে উঠল আধ-ফোটা একটি সুখেব কলি।

ঋতু বসন্ত এলেন,— চন্দনে, সিন্ধুবাবে, রক্তাশোকে,—কিংশুক এবং তিলকেব শাখায় শাখায় ফুটে উঠল পুষ্পেব ঐশ্বর্য, উল্লসিত হয়ে উঠল বসিকজনেব হৃদয়—মদন-মহোৎসবের অনবদ্য মাধুর্যে।

বলতেই হবে সময়টি বড় রমণীয়। নগবীর উপান্তে ছিল একটি বম্যোদ্যান। হঠাৎ সেদিন সেখানে দেখা গেল বিহার কবতে এসেছেন মানসাব-নন্দিনী "অবন্তিসুন্দবী"—সঙ্গে তাঁব প্রিয়বয়স্যা 'বালচন্দ্রিকা'। তাঁবা শুধু তুজনাই নন—সঙ্গে আরও ছিলেন অনেকে—অনেক পৌরসুন্দরী। শিশু আম্রের একটি সুন্দর গাছ;—তারই শীতল স্নিগ্ধ ছায়ায়, সরোবরের সৈকতে, সকলে মিলে মনোভবের অর্চনা করছে

লেগে গেলেন—গন্ধফুল, হরিদ্রাক্ষত, চীনাম্বর, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি মনোহরণ নানান্ উপকরণ সাজিয়ে।

এমন সময় রাজবাহন পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে সেই উদ্যানে এসে প্রবেশ করলেন। সাক্ষাৎ কামদেব যেন বসন্ত-দ্বিতীয় হয়ে দেখতে এলেন মূর্তিমতী রতি-দেবীকে। একটু লুকিয়ে, একটিবার চোখের-দেখা শুধু দেখে নেব—এই মনে করে রাজবাহন ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন সেইখানে—যেখানে সহকারের একটি শাখা দক্ষিণে বাতাসের নিরন্তর আন্দোলনে কাঁপছিল, যেখানে শাখার মাঝে মাঝে গজিয়ে উঠেছিল নূতন পাতা এবং যেখানে পাতার মাথায় মাথায় উল্লাসের মতো ফুটে উঠেছিল সহকারের মঞ্জরী। ধীরে ধীরে তিনি এগোতে লাগলেন—কানে এসে মধু ঢালতে লাগল কোকিলের কুহু, পাখীদের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন—এবং ঘন আনন্দের মধ্যে দিয়ে তিনি নয়ন ভ'রে দেখতে পেলেন—একটি জলভরা স্বচ্ছ সরোবর, কলধ্বনি ক'রে শীতল জলে খেলে বেড়াচ্ছে ডাকপাখী, সারস, বালিহাঁস, চখাচখি—ফুটে রয়েছে নীলপদ্ম, কুমুদ, কহ্লার—আর তারই তীরে—সেই হৃদয়চঞ্চলা ললনা! তাঁদের দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে বালচন্দ্রিকা আহ্বান জানাল,—যেন বললে "শঙ্কা নেই, আসুন।"

আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠলেন রাজবাহন। মনুষ্যরাজ রাজবাহন তেজে দীপ্তিতে হার মানালেন দেবরাজ ইন্দ্রকে!

কিন্তু,—কী অপূর্ব কৃশ অবন্তিসুন্দরীর ঐ কোমরখানি! কাছে এগিয়ে এলেন রাজবাহন। রাজবাহনের মনে হ'ল নিশ্চয় শ্রীমদন শ্রীমতী রতিদেবীর একটি প্রতিমূর্তি গড়তে গিয়ে হঠাৎ এই নারী-বিশেষটিকে রচনা ক'রে ফেলেছেন!—এবং গড়েছেন.—নিজের,—

ক্রীড়া-সরোবরের শারদ-পদ্মের সৌন্দর্য দিয়ে—তাঁর চরণ দুখানি,

উপবন-দীর্ঘিকার মত্ত মরালিকার গতি-রীতি দিয়ে—অলস লীলায় তাঁর ঐ পথ-চলাটি,

তূণীরের লাবণ্য দিয়ে—দুখানি জঙ্ঘা,

লীলামন্দিরের দ্বার-কদলীর লালিত্য দিয়ে—মনোজ্ঞ উরুযুগ,

জৈত্ররথের চক্রচাতুর্য দিয়ে—ঘন নিতম্ব,

সৌধারোহণের পারিপাট্য দিয়ে—ত্রিবলী,

আর মৌর্বী-মধুকর-পংক্তির নীলিমা দিয়ে—তাঁর রোমাবলী।

রূপ দেখতে গিয়ে প্রতি অঙ্গ থেকে চোখ যেন আর নড়ে না। সর্বত্রই কি শ্রীমদনের জয়টিকা!— তাই বুঝি অবন্তিসুন্দরীর—

কণ্ঠে—শ্রীমদনের জয়শঙ্খের বাহার,

কুচদ্বন্দ্বে— স্বর্ণ-কলসের পূর্ণ শোভা,

শুভ্র হাসিতে— বাণায়মান পুষ্পলাবণ্য,

নিঃশ্বাসে— সেনানায়ক মলয়-মারুতের সুরভি,

নয়ন দুটিতে—জয়ধ্বজের মীন-দর্প,

এবং কেশপাশে—লীলাময়ূরের ঐ কলাপভঙ্গি ?

ঐশ্বর্যের এত সম্ভার দিয়েও যেন স্বস্তি পান নি শ্রীমদন। তিনি তার উপর যেন সেই মূর্তিখানিকে ধুইয়ে দিয়েছেন মকরন্দ আর কস্তুরিকা-মিশ্র চন্দনের রস দিয়ে, মেজে দিয়েছেন কর্পূরের পরাগ দিয়ে।

রাজবাহনকে এতক্ষণ দেখতে পান নি লক্ষ্মীস্বরূপিণী মালবেন্দ্র-কন্যা অবন্তিসুন্দরী। হঠাৎ তিনি তাঁকে দেখে ফেললেন। পূজা করতে চান যে মনসিজকে, সেই মনসিজই কি 'তথাস্তু' বলবার জন্যে তাঁর সামনে এসে রূপ ধ'রে দাঁড়ালেন ? দেখতে দেখতে তাঁর সমস্ত শরীর কেমন যেন কেঁপে উঠল মদনের আবেশে, দক্ষিণে বাতাসের দোলা-লাগা লতিকার মতো কেমন যেন একটু নুয়ে গেল। তার পরে খেলায় হ'দী

ভুল, পূজায় হ'ল ভুল, বিশ্রামে হ'ল ভুল। মুখখানির উপর ভাবের ইন্দ্রধনু এঁকে মিলিয়ে গেল সুন্দরী একটি লজ্জা।

আর রাজবাহনের মন তখন সবিস্ময়ে ভাবছে,—"ললনা-সৃষ্টি করতে গিয়ে নিশ্চয়ই বিধাতা এখানে অনুসরণ করেছেন ঘুণাক্ষর-ন্যায়। এমন সুন্দর ক'রে গড়তেই যদি তিনি পারেন,—তবে কেন তাঁর হাত থেকে বেরল না এমন ধারা আর একটি সৃষ্টি ?"

অমন চোখের অমন চাহনির সামনে—সত্যিই দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না অবন্তিসুন্দরী। লজ্জা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল সখীজনদের অন্তরালে। সেই সুন্দর অন্তরালে অঙ্গখানিকে গোপন ক'রে তিনি দেখতে লাগলেন রাজবাহনকে। তাঁরও চোখে খেলে যেতে লাগল সেই একটু কোঁচকানো, একটু ভুরুবাঁকানো, সেই একটু কোণ-ঠেসা চাউনি। নিজের হৃদয়খানিকে মনে হ'ল দুষ্ট হরিণ,—কুরঙ্গ, আর রাজবাহনের লাবণ্য যেন সেই হরিণ-ধরার ফাঁদ।

অবন্তিসুন্দরীর উপচারে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গায়ের জোর বাড়ল বিষম-বাণ মদনের।

সেই দেখে আনন্দে ভাবতে লাগল রাজবাহনের মন, "হায় রে, এবার বুঝি ফুলধনুর শর হলেম, বুঝি শরব্যও হলেম।"

অবন্তিসুন্দরীর মন কিন্তু ভাবতে লাগল, "না জানি সই, কোন্-দেশী এই অসামান্য সুন্দর, কোন্ ভাগ্যবতীর তরুণ চোখের এ উৎসব! এমন পুত্ররত্ন গর্ভে ধারণ ক'রে, না জানি কোন্ সীমন্তিনী ললাটে তুলিয়েছিলেন তাঁর সীমন্ত-মৌক্তিক। এঁর মা না জানি বা কেমন হবেন! এখানে ইনি এসেছেনই বা কেন? এই লাবণ্যকে আমি দেখছি—আর শ্রীমন্মথ যেন অসূয়ার পরাধীন হয়ে মন্থন করছেন আমার মন—বোধ করি নিজের "মন্মথ" নামের সঙ্গে অন্বয় ঘটাবার উদ্দেশ্যে। কি করি! কি ক'রে এ কে জানা যায়?"

বালচন্দ্রিকা কিন্তু নিজের ভাববিবেক দিয়ে বুঝতে পেরেছিল এঁদের মনের ভাষা। কিন্তু,—মেয়েদের সমাজে সমীচীন হবে কি রাজকুমারের সঠিক পরিচয়টি নিবেদন করা? সাধারণ ভাষায় তাই সে ব'লে উঠল, "রাজকুমারি, এই নবীন ব্রাহ্মণকুমারটি কলাবিদ্যায় প্রবীণ, ইনি দেবতাদের আহ্বান ক'রে নিয়ে আসতে পারেন পৃথিবীতে, ইনি যুদ্ধবিশারদ, মন্ত্রৌষধি বিষয়ে এঁর জ্ঞানও অসীম। ইনি সেবনীয়। আপনি এঁর অর্চনা করতে পারেন।"

মৃদু বাতাসে যেমন ছোট্ট ছোট্ট প্রীতির ঢেউ ওঠে, তেমনি ঢেউ নাচিয়ে এল বালচন্দ্রিকার বাক্যগুলি,—মদন-বিহ্বলা অবন্তিসুন্দরীর অন্তরে। যথাযোগ্য আসনে মদন-জয়ী রাজকুমারকে বসিয়ে, সখীদের হাত দিয়ে গন্ধকুসুম, অক্ষত, ঘনসার, তাম্বুল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের অর্ঘ্য দান ক'রে তিনি পূজা করলেন ব্রাহ্মণকুমারকে।

অকস্মাৎ—একটি নবস্রোতে প্রবাহিত হয়ে গেল রাজবাহনের চিন্তা ;—

"নিশ্চয় এই কন্যাই ছিলেন আমার পূর্বজন্মের জায়া—'যজ্ঞবতী'। তা না হ'লে আমার মনে এমন অনুরাগের জন্ম হয়ই বা কেমন ক'রে? তপোনিধির অভিশাপ যখন শান্ত হ'ল তখন তো আমাদের দু'জনেরি সমান ছিল জাতিস্মরত্ব। সঙ্কেত-বাক্য ব'লে দেখি—যদি ওঁর জ্ঞান ফিরে আসে।"

জল্পনার মধ্যপথে হঠাৎ রাজবাহন দেখতে পেলেন,—একটি নধর রাজহংস হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে অবন্তিসুন্দরীর নিকটে এগিয়ে এগিয়ে এল। চঞ্চল হয়ে উঠলেন রাজকন্যা। আদেশ পেয়ে যেই বালচন্দ্রিকা সেই মরালটিকে ধরতে যাবে ঠিক সেই অবকাশে সম্ভাষণ-নিপুণ রাজবাহন নিঃসঙ্কোচে ব'লে ফেললেন :

"সখি, পুরাকালে একদিন মহারাজ শাম্ব, বিহার-বাসনায়, তাঁর

প্রেয়সী যজ্ঞবতীকে সঙ্গে নিয়ে একটি পদ্মদীঘির তীরে এসে দেখতে পান—রাঙা রাঙা পদ্মফুলের মধ্যিখানে ঘুমোব ঘুমোব করছে একটি রাজহংস। রাজহংসটিকে বন্দী ক'রে মৃণালের সুতো দিয়ে তার হলুদবরণ চরণ দুখানি বাঁধতে বাঁধতে, প্রেয়সীর মুখের দিকে অনুরাগের দৃষ্টি ফেলে হাসতে হাসতে রাজা বলেছিলেন, 'ইন্দুমুখি, মরালটিকে বেঁধেছি ; দেখেছ, একেবারে ঠিক মুনিঠাকুরটির মতো শান্ত হয়ে বেচারী ব'সে আছে ; নাও, একে নিয়ে যা মনে ধরে করো।' রাজহংসটি তখন অভিশাপ দিয়েছিলেন রাজাকে—বলেছিলেন—'মহীপাল, আমি এই অরবিন্দটির পাশে ব'সে পরমানন্দে ধ্যান করছিলুম ; রাজ্যগর্বে অন্ধ হয়ে নিষ্ঠাবান আমাকে তুমি অকারণে অপমান করলে। তোমাকে অভিশাপ দিলুম,—'তুমি ভোগ করবে রমণীর বিরহ-সন্তাপ।'

মহারাজ শাম্বের মুখ শুকিয়ে যায়। অসম্ভব হবে প্রেয়সীর, তাঁর জীবিতেশ্বরীর বিরহ—তাই সসম্ভ্রমে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বলেছিলেন, 'মহাপুরুষ, না জেনে যা ক'রে ফেলেছি তার কি আর ক্ষমা নেই ?' তাপসের হৃদয় করুণায় গ'লে যায়, শেষে বলেন, 'রাজন্, এই জন্মে এ অভিশাপ তোমাদের লাগবে না। কিন্তু পরজন্মে এই কমলনয়নার সঙ্গে যখন তোমার অনুরাগ হবে এবং মিলন হবে, তখন সেই মিলনমুহূর্তে—আমার চরণ যেমন মুহূর্তদ্বয়ে তুমি বেঁধেছ তেমনি তোমার চরণও দুটি মাসের জন্যে শৃঙ্খলিত হয়ে যাবে এবং শৃঙ্খলিত অবস্থায় তোমায় ভোগ করতে হবে রমণী-বিয়োগের বিষাদ ; তার পরে তোমাদের মধ্যে আসবে রাজ্যসুখ এবং অখণ্ড প্রেম।'—শাম্ব এবং যজ্ঞবতীকে তারপরে তাপস দান করেছিলেন জাতিস্মরত্ব। তাই বলছিলুম—দেবি, ঐ রাজহংসটিকে বাঁধবেন না।"

শাম্বরাজের কাহিনী শুনে চমকে উঠলেন অবন্তিসুন্দরী। চমকের

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও মনের মধ্যে ফিরে এল জন্মান্তরের স্মৃতি। মন—জেগে উঠল, যেন পাতা বেরুল। হাসি খেলে গেল মধুমোহন,—মুখের উপর। হ্যাঁ, এই তো সেই আমার রাজা, আমার প্রিয়। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি সসম্ভ্রমে বললেন, "সৌম্য, শাম্ব মহারাজ যে পুরাকালে রাজহংসের চরণ দুটি বেঁধে দিয়েছিলেন, সে কেবল যজ্ঞবতীর কথা রাখতে গিয়ে। যা করবার নয় তাও ক'রে বসেন—পণ্ডিতেরা—দাক্ষিণ্যে মুগ্ধ হয়ে ; এ কথা সকলেই জানে।"

স্তব্ধ হলেন অবন্তিসুন্দরী।

কিন্তু দুজনে তখন চিনে ফেলেছেন দুজনাকে। কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেছে অপরিচয়ের বাধা, আকাশ যেন রাঙা হয়ে গেছে প্রণয়ের আবীরে।

ইত্যবসরে মালবেন্দ্র-মহিষী প্রবেশ করেছেন উদ্যানে। তাঁর চারদিকে অসংখ্য পরিজন। তনয়ার ক্রীড়াকৌতুক পরিদর্শন করতে এসেছেন। দূর থেকে মহারাণীকে দেখতে পেয়েই লাফিয়ে উঠল বালচন্দ্রিকা ; পাছে রহস্য ভেদ হয়, সব জানাজানি হয়ে যায়, সেই ভয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ইশারা ক'রে পুষ্পোদ্ভবকে সে জানিয়ে দিল—'স'রে পড়।' পুষ্পোদ্ভবও সসম্ভ্রমে রাজবাহনকে নিয়ে গা-ঢাকা দিল বৃক্ষবাটিকার অন্তরালে। উদ্যানে কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে, এবং তনয়ার সঙ্গসুখ লাভ ক'রে সন্তুষ্টচিত্তে মানসার-মহিষী শেষে আদেশ দিলেন—'সকলে মিলে এবার ঘরে ফিরে চলো।' অবন্তিসুন্দরীও উঠলেন। মায়ের পিছনে পিছনে চলতে চলতে অবন্তিসুন্দরী বললেন :

"ওরে আমার রাজহংসের কুলতিলক, বিহার-বাসনায় আমার কাছে এসেছিলে, হঠাৎ তোমায় ছেড়ে দিয়ে এখন আমায় চ'লে যেতে হচ্ছে মায়ের সঙ্গে। এই যাওয়াটাই আমার উচিত। কিন্তু দেখো,

তোমার মনের অনুরাগটি যেন আমায় ছেড়ে না চ'লে যায়।" মরাল-ছলে রাজকুমারকে এই কথাটুকু শোনাতে শোনাতে, দীন নয়ন ছুটিকে বারবার ফেরাতে ফেরাতে রাজপুরীতে চ'লে গেলেন,—অবন্তিসুন্দরী।

কিন্তু প্রাসাদের রহস্যমন্দিরে শান্তি হারালেন অবন্তিসুন্দরী। পাশে বালচন্দ্রিকা, মুখে তার কেবল সেই তরুণ রাজকুমারের কথা। আগ্রহের আতিশয্যে রাজবাহনের নাম ধাম পরিচয় ততক্ষণে সব জানিয়ে ফেলেছে বালচন্দ্রিকা। কে জানত মন্মথের বাণে হৃদয় এমন ব্যাকুল হয়? কে জানত বিরহে এত ব্যথা! কে জানত এই নির্জন বিরহখানি কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের মতো শরীরখানিকে খইয়ে দেবে, ভুলিয়ে দেবে পানাহার, রহস্যমন্দিরে বিছিয়ে দেবে চন্দনের-রসে-ধোয়া পর্ণকুসুমের বিছানা!

গত কালও তো এই শরীর সাধারণ ছিল, আজ সে কেন এমন পোড়ে?

অবন্তিসুন্দরীর অবস্থা দেখে পরিহাস-চতুরা সখীরাও ব্যাকুল হয়ে উঠল। তারা কেউ—সোনার ঘড়ায় করে চন্দন, উশীর আর ঘনসার মিশিয়ে স্নানের জল নিয়ে আসে; কেউ নিয়ে আসে মৃণালের সূতো দিয়ে বোনা পরিধেয় বসন, কেউ নিয়ে আসে পদ্মের পাপড়ি দিয়ে মোড়া তালবৃন্ত। কত রকমের যে শীতল উপচার তারা নিয়ে এল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তপ্ত তৈলে জল পড়লে, জলও যেমন আগুন হয়ে যায়, কুমারীর দেহস্পর্শ পেয়ে তেমনি হ'ল উপচারগুলির দশা। বালচন্দ্রিকা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে গেল।

শেষে বালচন্দ্রিকাকে কাছে ডাকলেন অবন্তিসুন্দরী। চোখ যেন তাঁর খুলতে আর চায় না; চোখের জলেই ঢাকা প'ড়ে গেছে চোখ; উষ্ণ নিঃশ্বাসে ম্লান হয়ে গেছে বন্ধুজীব ফুলের মতো অধর; নুয়ে পড়েছে অঙ্গ। ধীরে ধীরে ধরা গলায় তিনি বললেন:

"প্রিয় সখি, লোকে বলে,—কামদেবের হাতে আছে ফুলের ধনুক আর পাঁচটি বাণ। এর চেয়ে মিথ্যা কথা বুঝি আর ইহ-জগতে নেই। এই তো আমি রয়েছি—আমার গায়ে তো ফুলের বাণ এসে লাগছে না—লক্ষ লক্ষ লোহার বাণ যেন বিঁধছে; সখি, চাঁদকে তোরা শীতল বলিস ;—মিথ্যা কথা। আমি জানি, ও বাড়ব-বহ্নির চেয়েও তপ্ত ; ভিতরে প্রবেশ করলে সাগর শুকিয়ে দেয়, বেরিয়ে এলে সেই আবার বাড়তে থাকে দুরন্ত। জানিস না ঐ দেবতা কি রকমের দুষ্টু। নিজের সহোদরা কমলার ঘরেতেও পদ্মগুলোকে হত্যা করে ও ফেলে রেখে আসে। ওর অপকর্মের কি অন্ত আছে ?

বিরহানলের সন্তাপে উষ্ণ হয়ে, ঐ দেখ সখি, আবার স্বল্প হয়ে বইছে দক্ষিণে বাতাস! আমি সহ্য করতে পারছি না নবপল্লবের এই শয্যা,—অসহ্য—এ যেন শ্রীমদনের অগ্নিশিখা! ও তো হরিচন্দন নয় —ও যেন সাপের ওগরানো উল্বণ গরল। কেন মিছে তোরা নিয়ে আসছিস এই সব শীতল উপচার? এই কামনার, এই বিকারের ধন্বন্তরি হচ্ছেন তোদের ঐ লাবণ্যজিতমার রাজকুমার। তাঁকে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এখন বল্, কি করি!"

বালচন্দ্রিকা দেখতে পেল—ব্যাপার গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরকম ক্ষেত্রে প্রেমের ব্যাধি পরাকাষ্ঠায় পৌছতে আর কার বেলা? রাজবাহনের লাবণ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন কোমলাঙ্গী; অন্য আর শরণ্য কেউ নেই। ভাবতে ব'সে গেল বালচন্দ্রিকা.—

"এখন একমাত্র উপায় কুমারকে সত্বর নিয়ে আসা, আর আনতেই হবে। নয় তো শ্রীমদন দেখছি স্মরণীয় গতি লাভ করিয়ে ছাড়বেন অবন্তিসুন্দরীকে। তবে বোধ হচ্ছে, আমাকে বেশি কষ্ট ওঠাতে হবে না। সেদিন উদ্যানে কুমারেরও যে রকম শোচনীয় অবস্থা দেখেছিলুম

তাতে মনে হয়, শ্রীমদন পক্ষপাতিত্ব করেন নি—তুজনের উপরেই সমান হেনেছেন বিষম ফুলের শর।"

বালচন্দ্রিকা তখন অবন্তিসুন্দরীর কাছে সখীদের বসিয়ে রেখে এবং যথাসময়ে তাদের কি কি করতে হবে,—সব ব'লে দিয়ে চ'লে গেল সেইখানে, যেখানে রুদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্যে সন্তাপম্লান নবপল্লবের শয়নে অধিষ্ঠিত ছিলেন রাজবাহন,—পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে কথা কইছিলেন, কইছিলেন তাঁর হৃদয়চোরণীর কথা,—আর বলেছিলেন—কেন তাঁর মনখানি আজ পুষ্প-ধনুর বাণ হতে চায়, তাঁর তূণীর হতে চায়।

প্রিয়-বয়স্যা বালচন্দ্রিকাকে আসতে দেখে খুশীতে ভ'রে উঠল তাঁর মন। "এস এস, এইখানে ব'স"—ব'লে আসন পেতে দিয়ে করলেন অভ্যর্থনা। কর-পদ্মটিকে ললাটে ছুঁইয়ে, বালচন্দ্রিকা তখন রাজবাহনের সামনে বিনয় ভ'রে ধ'রে দিল—অবন্তিসুন্দরীর প্রেরিত সকর্পূর তাম্বুল। "তোমাদের রাজনন্দিনী ভাল আছেন তো?" এই প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, "দেব, আর ও কথাটি বলবেন না। আপনার মতোই দেখছি—ফুলের শয়ন তাঁরও পক্ষে হয়েছে অসহ্য। মদনের অন্ধতা তাঁকে আর কিছুই দিচ্ছে না চক্ষে, এখন কেবল ক্রীড়াভবনে ব'সে স্বপ্ন দেখছেন—একটি বুকে আরেকটি বুকের আলিঙ্গন-সৌখ্য! যাক, এখনি এই পত্রিকাখানি লিখে আমার হাতে তিনি সঁপে দিলেন,—বললেন, যাও তাঁকে দিয়ে এস। তাই এলুম।"

আর্যাছন্দে লেখা পত্রিকাখানি,—হাতে নিয়ে পাঠ করলেন রাজবাহন:

> "ওগো ভাগ্যবান, ফুলের মতো সুকুমার, জগতের অনবদ্য,—তোমার রূপ। সেই রূপ দেখে আমার মনখানির আশ আর মেটে না; শুধু বলে—সুকুমার রূপের মতোই তোমার মনখানি যদি মৃদুল হোত, সুকুমার হোত!"

লিখন প'ড়ে রাজবাহন সাদরে বললেন :

"সখি, ছায়ার মতো পুষ্পোদ্ভব আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। তুমি তার প্রেয়সী। এবং সেই তুমিই আবার মৃগনয়নার বহিশ্চর প্রাণ। তোমার চাতুর্যই এই ক্রিয়া-লতার আলবাল হয়েছিল। আমার যা করবার আমি সব করব। হায় রে, নতাঙ্গী আমাকে দুষেছেন—বলেছেন আমার হৃদয় বড় কঠিন। কিন্তু সখি, ক্রীড়াকানন থেকে বিদায় নেবার সময় তিনিই তো আমার হৃদয়খানিকে চুরি করে নিয়ে চ'লে গেলেন নিজের প্রাসাদে। সেই চুরি-যাওয়া হৃদয়খানি কঠিন কি মধুর—তা কেবল তিনিই জানেন। কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করা দুষ্কর। যাই হোক, তোমার সখীকে ব'লো—কালই হোক বা পরশু—উপায় বার ক'রে তাঁর সঙ্গে আমি মিলব। শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার তাঁর শরীর—একটু দেখ, যেন ইতিমধ্যে ভেঙে না পড়ে।"

রাজবাহনের প্রেম-গর্ভিত বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে বালচন্দ্রিকা তখন কন্যান্তঃপুরের দিকে চালিয়ে দিল তার দুখানি সুখী চরণ।'

কিন্তু ঘরের মধ্যে আর থাকতে পারলেন না রাজবাহন। পুষ্পোদ্ভবকে সঙ্গে নিয়ে বিরহ-বিনোদনের আশায়—চ'লে এলেন সেই উদ্যানে, যেখানে অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল তাঁর। দেখতে লাগলেন—বৃক্ষগুলিকে, তাদের পল্লবগুলিকে, শাখার যে-যে স্থান থেকে পল্লব চয়ন করছিলেন চকোরনয়না, সেই-সেই স্থানগুলিকে। যেন দেখতে পেলেন, ব'সে রয়েছেন নতাঙ্গী, আরাধনা করছেন শ্রীমন্মথের। কী সুন্দর সেই বরাসন! তার মধ্যে আশ্বিনের চাঁদের মতো একখানি পূজারত মুখ; শীতল সৈকততলে চঞ্চল চরণের চিহ্ন; দশনদষ্ট কুসুমের অবশেষে, মাধবীলতার শ্রীমণ্ডপে নবপল্লবের সেই শয্যা। এরা যেন প্রিয়তমার তিলক-চিহ্ন। এই চিহ্নগুলিই বারংবার মনে পড়িয়ে দিতে লাগল—প্রথম সম্ভাষণ, বিদায় বেলার

ইঙ্গিত। নবাম্রমঞ্জরী কাঁপছে—প্রেমাগ্নিশিখার মতো। কোকিলের কুহুরব, শুকপাখীর আলাপ, ভ্রমরদের গুঞ্জন শুনিয়ে দিয়ে গেল—কানে-কানে-বলা মদনের মন্ত্র।

উদ্যানের চারদিকে বিকারগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রাজবাহন। কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়ানো যেন আজ অসম্ভব !

পাগলের মতো এই রকম যখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে—উদ্যানে প্রবেশ করলেন জনৈক ব্রাহ্মণ। সূক্ষ্ম চিত্রবাস তাঁর অঙ্গে, দুটি কর্ণে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে মণিময় দুটি কুণ্ডল, মনোরম চতুর-নায়কের বেশ সঙ্গে মুণ্ডিতমস্তক একটি মানব। ব্রাহ্মণটি নিজের খুশিমতো উদ্যানে প্রবেশ করে সামনেই দেখতে পেলেন তেজোজ্জ্বল রাজবাহনকে। আশীর্বাদ করতে করতে তিনি এগিয়ে এলেন। বিদ্যানৈপুণ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে রাজবাহনকে ব্রাহ্মণ জানালেন—বিদ্যেশ্বর তাঁর নাম, তিনি একজন যাদুকর, রাজাদের মনোরঞ্জন করে বিবিধ দেশে তিনি ভ্রমণ করে থাকেন—সম্প্রতি এসেছেন উজ্জয়িনীতে। তারপরে কিছুকাল স্তব্ধভাব ধারণ করে ঠোঁটের কোণে হাসির একটি রেখা ফুটিয়ে ঐন্দ্রজালিক প্রশ্ন করলেন রাজবাহনকে, "এটি তো দেখছি লীলাকানন ; এবং দেখছি, মুখের জ্যোতিঃ হারিয়ে আপনি এখন এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ; অভিপ্রায়টি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

নিজেদের কার্য এবং করণ প্রথমে চিন্তা করে নিল পুষ্পোদ্ভব। বিচার শেষে সাদরে বললে :

"মহাশয়, বাণীর বিনিময় না হতেই অনেক সময় সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যায় শিষ্টজনদের মধ্যে। তার উপরে আপনার ভাষণ বড় রুচি-পূর্ণ, আমাদের মুগ্ধ করেছে এবং আপনি প্রায় হয়ে গেছেন এক প্রিয় বয়স্য। সুহৃদ্‌দের মধ্যে অ-কথ্য তো কিছুই থাকে না।

কী আর বলব আপনাকে। আমাদের এই রাজকুমার ভালবেসে ফেলেছেন। মালবেন্দ্র-কন্যা এই ক্রীড়াকাননে এসেছিলেন, বসন্তোৎসবে—তুজনের দেখা তুজনের সঙ্গে,—এখন অনুরাগ পৌঁছিয়ে গেছে চরমে। কী ক'রে যে মিলন ঘটবে,—সেই চিন্তাতেই আমার এই রাজনন্দনের এমন জ্যোতিহারা ভাব।"

রাজবাহনের লজ্জা-সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে যাতুকর বললেন—"আমি যেখানে আপনার অনুচর, সেখানে এমন কী কাজ থাকতে পারে যা অসাধ্য? ইন্দ্রজাল-বিদ্যার প্রভাবে, এই আমি আপনাকে ব'লে রাখছি, মালবনাথকে মোহগ্রস্ত ক'রে, সমস্ত পৌরজনদের চোখের উপর দিয়ে তাঁর কন্যার সঙ্গে আপনার শুভ-পরিণয় ঘটিয়ে দেব, ঘটিয়ে আপনাকে পাঠাব কন্যান্তঃপুরে। পাঠিয়ে দিন আপনি এই সংবাদ—সখীমুখে—রাজকন্যার কাছে।"

অকারণ বান্ধব লাভ ক'রে রাজবাহনের হৃদয়ে উথলে উঠল আনন্দ। ঐন্দ্রজালিক তখন খেলা দেখালেন, কৃত্রিম কত রকমের খেলা, তার চোখ-ভোলান অসামান্য পটুতা! তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে রাজবাহন বুঝতে পারলেন—একদা ঐ ঐন্দ্রজালিকও ভালবেসেছিলেন, তিনিও ভোগ করেছেন বিপ্রলম্ভ, তিনিও জানেন অকৃত্রিম ভালবাসা, তিনিও জানেন সহজ সৌহার্দ্য। তার পর ঐন্দ্রজালিক বিদায় নিলেন।

বিদ্যেশ্বরের যাতু-নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন রাজবাহন। নিশ্চয় ফল ফলাবে এবার মনস্কাম! পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে ফিরে এলেন নিজের মন্দিরে। বালচন্দ্রিকাকে আহ্বান ক'রে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাতে বিলম্ব হ'ল না; তার মুখেই বিদ্যেশ্বরের কথিত-মতো মিলনপ্রণালী পাঠিয়ে দিলেন অবন্তিসুন্দরীর কাছে। এই করতেই দিন কাটল। এল রাত্রি। রাত্রি আর কাটতে চায় না। হৃদয়টিকে তখন সম্মোহিত করছে এক অপূর্ব কৌতুকের আকর্ষণ।

ঘুম হ'ল না।

পরের দিন প্রভাত হতেই খবর এল,—ঐন্দ্রজালিক পৌঁছে গেছেন রাজপুরীতে।

ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বর পরের দিন প্রভাতেই রাজভবনের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে গেলেন অসংখ্য পরিজন সঙ্গে নিয়ে। বিদ্যেশ্বর কি একটি সামান্য মানুষ? আদৌ নয়। রসে, ভাবে, রীতিতে, গীতিতে এমন যাঁর অদ্ভুত চাতুর্য, সে মানুষ কি কখনো সাধারণ হতে পারে? দৌবারিক মুগ্ধ হয়ে গেল, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল—ব্যবহারে। হঠাৎ সে দৌড়ল মহারাজের কক্ষের দিকে। প্রণাম করবার অবসর যেন তার নেই। কোন ক্রমে প্রণাম সেরে সে বললে, "মহারাজ, এক ঐন্দ্রজালিক এসেছেন, তিনি অদ্ভুত, দ্বারে রয়েছেন দাঁড়িয়ে।"

ঐন্দ্রজালিকের সংবাদ শুনে দর্শন-কুতূহলী হলেন মালবেন্দ্র; অন্তঃপুরের ললনারাও কলধ্বনি তুলে ঔৎসুক্য জানালেন। সমাহূত হয়ে যাদুবিৎ বিদ্যেশ্বর তখন প্রবেশ করলেন, রাজকক্ষে নয়, রাজসভায়। মালবেন্দ্রকে আশীর্বাদ ক'রে তাঁর অনুজ্ঞা নিয়ে তিনি দেখাতে আরম্ভ ক'রে দিলেন তাঁর বিদ্যা।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যেশ্বরের পরিজনেরাও বাদ্যযন্ত্রগুলিতে ধনধন্ ক'রে ধ্বনি তুলল আনন্দের। গায়কীতে খেলে যেতে লাগল সুরের নাদ। যন্ত্রে যন্ত্রে উঠল ঝঙ্কার—মাতাল কোকিলের মুখে যেন মঞ্জুপঞ্চম।

তারপরে ঐন্দ্রজালিক ঘোরাতে লাগলেন ময়ূরের পিচ্ছিকাগুলি। দেখতে দেখতে সভাসীন সামাজিকদের নিরুদ্ধ মন আনন্দের উল্লাসে বিভোর হয়ে গেল। ইন্দ্রজাল বিদ্যার আবেশে দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়গুলিকে পরিবৃঢ়ভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে হঠাৎ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বর নিজের চোখ দুটিকে বন্ধ ক'রে ফেললেন; স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ক্ষণকাল।

'পরমুহূর্তেই সেই রাজসভায়—সমস্ত লোকের দেহগুলোকে আঁৎকিয়ে দিয়ে, সিঁটিয়ে দিয়ে, ঘুরে বেড়াতে লাগল—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজগোখরো। তাদের ফণার কি অদ্ভুত বাহার! মণি জ্বলছে। মণির আলোয় চিকচিকিয়ে উঠল রাজমন্দিরের শেষ ধাপ। তারা বিষ ঢালতে লাগল—গরম বিষ—আগুন রঙের বিষ। তার পর হঠাৎ কোথা থেকে রাজসভায় উড়তে উড়তে এল গৃধ্রের দল। ইয়া তাদের লম্বা লম্বা চঞ্চু!—তারা এক একটা রাজগোখরোকে ধরে আর আকাশে ঘুরপাক্ দেয়।

তার'পরে সেই ব্রাহ্মণ ঐন্দ্রজালিক অভিনয় ক'রে দেখালেন—দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুকে কেমন ক'রে বিদারণ করেছিলেন শ্রীনৃসিংহদেব।

মালবেন্দ্রের মুখ দিয়ে তখন বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। আশ্চর্য! হ্যাঁ, একেই বলে বিদ্যা।

মালবেন্দ্রের যখন এই রকমের এক বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থা তখন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বর নিবেদন করলেন—"রাজন, আমার খেলা শেষ হয়ে আসছে। এবার বিদায় নেব। তবে বিদায় বেলায় ব্রাহ্মণের কর্তব্য, আপনাকে শুভসূচক কিছু দেখানো। কাজেই আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এখন প্রযোজনা করব—রাজবংশের কল্যাণ-পরম্পরা-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আপনার আত্মজাকৃতি অবন্তিসুন্দরীর সহিত সর্ব-গুণান্বিত একটি রাজনন্দনের শুভ পরিণয়।"

কুতূহলী হয়ে উঠলেন মহারাজ। আশ্চর্য হয়ে গেল সভাতল। বিদ্যুতের মতো এল রাজাদেশ—"বেশ, ঘটাও।"

অর্থসিদ্ধিটিকে মুষ্টিগত ক'রে, ব্রাহ্মণ বিদ্যেশ্বর তখন বাদ্যযন্ত্রের ভৈরব-নাদের মধ্যে সভাস্থ সকলের চোখের উপর ছড়িয়ে দিলেন 'মোহাঞ্জন'। তারপর একবার ভাল ক'রে চতুর্দিকে চাইলেন। সভাস্থ

সকলে যখন মনে মনে ভাবছেন—ঐন্দ্রজালিকের এই কল্পনাটি নিশ্চয়ই হবে অত্যদ্ভুত, ঠিক সেই সময়ে, চোখ দিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন,—প্রেমপল্লবিতহৃদয় রাজবাহন প্রবেশ করছেন সভাতলে, এবং তাঁর সঙ্গে আসছেন পূর্ব-সঙ্কেত-সমাগতা সালঙ্কারা—অবন্তিসুন্দরী। কাল-বিলম্ব হ'ল না। অগ্নি সাক্ষী ক'রে, বৈবাহিক তন্ত্রমন্ত্রের নৈপুণ্য দেখিয়ে ব্রাহ্মণ বিদ্যেশ্বর তখনি বর এবং বধূর মধ্যে ঘটিয়ে দিলেন শুভ পরিণয়। এবং ক্রিয়াবসানে চীৎকার দিলেন—"হে আমার সৃষ্ট পুরুষের সংহতি, লুপ্ত হও, ক্ষান্ত হোক ইন্দ্রজাল।" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়ে গেল মায়ামানবের দল, এবং রাজবাহনও অবন্তিসুন্দরীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন কন্যান্তঃপুরে। চাতুর্য কী গূঢ় !

মালবেন্দ্র কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন তাঁর সামনে যা ঘটে গেল তা অপূর্ব, তা অদ্ভুত ! কোষাগার থেকে ধনরত্ন আনালেন, আহ্লাদিতচিত্তে পুরস্কৃত করলেন ঐন্দ্রজালিককে, বললেন —"বিদ্যেশ্বর, তুমি ধন্য, আমার প্রীতি গ্রহণ কর।" তার পরে তাঁকে বিদায় দিয়ে মালবেন্দ্র চলে গেলেন নিজের কক্ষে।

এদিকে অবন্তিসুন্দরী প্রবেশ করেছেন সুন্দরী-মন্দিরে ; সঙ্গে তাঁর প্রিয়সহচরীর দল এবং অতিস্নিগ্ধ একটি প্রেমিক বল্লভ। দৈবও এখানে প্রবল, মানুষও এখানে প্রবল। রাজবাহনের বলবার আর কিছুই রইল না।

ধীরে ধীরে সুন্দরী-মন্দিরে,—রসিক মাধুর্যের দক্ষিণ বাতাসে,—হরিণাক্ষী অবন্তিসুন্দরীর লজ্জা ভাঙল ; অনুরাগের শেষ চেষ্টা সফল হল। গোপন বিশ্রাম, সুরতির গূঢ় ভাষণ, অনুলাপের অমৃতে,—বিলোল হয়ে গেল রাজবাহনের হৃদয় !

তিনি তখন তাঁর প্রিয়বধূকে শোনালেন চতুর্দশ ভুবনের হৃদয়মোহী বৃত্তান্ত,—অতিবিচিত্র।

পূর্বপীঠিকেয়ং সম্পূর্ণা।

প্রথম উচ্ছ্বাস

রাজবাহন-চরিত

চতুর্দশ ভুবনের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে বিস্ময়ে বিকশিত হয়ে উঠল অবন্তিসুন্দরীর দুটি আঁখি। অধরের প্রান্তদেশে হাস্যের তরঙ্গ তুলে সুন্দরী বললেন—

"প্রিয়, আজ আমার মিটল—কানের ভিতর দিয়ে আলাপ-শোনার সুখ। তোমার প্রসাদেই ভেসে এল এই সুখ! মনের অন্ধকারটিকে মুছে দিয়ে যাচ্ছে তোমারই দান—এই জ্ঞানের প্রদীপ! সেদিন মনে মনে ভেবেছিলুম, কেমন ক'রে তোমায় পাব। আজ—সেই পাওয়া সফল হয়ে গেল; তোমার পদ্মপায়ের সেবার ভিতর দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেল। এখন ভাবছি, তোমার এই প্রসাদের কী উপকার ক'রে এবার আমি প্রত্যুপকার করব নিজের। কি-ই বা আমার নিজের বলতে এমন রইল, যা তোমার নয়। নেই, তাই বা কেমন ক'রে বলি? কোথাও না কোথাও, আমারও তো একটু প্রভুত্ব থাকতে পারে। নয় কি? এই দেখ না, তোমার এই ঠোঁট দুটি—সরস্বতীর মুখগ্রহণের কৃপায় উচ্ছিষ্ট হয়ে শুকিয়ে গেছে;—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ ঠোঁট দুটিকে আমাকে দিয়ে কি তুমি মিটি খাওয়াতে পারবে? পারবে কি আমাকে দিয়ে তোমার এই লক্ষ্মীলাঞ্ছিত বক্ষঃদেশটিকে আলিঙ্গন করাতে?—কী চওড়া তোমার বুক!"

বলতে বলতে অবন্তিসুন্দরীর স্তনতট প্রিয়তমের বক্ষ-বিস্তৃতির উপর আলীন হয়ে পড়ল,—বর্ষার আকাশে যেমন ক'রে ঢলে পড়ে গুরুভার পয়োধর। উল্লাসে নৃত্য ক'রে উঠল রূঢ়রাগরুষিত দুটি নয়ন—প্রৌঢ় কন্দলীর যেন মুকুল। নীল-চাঁদ-আঁকা ময়ূরপেখমের মতো,

উতলা হয়ে উঠল তাঁর ভ্রমর-ব্যাকুল কুসুমিত কেশকলাপ। গাঢ়ভাবে, অধীরভাবে অবন্তিসুন্দরী চুম্বন করতে লাগলেন—কান্তের অধরমণি; অরুণ-রেণু কদম্বের মতো চিকচিকে, থরথরে, সেই অধর! ধীরে ধীরে স্ফুরিত হল রাগপ্রবৃত্তি, এবং অবসানে এল মিলন;—অতিমাত্র চিত্র উপচারে রম্য।

মিলনক্লান্ত হয়ে বর এবং বধূ যখন গভীর সুখ-সুপ্তিতে মগ্ন, তখন তাঁরা তুজনেই স্বপ্ন দেখলেন। দেখতে পেলেন—একটি বৃদ্ধ রাজহংস দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পা তুটি মৃণালের নিগড় দিয়ে বাঁধা!—তুজনেই একসঙ্গে পালঙ্কে উঠে বসলেন। উঠতেই দেখা গেল —রাজবাহনের চরণ তুটিকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে একখানি রজতশৃঙ্খল;—চাঁদ যেন যুগল পদ্মকে বেঁধেছেন জ্যোৎস্নার রজ্জু দিয়ে।

দেখেই—এ কি হল—মুক্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন রাজকন্যা, পরিত্রাস-বিহ্বলা।

কন্যার ক্রন্দনে জেগে উঠল অন্তঃপুর। আগুন লাগলে, দানায় পেলে—হঠাৎ যেমন হয় তেমনি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠল লোক। ভুল হয়ে গেল পৌর্বাপর্য—করণীয়। কে তখন মেনে চলতে পারে রহস্যরক্ষার আইন?

মাটিতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল কন্যান্তঃপুর। অজস্র কণ্ঠে তার সহস্র চীৎকার;—আবৃত হয়ে গেল কপোলতল অশ্রুস্রোতের গুণ্ঠনে।

"কি হল, কি হল" বলে চীৎকার করতে করতে, প্রবেশের বাধা না পেয়ে হঠাৎ অবন্তিসুন্দরীর শয়নকক্ষে—এই তুমুল সময়ে—উপস্থিত হয়ে গেল অন্তর্বংশিক পুরুষেরা; হাজার চক্ষে তারা দেখতে পেল রাজবাহনকে—সেই অবস্থায়।

কি করবে, কি বলবে! মূঢ় হয়ে গেল। অন্তঃপুরে ব্যভিচার!—অসম্ভব! নিগ্রহ করতে হাত তুলল, কিন্তু শেষে কোনক্রমে নিজেদের

সামলিয়ে নিয়ে তখনই দৌড়িয়ে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন ক'রে দিল চণ্ডবর্মার পদপ্রান্তে।

ছুটে এলেন চণ্ডবর্মা, ক্রোধে অগ্নিশর্মা। দহন-গর্ভ তাঁর দৃষ্টি। চিনতে পারলেন রাজবাহনকে।

"এ বেটা সেই। বালচন্দ্রিকার স্বামী সেই বেটা পাপী পুষ্পোদ্ভবের ইনি বন্ধু! বালচন্দ্রিকার জন্যেই আমার ছোট ভাইয়ের প্রাণ গেছে। বিদিশী বেণের বেটা, ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে ফাঁপা-ফোলা পুষ্পোদ্ভবটারই ইনি প্রাণের বন্ধু। দাঁড়াও দেখাচ্ছি, রূপের বড্ড গরম হয়েছে, বিদ্যের বড্ড অভিমান। ধর্মের কঞ্চুক পরে কুহক দেখানো বার করছি। লোক ঠকিয়ে নগরের দেবতা হয়ে রয়েছেন! হাড় পাপী, লম্পট অশ্বব্রাহ্মণ কোথাকার! আর—এই সুন্দরীটিই না আমার মতো পুরুষসিংহকে একদা অবমাননা করেছিলেন? এখন এই বেটাতেই মন সঁপেছেন! সুন্দরী কুলকলঙ্কিনী আজ চোখ জুড়িয়ে দেখতে পাবেন—শূলের উপর চড়েছেন তাঁর পতি—অনার্য্য।"

প্রবল ভৎসনা করতে করতে, ভীষণ ভ্রূকুটিতে ললাটখানি কুঞ্চিত ক'রে, যমের মতো কর্কশ, হাতে কালো লোহার একটি দণ্ড—রাজকুমারের পদ্মহাতখানিকে,—জয়ধ্বজ-চিহ্ন-আঁকা থাকলে হবে কি,—পাকড় ক'রে সজোরে টান দিলেন চণ্ডবর্মা।

পৌরুষের অতিভূমি—রাজবাহন এখন নিরুপায়।

তাঁর স্বভাবধীর মন বললে, "দৈবী আপদ এলে উপায় কি? সইতেই হবে। ক্ষেত্রবিশেষে সহিষ্ণুতাই একমাত্র প্রতিক্রিয়া।"

মুখ বললে—"অয়ি হংসগামিনি, স্মরণে রেখো সেই বৃদ্ধ রাজহংসটির কথা। তোমাকে···সহ্য ক'রে থাকতে হবে দুটি মাস।"

প্রাণ-পরিত্যাগ-রাগিণী প্রাণসমা অবন্তিসুন্দরীকে ইঙ্গিতে এই কথাটুকু জানিয়ে দিয়ে রাজবাহন স্বীকার করলেন শত্রুর বশ্যতা।

সমস্ত খবর শুনলেন মহাদেবী এবং মালবেন্দ্র। তাঁরা জামাতার হত্যাকাণ্ডে বাধা দিলেন। রাজবাহনের রূপ এবং আকৃতি তাঁদের মনে সঞ্চারিত করেছিল পক্ষপাতিত্ব। হবারই কথা। তাঁরা প্রচার ক'রে দিলেন, রাজবাহনের প্রাণদণ্ড হলে তাঁরাও আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু মহাদেবী এবং মালবেন্দ্র তখন রাজ্যের প্রভু নন, তাঁরা আপদ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না।

চণ্ডশীল চণ্ডবর্মা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। 'রাজরাজগিরি'তে তপস্যা করছিলেন দর্পসার, তাঁব কাছে সমস্ত খবর পাঠিয়ে দিয়ে, সকুটুম্ব পুষ্পোদ্ভবের সর্বস্ব অপহরণ ক'রে নিলেন। তাঁদের নিক্ষেপ করলেন কারাগারে। কিশোর সিংহের মতন রাজবাহনের জন্যে কিন্তু ব্যবস্থা হল অন্যপ্রকার। নির্মিত হল কাষ্ঠ-পিঞ্জর এবং তার মধ্যে বন্দী রইলেন রাজবাহন।

কয়েকদিন পরেই অঙ্গাভিযান করলেন চণ্ডবর্মা ;—অঙ্গরাজ তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করেন নি, অপমান করেছেন, তার প্রতিশোধ নিতে হবে, তাই। অভিযানের সাথী হয়ে চললেন দারুপিঞ্জরাবদ্ধ রাজবাহন। কষ্টের সীমা রইল না তাঁর। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তাঁর একটি সুখ ছিল—কুন্তল-কলাপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে (কালিন্দীদত্ত) শিখরমণি, তারই প্রভাবে তাঁর ক্ষুধা পিপাসা বেদনা লুপ্ত হয়ে রইল।

চণ্ডবর্মার বলভরে কম্পিত হয়ে উঠল চম্পানগরী ; এল অবরোধ। কিন্তু 'চম্পেশ্বর সিংহবর্মা'—সিংহের মতোই তাঁর দুরন্ত বিক্রম—চম্পানগরীর প্রাকার ভেদ করিয়ে সৈন্যসমাবেশ নিয়ে আক্রমণ করলেন চণ্ডবর্মাকে ;—বপুষ্মান যেন মহাদর্প। ঐ দর্পই হল তাঁর কাল। সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্বেই তিনি দূত-ব্রাত পাঠিয়েছিলেন মিত্ররাজদের নিকটে ; তাঁরা আসছেন,—এই শুভ সংবাদটিও পেয়ে-

ছিলেন ; কিন্তু বিলম্ব সইল না, কারও কথা তিনি মানলেন না, দর্পভরে লাফিয়ে পড়লেন সংগ্রামে। ক্ষীণ হয়ে এল তাঁর সৈন্যবল। শেষে হাতীর পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে অমানুষিক বিক্রম দেখিয়ে চণ্ডবর্মা বন্দী ক'রে ফেললেন প্রহরণভিন্নবর্মা সিংহবর্মাকে। যুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু নতি-স্বীকার করলেন না সিংহবর্মা। রাজকন্যা 'অম্বালিকা'র উপরে ঢলে পড়েছিল বিজয়ী চণ্ডবর্মার মাত্রা-হারা কামনা ; তাই তিনি দয়া করে সিংহবর্মার প্রাণটুকু দেহ থেকে বিযুক্ত করিয়ে দিলেন না। অধিকন্তু, সিংহবর্মাকে শল্যহীন করিয়ে, রাখিয়ে দিলেন কারাগৃহে। ঘোষিত হল রাজগণকদের গণনা,—"অদ্যই রাত্রিশেষে রাজকুমারী অম্বালিকা—বিবাহনীয়া।"

কৌতুক-মঙ্গল তখন শেষ হয়ে গেছে, এমন সময় 'এণজঙ্ঘ'—জনৈক ক্ষিপ্রগতি বার্তাহর—মহারাজ দর্পসারের প্রতিসন্দেশ বহন ক'রে 'এক-পিঙ্গাচল' থেকে চম্পানগরীতে এসে পৌছল। নিবেদন করল চণ্ডবর্মার নিকটে :

"মূঢ়, কন্যান্তঃপুর-দূষকের উপর কৃপার অবসর থাকে না। পিতৃদেব নিশ্চয়ই চরম বার্ধক্যে এসে পৌচেছেন, মান-অপমানের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর। দুশ্চরিত্রা দুহিতার পক্ষপাতী হয়ে তিনি হয়তো প্রলাপ বকতে পারেন, কিন্তু তাই বলে তোমাকেও কি তাঁর পরামর্শ মেনে চলতে হবে? অবিলম্বে কামোন্মত্তের চিত্রবধ-বার্তা পাঠিয়ে আমাদের সুখী ক'রো। সেই দুষ্টা কন্যা এবং তার অনুজ 'কীর্তিসার'কেও শৃঙ্খলিত ক'রে কারাগারে রুদ্ধ ক'রে রেখো।"

চণ্ডবর্মা তখনই তাঁর পার্শ্বচরকে আদেশ দিলেন—

"প্রাতঃকালে রাজভবনের দ্বারদেশে দুরাত্মা কন্যান্তঃপুর-দূষকটাকে নিয়ে আসবে। গজরাজ 'চণ্ডপোত'কে সাজসজ্জা পরিয়ে

যেন সেই সময়ে নিয়ে আসা হয়। বিবাহকৃত্য সম্পন্ন ক'রে আমি হাতীতে উঠব। অনার্যটাকে হাতীর পায়ের ক্রীড়নক করব। তার পরে সেই হস্তীটিতেই অধিরূঢ় হয়ে,—সিংহবর্মার সাহায্যের জন্য যে সব রাজন্যকেরা আসছেন, তাঁদের আমি আটক করব ধনরত্ন সমেত।"

পরের দিন তখন উষারাগ—রাজবাহনকে নিয়ে আসা হল রাজাঙ্গনে। চণ্ডপোত-কেও রক্ষীরা নিয়ে এল। গজরাজের গণ্ড বেয়ে তখন মদধারা ঝরছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সহসা রাজবাহনের গুল্‌ফ-দেশ থেকে খসে পড়ে গেল রূপোর শিক্‌লি। দেখতে দেখতে শৃঙ্খলটির বদল হয়ে গেল চেহারা।—রূপোর শিক্‌লি রূপান্তরিত হয়ে গেল চন্দ্রলেখার মতো সুন্দরচ্ছবি একটি অপ্সরাতে। রাজবাহনকে প্রদক্ষিণ ক'রে এবং করপদ্মে অঞ্জলি রচনা ক'রে অপ্সরাটি বললেন—

"দেব, আমাকে দান করুন আপনার অনুগ্রহ-সিক্ত চিত্ত। আমি সুরসুন্দরী—আমার নাম 'সুরতমঞ্জরী'; সোম-রশ্মি থেকে আমার জন্ম। একদা আমি ভেসে চলেছিলুম আকাশ-পথে—এমন সময় আমার মুখখানিকে পদ্ম ভেবে একটি লোভী কলহংস আমাকে আক্রমণ করে। বাধা দিতে গিয়ে কণ্ঠ থেকে খুলে পড়ে যায় হার। পৃথিবীর দিকে হারখানি পড়তে থাকে। হিমাচলের এক সরোবরে সেই সময়ে স্বল্প জলে অবগাহন-স্নান করছিলেন মহর্ষি মার্কণ্ডেয়। যেই তিনি মাথা তুলেছেন, অমনি সেই হার মহর্ষির পলিত কেশকে শুভ্রতর ক'রে মাথার উপর পড়ে। ক্রুদ্ধ হয়ে ঋষি আমাকে শাপ দেন,—'পাপিনি, লৌহ-জাতিতে পতিত হ। তারই মতো যেন তোর আর চৈতন্য না হয়।' বহু কষ্টে তাঁকে প্রসন্ন করি। প্রসন্ন হয়ে তিনি বল্লেন, 'রাজবাহনের পদযুগে কিন্তু দুটি মাস তোমাকে শিকল

হয়ে বাঁধা থাকতে হবে, তবে নিস্তার পাবে। যাও, ক্ষীণ হবে না তোমার ইন্দ্রিয়-শক্তি।'

কী যে পাপ করেছিলুম জানি না—রূপোর শিকল হয়ে যাই। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা 'বেগবানের' পৌত্র 'মানসবেগের' পুত্র, বিদ্যাধর 'বীরশেখর' আমাকে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে চলে আসেন 'শঙ্করগিরি'তে। তাঁর কাছেই ছিলুম। এদিকে, 'বৎসরাজ'-বংশবর্ধন বর্তমান বিদ্যাধর-চক্রবর্তী 'নরবাহনদত্ত'—যাঁর সঙ্গে বীরশেখরের পিতা মানসবেগের শত্রুতা ছিল,—সেই নরবাহনদত্তের অনর্থ ঘটাবার উদ্দেশ্যে বীরশেখর—তপস্যারত দর্পসারের সঙ্গে স্থাপন করলেন মিত্রতা; দর্পসার তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন—নিজ ভগিনী অবন্তিসুন্দরীকে তাঁকে প্রদান করবেন।

সেদিন আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল নিথর জ্যোৎস্না। বীরশেখরের দেখতে ইচ্ছা হল—মনোরথ-প্রিয়তমা অবন্তিসুন্দরীকে। অবশ হয়ে এল ইন্দ্রিয়, থাকতে আর পারলেন না; প্রবেশ করলেন ইন্দ্রমন্দিরদ্যুতি কুমারীপুরে। "তিরস্করিণী"-বিদ্যার বলে নিজে অদৃশ্য র'য়ে বিস্মিত ক্রোধের মধ্য দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন আপনার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে রয়েছেন অবন্তিসুন্দরী, এলিয়ে পড়েছে তাঁর সুরতক্লান্ত অঙ্গ, ভাষায় অমৃত ঝরিয়ে আপনি আলাপ করে চলেছেন ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কথা—এবং অবন্তিসুন্দরী প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন আপনার ভালবাসার। অত্যন্ত কুপিত হলেও, তিনি তখন আপনার উপযোগী একটি ভিন্ন শাস্তির বিধান করেছিলেন। যখন দেখলেন আপনারা দুজনে গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে গভীর সুখসুপ্তিতে মগ্ন, তখন বোধ হয় দৈবের উৎসাহেই রজত-শৃঙ্খল-স্বরূপিণী আমাকে আপনার দুটি পায়ে বেঁধে দিয়ে সরোষে সরভসে কুমারীপুর থেকে তিনি বেরিয়ে যান। আজ হে দেব, অবসান

হয়েছে অভিশাপ, পূর্ণ হয়েছে দুটি মাস এবং শেষ হয়ে গেছে আপনার পরাধীনতা। এখন প্রসন্ন হয়ে আমাকে যথাদেশ করুন।”

এই বলে সুরতমঞ্জরী প্রণাম করলেন রাজবাহনকে। “অবন্তি-সুন্দরীকে সমস্ত সংবাদ জানিয়ে আপনি আশ্বস্ত করুন”—এই বিশিষ্ট আদেশ দিয়ে রাজবাহন বিদায় দিলেন অপ্সরাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বধ্যভূমির চতুর্দিকে হঠাৎ উঠল বিকট হাহাকার। “হত হয়েছেন, হত হয়েছেন, চণ্ডবর্মা হত হয়েছেন।”

পরক্ষণেই ঘোষণা হল, “সিংহবর্মার কন্যা অম্বালিকার পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্যে চণ্ডবর্মা যে মুহূর্তে প্রসারিত করেছিলেন তাঁর বাহুদণ্ড, সেই মুহূর্তে কোথা হতে এক অদ্ভুতকর্মা তস্কর সেখানে উপস্থিত হয়, চণ্ডবর্মার বাহু আকর্ষণ করে, এবং নখরাস্ত্রের প্রহারে তাঁকে হত্যা করেছে। রাজমন্দিরে বিছিয়ে রয়েছে শত শত শব। সাবধান! নির্ভয়ে তথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তস্কর!”

শ্রুতিমাত্র রাজবাহন মত্তহস্তীর শিখর থেকে মাহুতকে মাটিতে ফেলে দিয়ে হস্তীতেই আরোহণ করে অতিবেগে ধাবিত হলেন রাজ-ভবনের অভিমুখে। দাঁতাল হস্তী দৌড়ে আসছে, পথ ছেড়ে পলায়ন করল জনতা। রাজভবনে উপস্থিত হয়ে মেঘমন্দ্র কণ্ঠে গর্জন করলেন রাজবাহন—

“কোথায় সেই মহাপুরুষ, যিনি মনুষ্যের অসাধ্য এই মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন? আসুন, তিনি আরোহণ করুন আমার এই হস্তীতে। নির্ভয়ে তিনি আসুন, আমার নিকটে এলে দেব বা দানব তাঁকে গ্রহণ করতে পারবে না।”

রাজবাহনের বাণী শুনে সেই মহাপুরুষটি তখন আহ্লাদিতচিত্তে হাত জোড় ক'রে বেরিয়ে এলেন। সংজ্ঞা-সঙ্কুচিত হস্তীটির গাত্র বেয়ে

ত্বরিত আরোহণ করা মাত্র রাজবাহন তাঁকে চিনতে পারলেন। "এ কি, আমার প্রিয় সখা অপহারবর্মা যে!"

বাহুর বেষ্টনী দিয়ে পিছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন অপহার-বর্মা, এবং রাজবাহনও নিজের বাহু দুটিকে বলিত ক'রে আলিঙ্গন করলেন সখাকে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। তাঁদের উপর তখন সৈন্যেরা হানছে বাণ, ছুঁড়ছে কণপ ;···কর্পণ, প্রাস, পট্টিশ, মুষল, তোমর। অদ্ভুত যুদ্ধ করতে লাগলেন অপহারবর্মা। নৃশংস সেই সৈন্য-সংহার! মাটিতে বিছিয়ে যেতে লাগল শত্রুর শব। এমন সময় রাজবাহন দেখতে পেলেন অন্য আর এক দল সৈন্য এল, চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে চণ্ডবর্মার সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিচ্ছে।

ক্ষণপরেই তিনি দেখতে পেলেন,—কর্ণিকা ফুলের মতো গৌর, কুরুবিন্দ ফুলের মতো কুন্তলের রঙ, স্নিগ্ধ নীল টানা-টানা চোখ, পট্টবাস অঙ্গে, কটিতটে রত্ননখ, কৃশ উদর, স্থূল বক্ষ—একটি পুরুষ—অদ্ভুত হস্তনৈপুণ্যে বাণ বর্ষণ করতে করতে শত্রুধ্বংস ক'রে এগিয়ে আসছেন। চরণাঙ্গুষ্ঠের নিষ্ঠুর ঘর্ষণে হস্তীর কর্ণমূল তাড়িত ক'রে তিনি নিকটে এলেন ; এবং "ইনি নিশ্চয় দেব রাজবাহন"—পূর্বোপদেশ মতো এই সিদ্ধান্ত ক'রে, কৃতাঞ্জলি প্রণতি জানালেন রাজবাহনকে। তার পরে অপহারবর্মার দিকে দৃষ্টিসন্নিবেশ ক'রে বললেন, "সখা, তোমার আদিষ্ট পথ অবলম্বন ক'রে রাজন্যদের উপস্থিত করিয়েছি। স্ত্রীলোক এবং শিশুদের বাদ দিয়ে অন্যদের হত-বিধ্বস্ত করতে এঁরা আর কিছু বাকি রাখেন নি। এখন আমার কি কর্তব্য বলো।"

অপহারবর্মা সানন্দে বললেন—"দেব, আপনার এই ভৃত্যটির প্রতি দৃষ্টিদান ক'রে এঁকে অনুগৃহীত করুন। ইনি এবং আমি,—চেহারায় শুধু ভিন্ন। ইনি 'ধনমিত্র'। দোষ যদি না হয়, তাহলে অনুমতি দিন—ধনমিত্র নিজে গিয়ে অঙ্গরাজকে বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দিক, এবং

বিচ্ছিন্ন কোশ-বাহনগুলিকে একত্র ক'রে রাজন্যদের সঙ্গে একান্তে সুখোপবেশন ক'রে আপনার সেবা করুক।"

রাজবাহনের অনুমতি লাভ ক'রে বিদায় নিলেন ধনমিত্র।

নগরের বহির্ভাগে বিরাট রোহিনদ্রুমের ছায়াতলে রাজবাহন এবং অপহারবর্মা সেই দাঁতাল মত্ত হস্তীটির পৃষ্ঠদেশ থেকে অবতরণ করলেন। পাটের কাপড়ের মতো সেখানে গঙ্গার বালিয়াড়ীর রঙ। দুজনের ভারি মিষ্টি লাগতে লাগল গঙ্গার ঢেউ-ছোঁয়া আর্দ্র বাতাস। তটপ্রান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছেন—এমন সময় ধনমিত্র উপস্থিত হয়ে প্রণাম করলেন রাজবাহনকে।—তাঁর সঙ্গে এসেছেন উপহারবর্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত এবং বিশ্রুত ;—এসেছেন মৈথিল প্রহারবর্মা, কাশীপতি কামপাল,—এসেছেন চম্পেশ্বর সিংহবর্মা।

আনন্দের শরাঘাতে লাফিয়ে উঠলেন রাজবাহন।

"এও কি···সম্ভব ! আমার···সমস্ত···মিত্রগণ একেবারে একসঙ্গে !"

এ যে অভ্যুদয় !

পীড়িত আলিঙ্গনের উৎসব চলল ক্ষণকাল।

তার পরে অপহারবর্মা রাজবাহনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন মিথিলেশ্বরের, কাশীপতির এবং চম্পেশ্বরের। তাঁদের সালিঙ্গন অভিনন্দন জানালেন রাজবাহন। পিতৃতুল্য তাঁরাও করলেন আশীর্বাদ।

তার পর বন্ধুদের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল প্রীতির সংলাপ। বয়স্যদের কাছে হাসতে হাসতে রাজবাহন বর্ণনা ক'রে গেলেন নিজের, সোমদত্তের এবং পুষ্পোদ্ভবের কীর্তিকাহিনী। স্থির হ'ল—অন্য সকলেও নিজের বৃত্তান্ত জানাবেন—একে একে পরে।

প্রথমেই অপহারবর্মা আরম্ভ করলেন তাঁর কাহিনী।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

অপহারবর্মা-চরিত

হে দেব, ব্রাহ্মণের উপকার করবার উদ্দেশ্যে আপনি তো পাতালের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতে নেমে গেলেন। আমরা, আপনার মিত্রেরা, তখন স্থির করলুম, আপনাকে খুঁজে বার করতেই হবে। অন্বেষণ-ব্যগ্র হয়ে চারদিকে আমরা ছড়িয়ে পড়ি। আমিও পা দিয়ে মাটি মাড়াতে মাড়াতে এগিয়ে চলতে থাকি। শেষে একদা উপস্থিত হই অঙ্গদেশের গঙ্গাতটে—চম্পানগরীর ঠিক বাইরে। সেখানে দেখি কয়েকজন নাগরিক জটলা পাকিয়ে সংলাপে মত্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মুখে জানতে পাই 'মরীচি' নামে কোন এক মহর্ষি নিকটেই আশ্রম রচনা করে বাস করেন; অদ্ভুত তাঁর তপঃপ্রভাব, দিব্য চক্ষুর তিনি অধিকারী। মন বললে—ওঁর কাছে যাও, রাজকুমার কোন্ পথে গেছেন নিশ্চয় উনি বলে দিতে পারবেন।

আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলুম। আশ্রমে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল জনৈক তাপস একটি তরুণ আমগাছের ছায়ায় বসে রয়েছেন;—তাঁর মুখে কেমন যেন উদ্‌বিগ্ন-উদ্‌বিগ্ন ভাব, আর সেই উদ্‌বিগ্নতার জন্যেই বোধ হয় তাঁর দেহের রঙটিও ফিকে হয়ে গেছে। আমাকে তিনি অভ্যর্থনা করলেন; আমিও আতিথ্যলাভ করে বিশ্রাম করলুম ক্ষণকাল। তার পরে তাপসকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি বলতে পারেন ভগবান মরীচি—তিনি কোথায় আছেন? আমার একটি বন্ধু প্রসঙ্গে পড়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছেন; তিনি যে কোন্ পথে গেছেন, মহর্ষির কাছ থেকে সেই খবরটি জানবার বাসনা রাখি। শুনেছি, আশ্চর্য তাঁর জ্ঞান-বৈভব।"

আমার কথা শুনে তাপসটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, গাঢ় গরম নিশ্বাস। তার পরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন ঃ

"হ্যাঁ, ছিলেন বটে এই আশ্রমে সেই রকমের একটি মুনি। কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা বড় শোচনীয়। তাঁর ব্যাপার বলি শুনুন ;—

একদিন এই আশ্রমে তিনি বসে রয়েছেন, এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে আশ্রমে প্রবেশ করে নগরীর প্রসিদ্ধা বারাঙ্গনা যুবতী 'কামমঞ্জরী'। অঙ্গপুরীর যৌবন-পাখী-ধরার সে যেন ফাঁদ। পয়োধরের উপরে তারার মতো ফুল কেটে কেটে চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়ছে। সর্বহারার প্রতিমা! মরীচি মুনির পায়ের কাছে সে লুটিয়ে পড়ল, ফাঁপা-ফাঁপা এলোচুলে ছেয়ে গেল মাটি। অবাক কাণ্ড! এক মুহূর্ত যায় নি,—প্রবেশ করল তার মা এবং তার স্বজনেরা ; কামমঞ্জরীর কাছে তারা ভিক্ষা করতে এসেছে—দয়া। তারাও হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল মুনির পায়ের কাছে।

মরীচি আর কি করবেন! করুণায় আর্দ্র হয়ে গণিকাকে মাটি থেকে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কারণ কি তোমার এতবড় দুঃখের, এতবড় আর্তির ?" মুনির বাণীতে ছিল বৃষ্টিভেজা মহিমা।

লজ্জায় যেন নুয়ে পড়ে, বিষাদে যেন অবশ হয়ে, আবার গরিমায় যেন মাঝে মাঝে স্ফীত হতে হতে গণিকা তাঁকে বললে,—"ভগবন্, ঐহিক সুখের আধার হয়ে আমি আর পৃথিবীতে থাকতে চাই না। আমার হৃদয়ে জেগেছে পারত্রিক কল্যাণের কামনা। শুনেছি আর্তদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করাই আপনার সম্পৎ। এখন থেকে ভগবানের শ্রীচরণই আমার শরণ হল।"

গণিকার জননী কিন্তু তখন আরম্ভ ক'রে দিয়েছে ঘটা ক'রে করজোড়ে প্রণাম। মাথার সাদা চূড়ো মাটি ছোঁয়, হাত ওঠে আর পড়ে। বলতে লাগল—

"ভগবন্, আপনার ঐ দাসীটা যা বলছে তাতে বোঝায়, সব দোষটাই যেন আমার। বলি, আমার দোষটা কোন্‌খানে হল ? আমি

ওকে বলেছি—এবং সে বলার অধিকার গণিকামাতার নিশ্চয় আছে —'নিজের ব্যাবসা ভুলিস্ নে, কাজ গুছিয়ে নে।'আমি গণিকার মা। বলুন, কন্যার উপর মায়ের কি কোনো অধিকার নেই? নিশ্চয়ই আছে, দেশকালও বলে—আছে।

দুধের মেয়ের জন্মদিন থেকে আরম্ভ ক'রে—বলি,—কে মাথায় তাকে হলুদ, মালিশ করে দেয় তেল? দেহের ব্যাবসাতে আমাকেই তো দেখতে হয় ওর দেহের কাজ। খাওয়া-দাওয়ার তদ্‌বির করে কে? রোগ-তাপ দূর ক'রে দেয় কে? জৌলুষ, জোর, রঙ, মেধা বাড়িয়ে কে ওর শরীরটাকে ঝক্‌ঝকিয়ে রাখে? পাঁচ বছরের পর থেকে বাপ বলতে কে ছিল, কোথায় বা সে গেল—তাই জানেন না; আবার এখন বলেন কিনা মায়ের কোনো অধিকার নেই!

জন্মদিনে বা পুণ্যদিনে উৎসবের মঙ্গলবিধি পূজা-পাঠ, অনঙ্গ-বিদ্যার সমস্ত রকমের পাঠ আমিই ওকে দিয়েছি, আমিই ওকে শিখিয়েছি নাচতে, গাইতে, বাজাতে, নাট্য করতে, ছবি আঁকতে, যাকে বলে স্বাদ নিতে। গন্ধ-ফুল তুলে এনে ঘর-সাজানোর বিদ্যা আমার কাছেই ওর পাওয়া। লিপি-জ্ঞানই বলুন, আর বাক্যির ঠারঠোর মাজাঘষাই বলুন, সেও আমার কৃপাতেই হল। এখন ব্যাকরণ, তর্ক এবং জ্যোতিষে ওর ভাসা-ভাসা জ্ঞান জন্মেছে; জীবিকা-উপার্জনের বিদ্যায়, ক্রীড়াকৌশলে, সজীব এবং নির্জীব পাশাখেলায় ও একেবারে পাকা হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসী লোক মারফত ওকে শিখিয়েছি রতিবিদ্যার অভ্যন্তরকলা। শিখিয়েছিলুম বলেই তো ঐ মেয়েটা এখন যাত্রা-উৎসবে ওসব প্রকাশ করতে পারে। ও যখন ফোলা-ফাঁপা ঢিলে-ঢালা নাচের পোষাক প'রে দাঁড়ায়, তখন চক্ষুধরদের দেখতেই হয় চেয়ে। শিক্ষক রেখে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত করতে পর্যন্ত ওকে আমি শিখিয়েছি। ঐ কামমঞ্জরীর জন্যে কী যে না করেছি তা জানি না। প্রসিদ্ধ কলাবিৎদের আনুকূল্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছি—যশঃ; গণৎকারদের দিয়ে ঘোষণা করিয়েছি কল্যাণলক্ষণ; নাগরিক পুরুষদের সমবায়ে পীঠমর্দ, বিট,

বিদূষক, ভিক্ষুকীদের মুখ দিয়ে প্রচার করিয়েছি ওর রূপ, শীল, ওর মাধুর্যের প্রস্তাবনা। সমস্তই আমার করা। এখন বলে কিনা, এত যে করেছে, সেই মায়ের কিনা কোনো অধিকার নেই মেয়ের ওপর!

তরুণদের চোখ তো সেঁটে থাকবেই, কিন্তু মূল্যটি আদায় করতে—এই মা। আবার মানুষ ঠিক করে দিতে—সেই মা; রাগান্ধ বা উন্মাদিত নায়কটি স্বাধীন কি না জানতে হবে, তার রূপ কেমন, বয়স কত, অর্থশক্তি আছে কি না, প্রতারক কি না, হাত দরাজ কি না, শিল্পমাধুর্যের অধিকারী কি না, সব খোঁজ নিতে—সেই মা। আবার মানুষটি হয়তো খুব গুণবান কিন্তু এখনও লায়েক হন নি, অনেক কষ্ট ক'রে সেই হেন শিকারকে ফাঁদে ফেলতে—সেই মা। নাবালকের সঙ্গে গান্ধর্ব-মতে মিলন ঘটিয়ে তার পর গুরুজনদের কাছ থেকে শুল্ক হরণ করা, কামস্বীকৃত অর্থ আদায় করতে শেষ পর্যন্ত বিচারশালায় যাওয়া—তাতেও সেই মা!

কত রকমের কাজ! প্রেমিকের জন্যে দুহিতা আমার 'একচারিণী' ব্রত উদ্‌যাপন করবেন—করিয়ে দে তার অনুষ্ঠান; নিত্য নৈমিত্তিক প্রীতিদানের বাহুল্যে নাগর তার সর্বস্ব হারাতে বসেছে, বিচিত্র উপায় অবলম্বন করে মা চুরি করবে তার বাকি ধনটুকু! প্রেমিক লোভী কিন্তু খরচে কৃপণ—এমন লোককে বাড়ি ছাড়া করা মায়ের কাজ; প্রতিবেশীকে দিয়ে কার্পণ্যের অপবাদ রটিয়ে প্রেমিকের হাত খালি করা—মায়ের কাজ; নিকড়ি-থলি নাগর এসেছেন—বাক্যের বাটালি দিয়ে তাকে কাটা, তার নিন্দে রটানো, দুধের বাছাকে তার সঙ্গে মিলতে না দেওয়া, লজ্জায় গঞ্জনা দেওয়া, ছুতোনাতা করে তাকে অপমান করা, শেষ পর্যন্ত রাস্তায় বার করে দেওয়া—মায়ের কাজ। আবার যখন রাজার হালে অনিন্দ্য আঢ্য নাগরিকেরা সব আসবেন, কী তাঁদের হুকুম দেবার ঘটা—তখন, যাও, ব'স গিয়ে তাঁদের সঙ্গে; এঁরা অর্থও করতে পারেন, অনর্থও করতে পারেন—

এই সব বিচার করতে করতে তাঁদের সঙ্গে কন্যার মিলনের বিধিব্যবস্থাও করে দাও। কত কাজ!

কিন্তু গণিকার পক্ষ থেকে প্রেমিকের উপর ঢলে পড়াটা একেবারেই কোনো কাজের কথা নয়;—হোক না কেন সে প্রেমিক রতন। যদি ঢলে পড়ে, সেখানে মাতার বা পিতামহীর শাসন কি চলবে না? ব্রহ্মার দিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু কামমঞ্জরীর ব্যবস্থা হয়েছে অন্য রকমের। নিজের ধর্ম, জীবিকা সমস্ত ভুলে গেল। কোথা থেকে হঠাৎ এল এক আগন্তুক বিপ্র যুবক, রূপ-মাত্র তার ধন, অমনি আমার মেয়েটি নিজেই খরচ করতে লেগে গেলেন; দেখতে দেখতে, হায় কপাল,—তিন মাস মিলনেই কাটিয়ে দিলেন। আমি তাকে বলি—ব্রাহ্মণটার কাছ থেকে অর্থ নে;—এক্কেবারে চটেই খুন! নিজের কুটুম্বদের দূর করে দিলে।—আমি তাকে মানা করে বললুম, দেখ্ এ তোর ভাল বুদ্ধি নয়, এতে ভাল হবে না—ব্যস্, মেয়ে আমার চললেন বনবাসে।

ভগবান্, এই আমার সেই মেয়ে,—'কামমঞ্জরী'। একেবারে দৃঢ় পণ ক'রে ব'সে আছেন। আর এদিকে চেয়ে দেখুন,—এই দেখুন তার কুটুম্বদের, এদের আর অন্য গতি নেই, না খেতে পেয়ে এরা মরবে।"

বলতে বলতে কাঁদতে লাগল মা।

অনুকম্পা হ'ল ঋষির। মরীচি তখন কামমঞ্জরীকে বললেন,—

"ভদ্রে, অরণ্যবাস একটি দুঃখের খনি। তার ফল মোক্ষ অথবা স্বর্গ। ঐ দুটির মধ্যে প্রথমটিকে পাওয়ার পথ হচ্ছে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। প্রায়ই দেখা যায় জ্ঞানের পথ বড় দুরূহ। দ্বিতীয়টিকে পাওয়া সকলের পক্ষেই সহজ, যদি তাঁরা কুলধর্ম মেনে জীবনের পথে চলেন। তাই বলছি, মোক্ষের চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও, ওর আরম্ভ থেকেই তুমি অশক্যা হবে;—তোমার মা যা বলছেন তাই কর।"

কামমঞ্জরী বললে—"ভগবানের পাদমূলে আমার যখন শরণ

নেওয়া হ'ল না, তখন হিরণ্যরেতা অগ্নিদেবই এই দীন-হীনার শরণ্য হলেন।"—

মানিনীর উদাসীনভাব লক্ষ্য ক'রে মরীচি মুনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন; শেষে গণিকা মাতাকে বললেন, "সম্প্রতি ঘরে ফিরে যাও, কয়েকটি দিন অপেক্ষা কর। তোমার মেয়েটি সুকুমারী। চিরটা কাল সুখই কেবল ভোগ ক'রে এসেছে! দু-চার দিনের অরণ্যবাসে উদ্‌ব্যস্ত হয়ে আত্মস্থ হবে। আমিও বারংবার ওকে বোঝাব।"

কামমঞ্জরীর মা এবং স্বজনবর্গ নগরীতে ফিরে যায়।

গণিকা ধীরে ধীরে আশ্রমধর্ম পালন করতে থাকে।

তার ভক্তির মধ্যে লঘুতার লেশও দেখা গেল না; অঙ্গে দিল দুখানি ধৌত বাস, শরীর-সংস্কারে তেমন যেন আদর নেই।

আলবাল পূর্ণ ক'রে ছোট ছোট বনতরুতে জল দিত, পূজার ফুল তুলত, কাম-শাসন মহাদেবের জন্য গন্ধমাল্যের রচনা ক'রে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে নৃত্য-গীত এবং বাদ্যের প্রকাশ ক'রে বহু-প্রকার পূজা-পাঠ করত।

ঋষির কাছে ব'সে অধ্যাত্মবাদ ও ত্রিবর্ণসম্বন্ধী কথা নিয়ে সংলাপের আনুকুল্যে কামমঞ্জরী অল্পদিনের মধ্যে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলল মহর্ষির মন।

একদা এই রকমে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে মহর্ষির মন, এবং তাঁরা দুজনে রয়েছেন নিভৃতে, এমন সময় কামমঞ্জরী বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে হাসতে হাসতে ব'লে উঠল, "লোকেরা কি মূঢ়? ধর্মের সঙ্গে তারা সমান মর্যাদা দিতে চায় অর্থের আর কামের?"

মরীচি প্রশ্ন করলেন—"তোমার মতে তা'হলে অর্থ এবং কামের চেয়ে ধর্ম কতগুণ বড়?"

লজ্জামন্থর হ'ল কামমঞ্জরীর ভাষণ—

"আশ্চর্য, আমার মতো একটি সাধারণীর কাছ থেকে আপনার

মতো একজন মহর্ষি ত্রিবর্গের শক্তি এবং তার দুর্বলতা-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে চান? আপনার এই প্রেরণা প্রকারান্তরে দাসীকে অনুগ্রহ দেখানো নয় কি? যখন প্রশ্নই করেছেন তখন উত্তর দেবার চেষ্টা করি। এ কথা মানতেই হবে—যে, ধর্ম না থাকলে অর্থ আর কামের উৎপত্তি হয় না। ধর্ম যখন অর্থ-কামের অপেক্ষা রাখে না, তখন সেই ধর্ম প্রসব করে কেবলমাত্র নিবৃত্তি-সুখ ; সেই ধর্মে সাধ্য হচ্ছে একমাত্র আত্মতত্ত্বের সমাধান। অর্থ এবং কামের মতো বাহ্য সাধনবস্তুর অত্যন্ত অধীন হয়ে পড়ে না ধর্ম। যাঁরা তত্ত্বদর্শী তাঁরা জোর গলায় বলেছেন—

'অর্থ এবং কামকে যেমন করেই না অনুষ্ঠান কর, তারা ধর্মকে বাধা দিতে পারে না। বাধা পেলেও—ধর্ম স্বল্প সমাধির ভিতর দিয়েই—কামার্থ দোষকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দেয়, এবং প্রভূত শ্রেয়ের কারণ হয়। সেই জন্যেই দেখা যায়—পিতামহ ব্রহ্মার তিলোত্তমার প্রতি অভিলাষ, ভবানীপতির সহস্র সহস্র মুনিভার্যা-সংদূষণ, পদ্মনাভ বিষ্ণুর ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরবিহার, নিজের দুহিতার উপরেও প্রজাপতির প্রণয়প্রবৃত্তি, ইন্দ্রের অহল্যাজারতা, চন্দ্রের গুরুতল্পগমন—সূর্যের বড়বা-লঙ্ঘন, উতথ্যের ভার্যার প্রতি বৃহস্পতির অভিসার, অনিলের বানরী-সমাগম, পরাশরের দাশকন্যা-দূষণ, পরাশর-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভ্রাতৃবধূ-সম্ভোগ এবং অত্রিমুনির মৃগীসমাগম।'

অমরেরাও দেখুন, অনেক ব্যাপারে অসুরদের ঠকিয়েছেন, কিন্তু জ্ঞানবল তাঁদের ধর্মহানি ঘটতে দেয়নি। মন যদি ধর্মপূত হয়, আকাশের মতো তাতে ধুলো লাগে না। সেই জন্যেই আমার মনে হয় অর্থ এবং কাম, ধর্মের একশ ভাগেরও এক ভাগকে স্পর্শ করতে পারে না।"

কামমঞ্জরীর মুখে এই সব কথা শুনে ঋষির কেমন যেন ভাবান্তর হ'ল। অনুরাগ, বাসনা বৃদ্ধি পেল। তিনি বললেন—

"বিলাসিনি, ঠিকই তুমি দেখেছ। তত্ত্বদর্শীরা যে ধর্মকে অনুসরণ

করেন, বিষয়ভোগ সেই ধর্মকে নষ্ট করতে পারে না। কিন্তু জন্ম থেকেই আমি অর্থ এবং কাম ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। আমি জানতে চাই—অর্থ এবং কামকে ; কী তাদের স্বরূপ, কেমন তাদের পরিজন-পরিবার, কীই বা তাদের ফল।”

গণিকা তখন বললে,—

“অর্থের আত্মরূপ হচ্ছে অর্জন, বর্ধন এবং রক্ষণ ; কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, সন্ধি, বিগ্রহ ইত্যাদি এর পরিবার ; এবং এর ফল হচ্ছে তীর্থে তীর্থে ঘুরে সৎপাত্রে অর্থ-দান।

কাম কিন্তু বিষয়াসক্তচিত্ত স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে একটি নিভৃত সুখস্পর্শবিশেষ। এর পরিবার,—জগতের যাবতীয় রমণীয় ও উজ্জ্বল বস্তু। এর ফল,—পরম একটি আহ্লাদ, প্রত্যক্ষ সুখ। এই আহ্লাদের জন্ম হয় আলিঙ্গন, চুম্বন, পেষণ ও মন্থন থেকে ; এর স্মরণটিও সুমধুর। মনে হয় যেন সার্থক হয়ে গেছি। এর অনুভূতি কেবল নিজের মধ্য দিয়ে। এই সুখটুকু পাবার আকাঙ্ক্ষায় বিশিষ্ট বিশিষ্ট মানুষ কী যে না ক'রে বসেন তা জানি না! তাঁরা কষ্ট সহ্য করেন, তপস্যা করেন, মহাদানে সর্বস্ব খোয়ান। এই সুখটুকুর জন্যেই ঘটে গেছে নিদারুণ কত যুদ্ধ, ভীষণ কত সমুদ্রলঙ্ঘন।”

নিভৃত আলাপের পর নিয়তিই প্রবল হ'ল,—না, রমণীর চাতুর্যই জয়ী হ'ল,—না, ঋষি-বুদ্ধির বিভ্রমই ঘটল—জানি না, কিন্তু মরীচির অনাদর ঘটল তপশ্চরণে। তিনি ভালবেসে ফেললেন, মিলন হ'ল কামমঞ্জরীর সঙ্গে। অনেক দূর গড়াল রতি-বিহার। মরীচির যেন লোপ পেয়ে গেল বুদ্ধিবৃত্তি। শেষে একদিন প্রবহণে চড়িয়ে কামমঞ্জরী তাঁকে নিয়ে চলে এল চম্পানগরীতে, এবং উদার-শোভা রাজবীথি দিয়ে পৌঁছে গেল স্বভবনে। ঘোষণা করিয়ে দিলে, “আগামী কাল কামোৎসব হবে।”

পরের দিন মরীচিকে স্নান করিয়ে চন্দন মাখান হ'ল, মাথায় পরান হ'ল বকুল ফুলের বিনোদমাল্য। ঋষির কেবল তখন মনে হতে লাগল তিনি প্রণয়ীর কৃত্য করছেন—কামোৎসবে। হাত-পা মেলে, নিজের কাজ নিজে করবার মতো প্রেরণাও তখন আর তাঁর ছিল না। কামমঞ্জরীর ক্ষণিক অদর্শন অসহ্য, তাঁকে বিহ্বল করে দেয়।

কামমঞ্জরী এল। প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে মরীচি ঋষিকে যখন উৎসব-সমাজে নিয়ে গেল, তখন সুখের বাতাসে ঋষির হৃদয় দুলছে। নৃপতি ছিলেন উপবনের প্রান্তে। চতুর্দিকে এক শত যুবতী। ঋষিকে নিয়ে কামমঞ্জরী সেইখানে এল। ব্যাপার দেখে মৃদু-মন্দ হেসে উঠলেন মহারাজ। তার পর আদেশ দিলেন—"ভদ্রে, ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে ব'সো।" মহারাজকে সবিভ্রম প্রণাম ক'রে মৃদু হেসে সেইখানেই বসে পড়ল কামমঞ্জরী।

কিছুক্ষণ পরেই একটি উত্তমাঙ্গনা রাজার নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, "দেব, কামমঞ্জরী আমাকে জিতে নিয়েছে। কথা দিয়েছিলুম। সেই কথামতো আজ থেকে আপনার সমক্ষেই আমি কামমঞ্জরীর দাসীবৃত্তি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি।"

উৎসব-প্রমোদীদের মধ্যে জেগে উঠল বিস্ময়, হর্ষ, কোলাহল। কামমঞ্জরীকে মহারাজ হৃষ্টচিত্তে অনুগ্রহদান করলেন—মহার্ঘ অলঙ্কার এবং পরিবর্হ। পৌর-বারাঙ্গনারা—লক্ষমুখী হয়ে উঠল প্রশংসায়।

বাড়িতে ফিরে এল না কামমঞ্জরী ; ঋষিকে বলল—

"ভগবন্, গ্রহণ করুন আমার অঞ্জলিবদ্ধ বিদায়-প্রণাম। চিরদিনের জন্যে অনুগৃহীতা হয়ে গেছে আপনার দাসী। নিজের স্বার্থ তাকে এই ধরনের আচরণ করতে বাধ্য করেছিল।"

ঋষির আবার প্রণয়! প্রণয়ের মস্তকে যেন ভেঙে পড়ল মেঘ-চমকানো বজ্র। স্তম্ভিত-বিস্ময়ে ঋষি বললেন, "প্রিয়ে, এ আবার কি হয়ে গেল? কোথা থেকে এল তোমার এ-হেন ঔদাসীন্য? একটি

তুচ্ছ বাতাসে মিলিয়ে গেল—আমার উপর তোমার এত বড় অসাধারণ অনুরাগ ?”

কামমঞ্জরীর রাঙা ঠোঁটের কোমল ভঙ্গিটি তখন মৃদু হেসে বললে—

“মহারাজের সামনে ঐ যে বিদুষীটি আমার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন, তাঁর এবং আমার মধ্যে একদিন সংঘর্ষ ঘটেছিল। হেসে বলেছিলেন, ‘মহর্ষি মরীচির ডাঁটা ভাঙতে পারিস্, তবে বুঝব তোকে।’ আমিও বলেছিলুম, ‘বেশ, যদি পারি, তুই আমার দাসী হবি।’ উনি বলেছিলেন, ‘তাই।’ মহর্ষি, আপনার অনুগ্রহে সেই প্রতিজ্ঞা আমার সফল হয়েছে।”

মরীচির মন ভেঙে পড়ল।—কে যেন তাঁকে আসন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল ! হঠাৎ মনে হ’ল কী দুষ্পথেই না চলেছে তাঁর বুদ্ধি ? চোখ ভ’রে মন ভ’রে নেমে এল পশ্চাৎতাপ, অনুশোচনা। কাম-রাজত্বের এই যে দেখা যাচ্ছে বিরাট গৃহখানি, এর নীচে কি মাটি নেই, রয়েছে কেবল শূন্যতা ?

মহাভাগ, যে তপস্বীটিকে নিয়ে এই ক্রূর খেলা খেলে গেল কামমঞ্জরী—আমিই সেই মরীচি। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে যে ভালবাসার সে সৃষ্টি করেছিল, সেই ভালবাসাকে উপড়িয়ে ফেলে, বারাঙ্গনা আমাকে দান করে গেছে মহা-বৈরাগ্য। আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই আমার আত্মা সাধন-ক্ষম হয়ে উঠবে। আপনার বাসনা তখন আমি মেটাতে পারব। আমার অনুরোধ, কয়েক দিন আপনি অপেক্ষা করুণ এই অঙ্গপুরীতে—চম্পানগরীতে।”

সখা, এমন সময় অস্তে গেলেন সূর্যদেব ; বোধ হয়—ঋষি-মনের তামসিকতার স্পর্শ-দোষের ভয়ে। ঋষি-মুক্ত হ’য়ে অনুরাগের রঙ সন্ধ্যার মতো হ’ল—আঁধার-বরণ। বৈরাগ্যের মতো সঙ্কুচিত হ’য়ে গেল পদ্মফুলের অরণ্য।

মুনির অনুশাসন অনুসারে সন্ধ্যা-বন্দনা সাঙ্গ ক'রে, অনুরূপ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে রাত্রি কাটালুম, এবং তার পরের দিন পূর্বপর্বতের চূড়োয় কল্পদ্রুমের নতুন পাতার মতো যখন ফুটে উঠেছে অরুণের অগ্নিছটা,—তখন ঋষি মরীচিকে প্রণাম ক'রে আমি পথ ধরলুম চম্পানগরীর। চলতে চলতে দেখি রাস্তার পাশেই ক্ষপণক-দের একটি বিহার। বিহারটির বাইরে লাল অশোকফুলের গাছ। জায়গাটি নির্জন, জনৈক ক্ষপণক সেখানে ব'সে রয়েছেন। এমন কুশ্রী তাঁর চেহারা, যে কি বলব! কুশ্রীতাই আমাকে যেন টেনে নিয়ে গেল তাঁর কাছে। কৃপণ বর্ণ, মনে—কিসের যেন গভীর ব্যথা, আচার নিয়ম বহুদিন পালন করেন নি। বুকের উপর চোখের জলের মলিন পঙ্ক। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে কাছে ব'সে তাঁকে প্রশ্ন করলুম,

"মহাশয়, আমি বুঝতে পারছি না, তপস্যার মধ্যে ক্রন্দন কেমন ক'রে স্থান পায়? যদি গোপনীয় না হয় তা হ'লে আপনার শোকের কারণটি আমাকে বলুন।"

তিনি বললেন—"সৌম্য, শুনুন! এই চম্পানগরীতে এক শ্রেষ্ঠী থাকেন, তাঁর নাম 'নিধিপালিত'। আমি তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র 'বসুপালিত'। কিন্তু এখানে আমাকে সবাই 'বিরূপক' ব'লে ডাকে। কেন যে,···বোধ হয় বুঝতে পারছেন। আমার মতো কুশ্রী পুরুষ ভূভারতে আর নেই। আবার এই চম্পানগরীতেই আর একটি পুরুষ আছেন—'সুন্দরক' তাঁর নাম। সত্যিই তিনি সুন্দর। রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, কলাবিদ্যায় সুন্দর, কিন্তু ধনৈশ্বর্যে তিনি একেবারেই পুষ্ট নন, অসুন্দর। আপনি বোধ হয় জানেন প্রতিনগরেই ধূর্ত থাকে, যারা ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে নিজেদের পেট ভরায়।—তাদের বলে 'বৈরোপজীবী'। আমার ধন এবং সুন্দরকের রূপ—এই দুটিকে নিমিত্ত ক'রে, তারা শেষ পর্যন্ত সফল হ'ল আমাদের মধ্যে একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিতে। সেও ঘটল আবার উৎসব-সমাজে। অপমানের উপর অপমান; কড়া কথার উত্তরে কড়া কথা! শেষে

সেই পৌরধূর্তেরা আমাদের দুজনকে কোনো ক্রমে থামিয়ে দিয়ে বলে,—

'পুরুষত্বের মূল !—ও সে রূপও নয়, ধনও নয়। তাঁকেই আমরা পুরুষ ব'লে মানতে রাজী আছি যাঁর···যৌবন-প্রার্থিনী হবে···সর্ব-শ্রেষ্ঠা গণিকা। এই আমাদের চম্পানগরীতে ঐ তো রয়েছেন যুবতীদের মুকুটমণি কামমঞ্জরী। তিনি যাঁকে বরণ ক'রে নেবেন তিনিই হরণ করবেন সৌভাগ্য-পতাকা।'

আমরা দুজনেই তখন দূত প্রেরণ করলুম কামমঞ্জরীর কাছে। আমার দূতই সফল হ'ল। খবর এল, আমিই কামমঞ্জরীর ভালবাসার, তার উন্মাদনার খনি। তার পরে একদা আমি এবং সুন্দরক···একত্রে ব'সে রয়েছি উৎসব-সমাজে, প্রবেশ করল কামমঞ্জরী, আমার দিকে এগিয়ে এল। কটাক্ষ তো নয়—যেন নীলপদ্মের মাল্য। আমার অঙ্গে · লাগল সেই মালা। আর সুন্দরকের সুন্দর মুখখানি···লজ্জায় নীচু হয়ে গেল। তখন বুঝেছিলুম কী সুখই না ছড়িয়ে দিয়ে যায় সৌভাগ্য !

কামমঞ্জরীকে আমি আমার ঈশ্বরী ক'রে ফেললুম। আমার সর্বস্ব তার পায়ের তলায়, আমার গৃহ তার করায়ত্ত, আমার জ্ঞাতিবর্গ তার সেবাদাস, আমার দেহ তার অঙ্কলীন, আমার প্রাণ তার মুঠোর মধ্যে। প্রথমে বুঝি নি, কিন্তু শেষে—আমার নিজের বলতে যখন আর কিছুই রইল না, তখন আমি নিজেই নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে গেলুম। সর্বহারা কৌপীন-সম্বল। রাস্তার লোকদের ঠোঁট থেকে ছুটে আসতে লাগল একটা সার্থক উপহাসের ঢেউ। সইতে পারলুম না, অসহ্য হ'ল পৌরবৃদ্ধদের ধিক্কার।

জৈনায়তনে এসে উঠলুম। এখানে এক মুনি আমাকে উপদেশ দেন—'মোক্ষমার্গ নাও, ঐ বেশ···বেশ্যা-সেবীদেরই সাজে।' প্রবল বৈরাগ্যে কৌপীনটিও ত্যাগ করলুম। কিন্তু সে কি সহ্য হয় ? সমস্ত

দেহের চামড়ার উপর জমাট ময়লা পাঁক—সহ্য হয় না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে উপড়িয়ে ফেলতে হয় মাথার চুল, গায়ের লোম। উঃ, সে কী ব্যথা,—কিছুতেই সহ্য হয় না। আর সব চেয়ে বড় কষ্ট, ক্ষিদে পেলেও খাবার নেই, পিপাসা পেলেও ঠোঁটে জল ঠেকাতে পাবে না!—আর পারি না। স্থান নেই, আসন নেই, ভোজন নেই,—নতুন-ধরা হাতীর মতো আমি প্রবল যন্ত্রণায় উদ্‌বেজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভাবতে বসেছিলুম—'আমি তো দ্বিজাতি বৈশ্য। পাষণ্ডদের পথে নামা আমাদের স্বধর্ম নয়। আমাদের পূর্বজেরা চলতেন শ্রুতিস্মৃতিবিহিত পথ ধ'রে। কিন্তু কি কপালই না আমার! অঙ্গে একটা ভদ্র পোশাক পর্যন্ত আজ নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নিন্দা শুনে শুনে বোধ হয় নরকও আর আমার পক্ষে সুখের আস্তানা হবে না। নিজেকে প্রতারণা ক'রে এই অধর্মের পথে চলে, কী ফল পাব? একেই কি ধর্ম ব'লে মেনে নিতে হবে?'

মহাশয়, তাই এই জনহীন স্থানে ব'সে কাঁদছি। রক্তাশোকের নীচে ব'সে···আপন মনে বিচার ক'রে দেখছি, কী নষ্টপথেই না চলেছি! এই পথই আমাকে কাঁদাল।"

বসুপালিতের ইতিহাস শুনে আমার মধ্যে উদয় হ'ল অনুকম্পার। বললুম, "আমাকে ক্ষমা করবেন, ··কিন্তু আমার অনুরোধ, কিছুকাল এখন এখানে আপনাকে থাকতেই হবে। সেই বারাঙ্গনা কামমঞ্জরী যাতে আপনার কাছে···নিজ ধন নিয়ে উপস্থিত হয় আমি তারি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। উপায় আছে, অনেক উপায় আছে।"

রক্তাশোকের তলদেশ পরিত্যাগ ক'রে বিরূপক উঠল, আমিও উঠলুম। সামান্য একটু আশ্বাস প্রাণে যে কতখানি বল আনে, তা প্রণিধেয়।

চম্পানগরীতে প্রবেশ করলুম দুজনে। আলাপ হ'ল জনতার সঙ্গে। জানলুম—নগরীটি সমৃদ্ধ, পূর্ণ; অর্থশালী অনেক রয়েছেন

সেখানে কিন্তু তাঁরা সকলেই বেজায় লোভী আর কৃপণ। আমি তখন বিরূপককে ভাল ক'রে দেখালুম অর্থের নশ্বরত্বের ছবি, বোঝালুম তার প্রকৃতিস্থান ;—এবং স্থির করলুম, আমাদের এখন অবলম্বন করতে হবে—কর্ণীসুতের পথ, অর্থাৎ চুরি।

ঘুরতে ঘুরতে জুটে গেলুম দ্যূতসভায়···অক্ষধূর্তদের সমাগমে। হ্যাঁ, দেখলুম বটে সেখানে পঁচিশ রকমের জুয়োখেলার কলাবিদ্যা। কী কৌশল! আর সেই অক্ষভূমি! ছকের উপর কী অদ্ভুত তাদের হাত-সাফাই! দান ফেলার ঠিক আগেই কত রকমের না গঞ্জনা-ভরা বাক্য, মান-অপমান, জীবনটা যেন কিছুই নয়—এমনিতর কত ভাব, কত রকমের কূটকর্মা চাল।

কিন্তু অক্ষভূমিতে সভিক-রা প্রবল। তাঁদের সু-ব্যবহারে তাঁদের উপর সকলের বিশ্বাস অটুট। তাঁরা খাটাতে জানেন যুক্তি, ন্যায়, বল এবং প্রগল্ভ প্রতাপ ; তাঁরা আদায় করতে জানেন স্বীকৃত অর্থ। যারা বলী, তাদের জন্যে তাঁদের মুখে নিত্য মিষ্টভাষা ; যারা দুর্বল, তারা মরছিল···ভর্ৎসনা আর গঞ্জনা খেতে খেতে।

জুয়াখেলায় পক্ষরচনার নৈপুণ্য, অনেক রকমের প্রলোভনের দর্শানী, এক-এক খেলায় এক-এক রকম পণ-ভেদের বর্ণনা, আবার পণ-বিভাগের সময় সভিকদের ঔদার্য ;—দেখতে দেখতে তৃপ্তিই পেতে লাগলুম। আর সেই আমাদের মধ্য দিয়েই ছুটেছে গ্রাম্য অশ্লীল ভাষার···ফোয়ারা।

ছকের উপর একজন খেলুড়ে একটি ভুল দান ফেলেছিল। আমি কিঞ্চিৎ হেসে ফেলেছিলুম। হাসি দেখে প্রতিদ্বন্দ্বী জুয়াড়ি জ্বলে উঠল, রাগে তামার মতো চোখ ক'রে আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে বললে, "হাসির ছল কেটে···আমাকে শেখানো হচ্ছে···পাশা কি ক'রে দানতে হয়? আয় বেটা ছোকরা, অশিক্ষিত কোথাকার, আয়। ভারি বিচক্ষণ হয়েছিস! খেল্ না দেখি একটা দান।"

দ্যূতাধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে খেলা শুরু হ'ল। ফলে হ'ল—

আমার জিত, একেবারে ষোল হাজার দীনার। সভিক এবং সভ্যদের মধ্যে আট হাজার ভাগ ক'রে দিলুম। নিজে রাখলুম আট হাজার। উঠে পড়লুম।

পথ দিয়ে চলেছি, সকলের মুখে প্রশংসা, বাণী বেরুচ্ছে উল্লাসের। সভিকের অনুরোধ ঠেলতে পারলুম না। তাঁর গৃহে স্বীকার করতেই হ'ল আতিথ্য। উদার উপচারে উদর-পূর্তি করলুম। পাশা-খেলায় যিনি আমাকে নামিয়েছিলেন তাঁর নাম 'বিমর্দক'। তিনি আমার বন্ধু হয়ে গেলেন, হয়ে উঠলেন বিশ্বাসের পাত্র, একেবারে দ্বিতীয় হৃদয়।

সেই বিমর্দকের মুখ থেকে আমি···যাকে বলে···অবধারণ করি, নগর-সম্বন্ধে যা কিছু ছিল জ্ঞাতব্য,—সারতঃ, কর্মতঃ এবং শীলতঃ। তার পর যখন রাত্রিদেবী নামলেন—ধূর্জটির কণ্ঠের মতো কৃষ্ণনীল রাত্রি,—তখন নীল রঙের একটি উত্তরীয়ে জড়িয়ে নিলুম নিজের অঙ্গ, কোমরে বাঁধলুম খাপে-ভরা তলোয়ার; আর সঙ্গে নিলুম ফণিমুখ, কাতুরী, সাঁড়াশী, একটি কাঠের মাথা, যোগবতি, ওলনদড়ি, কর্কটক (রেঞ্চ), দড়ি, বাতিদান, তূরপুন, আর বাতি-নেভাবার ঠুঞ্জি ইত্যাদি ক'রে হরেক উপকরণ। বেরিয়ে পড়লুম।

জনৈক ডাকসাইটে ধনী কৃপণের বাড়িতে সিঁধ কেটে, জানলার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে দেখলুম তাঁর অন্দর-মহলের হালচাল। তার পরে নিজের বাড়িতে ঢুকতে গেলে যেমন নিশ্চিন্ত আরামে প্রবেশ করা যায়, তেমনি হ'ল সেই কৃপণের বাড়িতে আমার ব্যথাহীন প্রবেশ; এবং সার-পদার্থ কোমরে বেঁধে সুষ্ঠু প্রস্থান।

রাজবীথি দিয়ে দ্রুতপদে চলেছি, পুঞ্জ পুঞ্জ নীল মেঘের মতো নিবিড়-ঘন অন্ধকার, এমন সময় হঠাৎ সন্নিকটেই একটা আলোর ঝলকানি দেখে থেমে গেলুম। ওঃ মা, এ যে মেঘের বুকে বিদ্যুতের হাসি! অবাক কাণ্ড, এত রাত্রে যুবতী! অঙ্গের অলঙ্কার আঁধারেও

যেন আলো কাটছে ! নিঃশঙ্কে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! নগরের চৌর্য-রোষিতা ইনি কি তা হ'লে···নগরদেবী ?

থাকতে পারলুম না, ব'লে উঠলুম, "কে আপনি, কোথায় চলেছেন ?

সদয় উক্তি সত্ত্বেও যুবতী কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন, মুখ দিয়ে বেরতে লাগল, থরথরে কথা—

"আর্য, এই নগরীতে, 'কুবেরদত্ত' রয়েছেন। তিনি বৈশ্যশ্রেষ্ঠ। তাঁর আমি মেয়ে। আমি জন্মাবার পরেই আমার পিতা বাক্যদান করেছিলেন—এই নগরীরই এক ধনিকের সন্তান 'ধনমিত্রে'র আমি ভার্যা হব। তার পরে ধনমিত্রের বাপ-মা মারা যান। তাঁর হৃদয় বড় উদার ; সংসারে দরিদ্র হয়ে যে কেউ বেঁচে থাকবে, এ তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাই অর্থ দান ক'রে দরিদ্রদের দুঃখ দূর করতে করতে এখন তিনি নিজেই যেন প্রার্থীদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন দারিদ্র্য ; লোকে তাঁকে 'উদারক' ব'লে ডাকে,—আনন্দে। কিন্তু আমার পিতা দেখলেন—আমি তরুণী, একজন নির্ধনের হাতে গিয়ে পড়ব—না, তা হবে না, তাই অতিধনী বণিক 'অর্থপতি'র হাতে আমাকে সমর্পণ করবেন স্থির ক'রে ফেললেন। অর্থেরই তিনি পতি, আর কিছুর নন। সেই অমঙ্গল ঘটনাটি কাল প্রভাতে ঘটবে। দুঃখের প্রভাত হবার আগেই আমি তাঁর গৃহে চলেছি,···চলেছি প্রিয়তমের গৃহে···তিনি আমাকে সংকেত দিয়েছেন। বঞ্চনা করেছি স্বজনদের। ছোটবেলায় এই রাজবীথি দিয়ে কত হেঁটেছি, আর আজ চলেছি অভিসারে ! দেব মন্মথ আমাকে পথ দেখাচ্ছেন। তাই বলছি আমাকে ছেড়ে দিন, আমার রত্ন, ধন, সব নিয়ে নিন, শুধু আমাকে যেতে দিন।"

এই ব'লে রত্নপাত্রটি আমার হাতে সমর্পণ ক'রে দিলেন যুবতী। আমার চিত্ত দ্রব হয়ে গেল। আমি বললুম, "সাধ্বি, তা হ'লে আসুন। আমিই আপনাকে পৌছিয়ে দেব আপনার প্রিয়তমের কাছে।" আশ্বস্ত ক'রে তরুণীটিকে সঙ্গে নিয়ে মাত্র দু'চার পা এগিয়েছি, এমন সময়

দেখি, হঠাৎ সেইদিকে আসছে একদল নগরপ্রহরী। দীপিকার আলোতে লোপ পেয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। তাদের হাতে যষ্টি, কৃপাণ। তরুণীটি তখন কাঁপছেন। আমি তাঁকে বললুম, "অত ভয় পাবেন না। আমার হাতেও রয়েছে তলোয়ার। কঠোর পথে না গিয়ে মৃদু পথে যাওয়াই এ সব ক্ষেত্রে মঙ্গল। দেখুন, এই আমি পথে শুয়ে পড়ছি, যেন সাপে কামড়েছে এমনিতর ভান ক'রে। আপনি এদের বলবেন, 'আজ রাত্রে আমরা এই নগরীতে এসেছি, আমার নায়ককে জাতসাপে কামড়েছে…ঐ সভাগৃহের কোণে। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ মন্ত্রতন্ত্র জানেন, তা হ'লে দয়া ক'রে এঁর প্রাণদান করুন, আমি অনাথা।'

মুহূর্তেই তরুণীটি বুঝে নিলেন ··গত্যন্তর নেই। অভিনয় ক'রে তৎক্ষণাৎ চোখ দুটিকে ভরিয়ে ফেললেন জলে, কণ্ঠস্বরে আনলেন গদ্‌-গদ কম্পন। সারা অঙ্গে সে কী থরথরানি তাঁর! এক পা দু'পা ক'রে এগিয়ে গিয়ে—যেমন বলেছিলুম তেমনিটি তাদের কাছে খুলে বললেন …সব। আমিও তেমনিই শুয়ে রইলুম পথের ধারে—সাপের বিষে যেন সর্ব ক্রিয়া বন্ধ। প্রহরীদের মধ্যে জনৈক নরেন্দ্রাভিমানী—আমার কাছে এগিয়ে এলেন। মুদ্রা, তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান ইত্যাদির অনেক প্রকরণ করলেন। শেষে অকৃতার্থ হয়ে বললেন, "নাঃ, বেটাকে কালসাপে দংশেছে। দেখছ না হে, নীল হয়ে গেছে ধড়, চোখ খোলে না, গায়ের গরম ঠাণ্ডা মেরে গেছে। শোক ক'রে আর কি করবেন? কাল সকালে সংকারের ব্যবস্থা করা যাবে। দৈবকে কি কেউ লঙ্ঘাতে পারে হে!"

এই ব'লে প্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি চ'লে গেলেন।

পথশয্যা ছেড়ে তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে উদারকের গৃহে এসে উপস্থিত হলুম। বললুম, "মহোদয়, আমাকে জনৈক তস্কর ব'লেই জানবেন। এই তরুণীটি অভিসারে চলেছিলেন—ওঁর একমাত্র সহায় ছিল আপনার-প্রতি-ধাওয়া ওঁর মন। ব্যাপার শুনে মনে একটু দয়া হ'ল, তাই আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলুম। এই নিন ওঁর রত্নভূষণ।"

এই ব'লে সেই ঝক্‌মকে আঁধার-তাড়ানো অলঙ্কারগুলি উদারকের হাতে সমর্পণ ক'রে দিলুম। উদারক সেগুলিকে গ্রহণ করলেন। তাঁর মুখে এবং চোখে খেলে যেতে লাগল লজ্জা, হর্ষ এবং সম্ভ্রম। আমাকে বললেন—

"আর্য, আজ রাত্রে যেমন···আমার প্রেয়সীটিকে আপনি দান ক'রে গেলেন আমার হাতে, তেমনি আবার চুরি ক'রে নিয়ে চললেন আমার মুখের ভাষা। এ ক্ষেত্রে কী যে আপনাকে বলব আমি জানি না, কারণ আপনি যা করেছেন তা সত্যিই অদ্ভুত!

যদি বলি,—যা করেছেন তা আপনার শীলতা বা ব্যাবসার বিরুদ্ধ, অন্য কেউ পূর্বে কখনও এমনটি করে নি, তা হ'লে কেবল পালন করা হবে বস্তুশক্তির প্রতিনিয়ম।

যদি বলি,—লোভ ইত্যাদি দোষ আপনার মধ্যে নেই; আজ আপনার মধ্যে উন্মীলিত দেখতে পাচ্ছি সাধুতা,···তা হ'লে কি জন্মান্তরীণ সাধুতা এবং পুণ্যকর্মগুলিকে অবহেলা করা হয় না? দেখলুম বটে ঔদার্যের স্বরূপ!—আপনার হৃদয়ের অনুমোদন না নিয়ে সে কথা বলাও আমার পক্ষে সাজে না, হয়তো আপনার ভাল লাগবে না।

যদি বলি,—আপনার এই সুকীর্তিটি খরিদ করেছে দাসকে—সে বলা সত্যিই অসার অনর্থক। আর আপনার প্রজ্ঞাকে অপমান করা হয়, যদি বলি ডাঁট দেখিয়ে খুব আমাকে কিনে নিয়েছেন।

যদি বলি,—প্রিয়দানের প্রতিদানে এই রয়েছে আমার শরীর, এটি নিন;—তা হ'লে বলতে হয়—প্রিয়াকে যদি না পেতুম তা হ'লে আপনার হাত থেকেই লাভ করতুম আমার মরা দেহ। তাই বলছি, এখন আমার এই বলাই ভাল—'চিরদাস ব'লে আমাকে স্বীকার ক'রে নিন,—আমাকে পোষণ করুন।'"

উদারক লুটিয়ে পড়লেন আমার পায়ে।

মাটি থেকে উদারককে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলুম বুকে। বললুম, "তা হ'লে এখন কি করবেন স্থির করেছেন ?"

তিনি বললেন, "পিতৃদেবের অনুমতি না নিয়ে প্রিয়াকে বিবাহ ক'রে, চম্পানগরীতে বাস করা বা জীবন ধারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই ভাবছি, আজই রাত্রে আমরা দুজনে এই দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। আর আমিই বা কি স্থির করব,—আপনি যা বলবেন তাই হবে।"

আমি তখন বললুম --"বেশ ভাল কথা। স্বদেশ ছেড়ে দেশান্তরী হব, এ রকম সিদ্ধান্ত···বিদগ্ধ পুরুষের সাজে না। তার উপর আপনার প্রেয়সী অতি সুকুমারী, কষ্ট পাবেন, কান্তার-পথ সঙ্কট-ময়। দেশ-ত্যাগের চিন্তা অনর্থক, - তাতে জ্ঞানের শৈথিল্য প্রকাশ পায়। এই চম্পানগরীতেই আপনাকে সুখে বাস করতে হবে প্রেয়সীর সঙ্গে। আসুন, এখন আমরা দুজনে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে···ওঁর বাড়ি যাই।"

উদারক কোনো কথা বললেন না। রমণীটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলুম তাঁর ঘরে। তার পরে তাঁকেই চর বানিয়ে, হাঁড়ির খবর জেনে নিয়ে, আমরা দুজনে কুবেরদত্তের সর্বস্ব চুরি করলুম। চুরির সাক্ষ্য-স্বরূপ মাটির ভাঁড়গুলোই কেবল প'ড়ে রইল তাঁর ঘরে।

কুবেরদত্তের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যথাস্থানে চোরাই মাল রেখে, সবেমাত্র পথ ধরেছি এমন সময় দেখি···অন্য আর একদল নগররক্ষী আসছে। পথের ধারেই ছিল একটি মস্তি-ওয়ালা হস্তী। মাহুত বেটাকে নীচে ঠেলে ফেলে দিয়ে হাতীর পিঠে আমরা দুজনে চ'ড়ে বসলুম। গলার রশির মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিয়ে হাতীটাকে জোর ক'রে ওঠাতেই, পাগলা হাতী···মাহুতের চওড়া বুকের উপর পা চড়িয়ে, দাঁত দিয়ে তার পেট চিরে অন্ত্রবল্লী বার ক'রেই সামনে দেখতে পেল রক্ষীদের দল। হাতীর রুদ্ররূপ দেখে রক্ষীদল অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে। আমরা দুজনে তখন মত্তহস্তীর পিঠে চেপেই ধ্বংস ক'রে

দিলুম 'অর্থপতি'র গৃহ। তার পরে একটি জীর্ণোদ্যানে বৃক্ষশাখা অবলম্বন ক'রে হাতীর পিঠ থেকে নেমে পড়ি। রাত্রেই বাড়ি ফিরে আসি এবং স্নান ক'রে দুজনেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যাই।

রাত্রির পরে প্রভাত এল। সে এক বিপুল সকাল! আমার মন তখনও ভ'রে রয়েছে খুশীতে। তাই বোধ হয় দেখলুম,—সূর্যদেব উঠছেন, কল্পদ্রুমের স্বর্ণপর্ণের মতো তপ্তরক্ত তাঁর গায়ের রঙ, আর উদয়াচলের শৃঙ্গটি যেন পদ্মরাগমণি দিয়ে গড়া। খুশী মনে জেগে উঠলুম। মুখ-হাত ধুয়ে সমাধা করলুম প্রাতঃকালোচিত মঙ্গলবিধি। হঠাৎ প্রাণ উপচিয়ে হাসি এল। গতকাল রাত্রে কি-ই-বা-না না করা গেছে! নিশ্চয়ই, চম্পানগরী এতক্ষণে আলোড়িত হয়ে উঠেছে আমাদের তুমুল তাস্করিক চাপল্যে। বেরিয়ে পড়লুম দুজনে। শুনতে পেলুম···বরের গৃহে বধূর গৃহে ভীষণ হাহাকার কোলাহল!! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংসারের নিয়ম-মতো যা হয় তাই হ'ল; সমস্তই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অর্থদান ক'রে অর্থপতি কুবেরদত্তকে আশ্বস্ত করলেন এবং স্থির হ'ল এক মাস পরে 'কুলপালিকা'র বিবাহ হবে।

তার পরে একদিন ধনমিত্রকে ডেকে আমি শিক্ষা দিলুম—

' "সখে মুষড়ো না, লেগে পড়, ওঠ। ঐ যে একান্তে রয়েছে একটি চর্মরত্নের হাপর—ঐটিকে নিয়ে অঙ্গরাজের সভায় যাও। নিবেদন ক'রো—

' ' মহারাজ, বহুকোটিপতি বসুমিত্রের আমি একমাত্র পুত্র—ধনমিত্র। আজ আমার কিছু নেই, কাঠ বইছি,—লোকে আমায় অবজ্ঞা করে। কুবের দত্তের কন্যা কুলপালিকার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে—এই বাক্যের আদান-প্রদান হয়ে গিয়েছিল শিশুকাল থেকেই; কিন্তু এখন আমি দরিদ্র ব'লে কুবেরদত্ত নিজের দুহিতাকে সমর্পণ করতে চলেছেন শ্রেষ্ঠী অর্থপতির হাতে। তাই আমি গৃহত্যাগ

ক'রে···ত্বঃখে···জীবনের অসারতা উপলব্ধি ক'রে চ'লে যাই নগরপ্রান্তের এক পোড়ো বাগানে। আকাঙ্ক্ষা ছিল জীবন বিসর্জন দেব। গলায় ছুরি লাগিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছি এমন সময় অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন এক জটাধর পুরুষ। আমাকে নিবারণ ক'রে বললেন—'তোমার এই সাহসের মূল কোথায়?' আমি বললুম, 'দারিদ্র্য···অবজ্ঞার সহোদর ভাই।' দয়ার্দ্রচিত্তে এবং আমাকে অনুগ্রহ ক'রেই তিনি তখন বললেন, 'বৎস, তুমি অত্যন্ত মূঢ়। আত্মহত্যার চেয়ে পাপ আর কিছু নেই। আত্মা দিয়ে আত্মাকে বিনাশ না ক'রেই যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা মুক্তি পান। ধনার্জনের অনেক উপায় রয়েছে; কিন্তু ছিন্ন কণ্ঠটিকে জোড়া লাগিয়ে প্রাণ ফিরে পাওয়ার···সত্যই কোন উপায়ই নেই। ছিঃ ছিঃ, এমন কাজ কি কেউ করে? দেখ আমি মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। চর্ম-রত্নের এই ছোট্ট হাপরটি আমার নিজের হাতের তৈরি,—এটি লক্ষ-গ্রাহিণী। কামরূপে যখন আমি ছিলুম—কামপ্রদ এরই প্রসাদে আমি অভীষ্ট বর্ষণ ক'রে প্রজাপালন করেছি। কিন্তু এখন আমার দেহটিকে অধিকার করেছে কূট-জরা,—তার সমস্ত মাৎসর্য নিয়ে। শুনলুম এই দেশটি বড় মনোরম, ভূস্বর্গ; তাই চ'লে এসেছি এখানে। এখন তুমিই এটিকে নিয়ে যাও, আমার আর প্রয়োজন নেই ওতে। আমি ছাড়া ঐ হাপরটিকে একমাত্র দোহন করতে পারবে···হয় শ্রেষ্ঠী, নয় গণিকা; অপর কেউ নয়। এইটিই এর খ্যাতি। কিন্তু শ্রেষ্ঠী বা গণিকার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, অন্যায় ক'রে যদি কারো অর্থ নিয়ে থাকে সেটি প্রথমেই প্রত্যর্পণ করা; এবং ন্যায়ার্জিত নিজের যা অর্থ আছে, দেব-ব্রাহ্মণে তা বিতরণ ক'রে দেওয়া। এই রকম ব্যবহার করলে দেখতে পাবে এই দিব্য হাপরটি এই পুণ্যদেশে—প্রতিদিন প্রভাতে পূজার্চনা লাভ ক'রে সুবর্ণপূর্ণা হয়ে উঠছে। এই হচ্ছে এর কল্পনা।'—মহারাজ, বিস্ময়ে আমার অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল,—প্রণামে। সেই জটাধর পুরুষ এই ছোট্ট হাপরটিকে আমায় দান

ক'রেই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন প্রস্তর-বেদির মধ্যেকার এক ছিদ্র-পথ দিয়ে। মহারাজ, এই সেই দিব্য চর্ম্মরত্নভস্ত্রিকা। মহারাজকে এ বৃত্তান্ত না-জানিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব · তাই এটিকে এনেছি। এখন মহারাজের যা আদেশ।'

দেখো ধনমিত্র, রাজা তখন নিশ্চয়ই বলবেন, 'ভদ্র, আমি প্রীত হয়েছি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও, যথেচ্ছ উপভোগ কর।'

তখন ধনমিত্র, তুমি বলবে—'মহারাজ, আর একটু অনুগ্রহ চাই, এটিকে কেউ চুরি করতে না পারে তারই ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

দেখো, মহারাজ নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। তার পরে নিজের ঘরে ফিরে এসে যথোক্ত অর্থত্যাগ ক'রে প্রতিদিন এই চর্মরত্নের পূজার্চনা তোমাকে করতে হবে। এবং রাত্রে চৌর্যলব্ধ ধনে এটিকে পূর্ণ ক'রে প্রভাতে সকলকে দেখাতে হবে। তখন দেখ কি হয়! কুবেরদত্ত বদলে যাবেন। অর্থলোভী তিনি। অর্থপতিকে তৃণের মতো জ্ঞান করবেন। স্বয়ং তোমার সামনে তাঁর কন্যাকে এনে হাজির করবেন। ওদিকে অর্থপতি ক্রোধান্ধ হয়ে দম্ভ দেখাবেন অর্থের। তখন আমাদের কর্তব্য চিত্র-উপায়ে অর্থপতিকে কৌপীন-শেষ করা। কোন ভয় নেই। এর সঙ্গে হবে কি জানো? নিজেদের এই চৌর্যবৃত্তি সুপ্রচ্ছন্ন থেকে যাবে।"

পুলকিত হয়ে উঠল ধনমিত্র। যেমনটি বলেছিলুম—ধনমিত্র তাই করল। এবং সেই দিন থেকেই আমার নিয়োগমতে বিমর্দকও শ্রেষ্ঠী অর্থপতির সেবায় ব্রতী হ'য়ে গেল এবং তাঁর ও ধনমিত্রের মধ্যে বাড়িয়ে দিতে আরম্ভ করল বৈরভাব। অর্থলোভী কুবেরদত্ত অর্থপতিকে বর্জন ক'রে ধনমিত্রকেই সানুনয় কন্যা-সম্প্রদান করতে চাইলেন। প্রতিবন্ধ হলেন অর্থপতি।

দিন যায়। এদিকে একদিন নগরে রটনা হ'ল···কামমঞ্জরীর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী রাগমঞ্জরী 'পঞ্চবীরগোষ্ঠে' একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান

করবেন! গভীর সমাদর নিয়ে নগরের রসিকেরা সেখানে উপস্থিত হতে লাগলেন। আমিও ধনমিত্রের সঙ্গে গোষ্ঠে পৌঁছে গেলুম। আরম্ভ হয়ে গেল রাগমঞ্জরীর নৃত্য।

কিন্তু কী আশ্চর্য! এ কি! আমার মনখানিই যে নৃত্যের দ্বিতীয় রঙ্গপীঠ হয়ে উঠছে! নৃত্যপরা রাগমঞ্জরীর নয়ন-কটাক্ষ যেন সেই মানস-রঙ্গপীঠের হয়ে দাঁড়াল নীলপদ্ম-আঁকা চন্দ্রাতপ, আর তার নীচে সুবিপুল তেজে সমুদিত হলেন—পঞ্চশর, ভাবরসের পূর্ণতা নিয়ে। টনটন ক'রে উঠল হৃদয়ের সন্ধি। মনে হ'ল রাগমঞ্জরী যেন নগরদেবী,—নগর-তস্করদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন, আর আমাকে যেন বেঁধে ফেলছেন নীলপদ্মের পাপড়ির মতো শ্যামল তাঁর লীলাকটাক্ষের শৃঙ্খল দিয়ে। নাচ যখন শেষ হয় হয়, তখন রাগমঞ্জরীকে দেখতে হ'ল ভারি সুন্দর, সিদ্ধিলাভশোভিনী। হায় হায়, আমারি দিকে কেন বারংবার ছুটে আসছে তার সখী-অজানা কটাক্ষ?—আহা, সে কি বিলাসে, না অভিলাষে, না সে অকস্মাৎ! বিভ্রমের সঙ্গে সঙ্গে একটি ভ্রূলতিকার সে কী মোহন নর্তন! কী ছল! কুন্দ-দাঁতে চন্দ্রিকা-ছড়ানো সে কী মধুর মধুর হাসি! তার পরে রাগমঞ্জরী ধীরে ধীরে পঞ্চবীরগোষ্ঠ থেকে চ'লে গেল।—পিছনে পিছনে সঙ্গে ধেয়ে গেল রসিক সুজনদের নয়ন · এবং আমার মন।

দুর্নিবার উৎকণ্ঠা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। দূর হয়ে গিয়েছিল আহারের স্পৃহা। মাথায় শূল বিঁধছে এই ভান ক'রে গা হাত পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম সঙ্গিনীহীন পালঙ্কে। কিন্তু ধনমিত্র আমাকে ধ'রে ফেললে। সে একেবারে মদনতন্ত্রে অতিনিষ্ণাত কি না, তাই। আমার পাশে ব'সে গোপনে বললে—

"সখা, তোমার মন যাঁর উপর এমন-ধারা চলেছে সেই গণিকা-কন্যা আজ সত্যিই ধন্যা। আমিও ভাল ক'রে দেখেছি তাঁর হাবভাব ছলাকলা। এই ব'লে রাখলুম তোমাকে—শ্রীমান্ পঞ্চশর ওঁকেও

অচিরাৎ শুইয়ে ছাড়বেন শরশয্যায়। যেখানে দু'পক্ষের একই দশা, সেখানে মিলন ঘটানো···কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু শুনেছি, গণিকা-কন্যা নাকি স্বধর্মের উল্টো পথে চলেন এবং উদার ভদ্রতায় ব'লে বেড়ান—

'আমি গুণশুল্কা, ধনশুল্কা নই। বিবাহ না করলে তুলতে দেব না যৌবনপুষ্প।'

কঠিন পণ। তাকে মানা ক'রে ক'রে হার মেনে গেছে···দিদি কামমঞ্জরী আর তার মা 'মাধবসেনা'। শেষ পর্যন্ত চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজার কাছে নাকি তারা দৌড়োয়। নিবেদন করে—

'দেব, বড় আশা করেছিলুম, আপনার দাসী রাগমঞ্জরী তার রূপানুরূপ শীল এবং শিল্পকৌশল নিয়ে একদিন আমাদের সকলের মনোরথ পূর্ণ করবে, কিন্তু সে আজ মূলচ্ছিন্না হয়ে নিজের কুলধর্মে জলাঞ্জলি দিতে চায়,—অর্থ চায় না,—ব'লে বেড়ায় 'গুণীর কাছে নিজের যৌবন বিক্রি ক'রে দেব,···কুলস্ত্রীদের মতো সতী হয়ে থাকব'। এখন দেবপাদের আজ্ঞায় রাগমঞ্জরী যদি প্রকৃতিস্থা হয় তা হ'লেই মঙ্গল।'

তাদের অনুরোধে আদেশ দিলেন বটে রাজা, কিন্তু রাগমঞ্জরীর বাক্য অনড়। তখন তাঁর দিদি এবং মা আবার দৌড়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে বলে—

'আমাদের বিনা অনুমতিতে যদি কোনো ভুজঙ্গনায়ক রাগমঞ্জরীকে প্রতারিত ক'রে নষ্ট করে, তা হ'লে—সেই নায়ককে যেন তস্করের মতো হত্যা করা হয়।'

সখা, এই তো এখন অবস্থা। ধনরত্ন না পেলে স্বজনেরা অনুমতি দেবে না। আবার ধনরত্ন নিয়ে উপস্থিত হ'লেও রাজী হবেন না রাগমঞ্জরী। এইখানেই তো এল ভাবনার কথা। এখন উপায়!"

সব শুনে আমি বললুম "বন্ধু,···এতে···এত ভাবনার কি রয়েছে? রাগমঞ্জরীকে ভোলাব গুণ দিয়ে, আর তার স্বজনদের ডোবাব অর্থ দিয়ে।"

এদিকে খবর পাওয়া গেল—কামমঞ্জরীর প্রধানা দূতী হচ্ছে 'ধর্মরক্ষিতা'। সে আবার শাক্যভিক্ষুকী। তাকে বশ করতে আমাদের একটুও বেগ পেতে হ'ল না। চীবর, পিণ্ডদান প্রভৃতির উপঢৌকনেই কাজ আদায় হয়ে গেল। তার মুখেই বন্ধকী মাধবসেনার সঙ্গে পণ-প্রবন্ধ করলুম, "ধনমিত্রের গৃহ থেকে চুরি ক'রে তোমাকে দেওয়া হবে চর্মরত্নভস্ত্রিকা—যদি প্রতিদিনে পাই রাগমঞ্জরী।"

যখন মাধবসেনা সম্পূর্ণ রাজী হয়ে গেল তখন—কামমঞ্জরীর গৃহে পোঁছে দিয়ে এলুম ছোট্ট হাপরটিকে ; বলাই বাহুল্য, আমার গুণে উন্মাদিতা হ'ল রাগমঞ্জরী, এবং আমার বাম হাতের মধ্যে সুখী হয়ে উঠল তার দক্ষিণ হাত।

যে রাত্রে চর্মরত্ন চুরি যাবার কথা তার গোড়াতেই কিন্তু আমি একটি ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছিলুম। সেটি হচ্ছে এই।—

কার্যান্তরের অছিলায় নগরমুখ্যদের আমি আহ্বান করেছিলুম। তাঁদের সামনেই আমার গুপ্তচর বিমর্দক, কপট তর্জন-গর্জন ক'রে, মাত্রা ছাড়িয়ে অপমান করতে লাগল ধনমিত্রকে। উপস্থিত সকলেই জানতেন বিমর্দক অর্থপতির বন্ধু। কপট অভিনয় ক'রে ধনমিত্র তাকে বলে,—'মহোদয়, পরের হয়ে আমার উপর আক্রোশ ফলাচ্ছেন কেন ? আমার তো মনেই পড়ে না আপনার আমি কোনদিন···কোনো অপকার করেছি।'·· কিন্তু বিমর্দক থামে না, গলা ফাটিয়ে বলতে থাকে 'সোনার গরমে পা পড়ছে না ; তাই শুল্ক-দিয়ে-কেনা অন্যের ভার্যাকে নিজের সম্পত্তি করতে দ্বিধা হচ্ছে না, তাও আবার মেয়ের বাপ-মাকে ভেট দিয়ে ভুলিয়ে! আবার বলছেন কিনা···কী অপরাধ করেছি ? জেনে রাখবেন মহাশয়, বন্ধু হওয়া এমনি যায় না। আমি বিমর্দক, সার্থবাহ অর্থপতির বহিশ্চর প্রাণ। তাঁর জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, এমন কি ব্রহ্মহত্যাও করতে পারি। চর্মরত্নের অহঙ্কার গায়ে একেবারে দাহজ্বরের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, না ? জেনে

রাখবেন এক রাত্তির জেগেই এর প্রতীকার আমি করতে পারি।' যখন বিমর্দক এই হেন সব কথা বলতে লাগল তখন পৌরমুখ্যেরা রেগে উঠে তাকে দূর ক'রে দিয়েছিলেন।

চর্মরত্নের অন্তর্ধানের পরেই কৃত্রিম আর্তি প্রকাশ ক'রে ধনমিত্র এই ঘটনাটি মহারাজের কর্ণে নিবেদন ক'রে দিল। মহারাজ আহ্বান করলেন অর্থপতিকে। একান্তে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "ওহে, বিমর্দক ব'লে তোমার কি কেউ আছে ?"

অর্থপতিও এমন মূঢ়, তিনি ব'লে ফেললেন, 'দেব, বিমর্দক আমার পরম মিত্র ; তাকে কি আপনার কোনও প্রয়োজন আছে ?' মহারাজ বললেন, 'তাকে ডেকে আনতে পার ?' 'নিশ্চয়, নিশ্চয় পারি।' এই ব'লে অর্থপতি চ'লে আসেন।

তার পরে বিমর্দকের জন্যে সে কী অনুসন্ধান !—নিজের বাড়িতে নেই, গণিকার পল্লীপথে নেই, দ্যূতসভায় নেই, এমন কি শুঁড়ির দোকানেও সে নেই। তন্ন-তন্ন ক'রে খোঁজ চলল। কিন্তু তাকে তখন খুঁজে বার করবে কে ? আমিই তাকে রাজকুমার, অভিজ্ঞান-চিহ্ন দিয়ে আপনারি খোঁজে সেই দিন সকালবেলায় পাঠিয়ে দিয়েছি উজ্জয়িনীতে। তাকে না পেয়ে বেচারী অর্থপতি যখন দেখলেন, বিমর্দকের অপরাধ তাঁরি গায়ে এসে লাগছে তখন বেচারী ভয় পেয়ে গেলেন ; মস্তিষ্ক-বিভ্রম হ'ল। তিনি বললেন, 'চর্মরত্নভস্ত্রিকার কিছুই তিনি জানেন না, কিন্তু ধনমিত্র মহারাজের সামনে পৌরমুখ্যদের নিয়ে গিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে এল। কুপিত হয়ে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন— 'শৃঙ্খল পরাও অর্থপতিকে।'

এর কিছু দিন পরে কামমঞ্জরী স্থির করল চর্মরত্নটিকে দোহন করতে হবে—জটাধর পুরুষের বিধান-মতো। সেই উদ্দেশ্যে একদা সে ক্ষপণক বিরূপকের কাছে উপস্থিত হয়ে নিভৃতে ফিরিয়ে দিয়ে

এল তার সমস্ত সম্পত্তি—যা কিছু সে নিয়েছিল, অপহরণ করেছিল, সব। অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে যখন কামমঞ্জরী ফিরে এল তখন বিরূপক জৈন-গ্রহ থেকে নিজেকে মুক্ত করিয়ে আমার কাছে দৌড়ে এলেন। কী তাঁর আনন্দ! কুলধর্মের অনুবর্তী হয়ে যেন তিনি ফিরে পেলেন প্রাণ।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই কামমঞ্জরী নিজেরও—সর্বস্ব দান ক'রে বসল। রইল মাত্র—রন্ধন-চুল্লী। তার হৃদয়ে তখন একমাত্র কামনা—কেমন ক'রে সে দোহন করবে চর্মরত্নটিকে—কেমন ক'রে হবে অভ্যুদয়!

এদিকে আমি ধনমিত্রকে পুনর্বার পাঠিয়ে দিলুম মহারাজের সভায়। গোপনে সে মহারাজকে নিবেদন করল,

"দেব, ঐ যে একটি গণিকা রয়েছে—কামমঞ্জরী যার নাম—লোকে যাকে গঞ্জনা দিয়ে ডাকে 'লোভমঞ্জরী'—আজ দেখলুম, সে নির্বিচারে তার সর্বস্ব দান করছে—এমন কি শিল নোড়া উদূখল পর্যন্ত। আমার কেমন মহারাজ, সন্দেহ হচ্ছে চামড়ার হাপরটি ওর কাছেই আছে। ঐ জন্যেই বোধ হয় এত ওর দান। জটাধর বলেছিলেন—শ্রেষ্ঠী বা গণিকাই ঐ চর্মরত্নভস্ত্রিকাটিকে দোহন করতে পারবে, অন্যের সাধ্য নয়। তাই আমার এই শঙ্কা।"

তাকে এবং তার মাকে তখনই আহ্বান করলেন মহারাজ।

ব্যথিত-বর্ণ···আমি তখন কামমঞ্জরীকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললুম, "আর্যে, তোমার সর্বস্ব-দান প্রকাশ পেয়ে গেছে; অঙ্গরাজ আশঙ্কা করছেন তোমার কাছেই চর্মরত্নটি আছে;—প্রশ্নের জন্য তোমার ডাক পড়েছে। বারংবার প্রশ্নের আঘাতে নিশ্চয় তোমাকে বলতে হবে কোথা থেকে হাপরটিকে তুমি পেলে। আমাকেও তখন সব স্বীকার করতে হবে। তারপর চক্ষে দেখতে পাচ্ছি···আমার ভাবী চিত্রবধ। যদি মরি, তা হ'লে তোমার ভগিনীটিও মরবেন,

তোমাকেও নিঃস্ব হতে হবে এবং ঐ হাপরটিও ধনমিত্রের ঘরে ফিরে যাবে। চতুর্দিকে বিপদ, অনর্থ···বল—এখন কি করি !”

কামমঞ্জরী এবং তার মা কেঁদে ফেলল—বললে—

“আমাদের লোভ আর দুর্বুদ্ধির জন্যেই সমস্ত রহস্য আজ ফাঁস হতে চলেছে। দেখুন, রাজা যদি পীড়াপীড়ি করেন,—তা হ'লে একবার, দুবার, তিনবার, না হয় চারবার, কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রহস্য গোপন ক'রে রাখলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, আপনিই হাপরটিকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। আর আপনাকে যদি ধরিয়ে দিই তা হ'লে স্বজনকুটুম্ব নিয়ে আমাদের পথে দাঁড়াতে হবে।···তবে এক উপায় আছে। ঐ অর্থপতি। তার গায়ে রূঢ়ভাবে লেগেই রয়েছে অপযশ। অঙ্গপুরের সকলেই জানে, আমাদের এখানে ঐ চাষাটার, ঐ কদর্য লোভীটার খুব বেশী গতিবিধি রয়েছে। অর্থপতিই আমাদের হাপরটা দিয়েছেন,—এই বলা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় তো আমরা দেখছি না। ওতেই আমাদের বাঁচোয়া।”

আমাকে রাজী করিয়ে কামমঞ্জরী এবং মাধবসেনা তখন মহারাজের সভায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। মহারাজ তাদের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আনলেন তখন তারা উত্তর দিল, 'বারাঙ্গনাদের ন্যায়ধর্ম বলে—দাতার নাম-গ্রহণ নিষিদ্ধ। পুরুষেরা যেকেবল ন্যায়ার্জিত অর্থ নিয়েই বারাঙ্গনাদের মন্দিরে যাতায়াত করেন, এ হতে পারে না”। ··কিন্তু কুপিত হয়ে উঠলেন মহারাজ। বললেন,—'যদি সেই তস্করের নাম-ধাম স্বীকার না কর, তা হ'লে তোমাদের মতো দগ্ধ-বন্ধকীদের শাস্তি হচ্ছে কর্ণ-নাসিকা ছেদন, বা তার চেয়েও বীভৎস কোনো দণ্ড।'

কামমঞ্জরী ও মাধবসেনা বিভীষিকা দেখল ; তারপরেই স্বীকার খেল ; এবং বেচারী অর্থপতিকে তখনই শৃঙ্খলিত করা হ'ল তস্করত্বের অপরাধে। বিচারে অর্থপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল। কিন্তু ধনমিত্র করজোড়ে মিনতি ক'রে মহারাজকে জানাল—'আর্য, মৌর্যদত্ত একটি

বর রয়েছে—ঈদৃশ অপরাধে বণিকদের যেন প্রাণহানি করা না হয়। দয়া করুন, সর্বস্বহীন ক'রে ঐ পাপটাকে নির্বাসনে দিন, কিন্তু প্রাণে মারবেন না।'

আর যায় কোথা! চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল ধনমিত্রের কীর্তি, মহারাজও প্রীত হলেন। পৌরজনদের সমক্ষে নির্বাসিত হ'ল অর্থপতি —একবস্ত্রে···তাও আবার ছেঁড়া। চর্মরত্নের মৃগতৃষ্ণিকায় কামমঞ্জরী সর্বস্বান্ত হয়েছিল; এখন ধনমিত্রের প্রার্থনা মতো অর্থপতির তৈজস-পত্রের কিছু অংশ কামমঞ্জরীকে অনুকম্পাভরে দান ক'রে দিলেন মহারাজ।

তার পরে একটি শুভদিন দেখে কুলপালিকার সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল ধনমিত্রের। এইরকম ক'রে যখন সফল হ'ল আমার সংকল্প, তখন আমি নিশ্চিন্তে রাগমঞ্জরীর গৃহখানি পূর্ণ করতে লেগে গেলুম স্বর্ণে এবং রত্নে।

এর পরে আমি তস্করত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাই, চম্পানগরীতে। যাঁরা লুব্ধ এবং সমৃদ্ধ, তাঁদের মধ্যে কেউ-ই চৌর্য-মোক্ষ পেলেন না। হাতে খোলা নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে অনেককে পথে বেরুতে হ'ল, ভিক্ষা করতে যেতে হ'ল সেই সব ভিক্ষুকদের ঘরে···যারা আমার-প্রদত্ত তাঁদেরি ধনে বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজকুমার, অতি-নিপুণ হ'লেও একদিন না একদিন মানুষকে পেতেই হয় নিয়তি-লিখিত একখানি পত্র। আমার কপালেও তাই ঘটল। সেই পত্র একদা আমি পেলুম বিচিত্র উপায়ে।

সেদিন হয়েছে কি, রাগমঞ্জরীর প্রণয়কোপ কিছুতেই আর শান্ত হতে চায় না। শেষে শান্তি সংস্থাপনের জন্যে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তাকে মদিরা পান করালুম। মুখের মধ্যে সে এক একবার মদিরা গ্রহণ করে, আর ভালবেসে বেসে আমার মুখে ঢেলে দিতে থাকে·· গণ্ডূষ। একটু একটু ক'রে মদিরার স্বাদ নিতে নিতে আমারও নেশা

ধ'রে গেল। নিদারুণ নেশা! সবাই জানে, মাতালের স্বভাব,···উচিত কর্ম হ'লেও মাতালদের পথের থাকে না উদ্দেশ। তাই নেশায় বুঁদ হয়ে ব'লে বসলুম "আজ এই রাত্রেই···ইন্দ্রনীলমণির মতো এই রজনীতেই···আমি একলা,···সমস্ত নগরখানাকে নির্ধন ক'রে ফেলব। বুঝেছিস রাগমঞ্জরী, একলাই! তোর এই ঘরখানাকে ভরাব··· নগরখানার ধনে?"

অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠল প্রিয়তমা; প্রণামাঞ্জলি রচনা করল, সহস্র শপথ করল। কিন্তু উদ্দাম মাতালকে বোঝানো শক্ত। পাগলা হাতী যেমন এক ঝটকায় শিকল ছিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে যায় আলান থেকে, আমিও তেমনি পথে বেরিয়ে পড়লুম—মত্ত হস্তে মুক্ত অসি। দ্রুত চলতে লাগলুম, রাগমঞ্জরীর ধাত্রী 'শৃগালিকা' আমাকে অনুসরণ করল। কিছু পথ চলেছি, দেখি....নগররক্ষীরা পিছু নিয়েছে। তখন কিন্তু ভয়-ডর সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে আমার। এগিয়ে এসে তারা আমাকে ধ'রে ফেললে, চোর ব'লে আঘাত করতে লাগল, তখনও আমার তত ভয়ানক রাগ হয় নি। মনে হ'ল আমি যেন খেলছি, আর খেলতে খেলতে শুধু···দু-একটা মানুষ খুন ক'রে ফেলছে আমার নেশা-শিথিল তলোয়ার। তার পরেই হঠাৎ পথের উপর বিহ্বল হ'য়ে ঘুরে পড়ি। তামার মতো চোখে আগুনের ঘূর্ণি! আর্তধ্বনি তুলে শৃগালিকা ছুটে এল। শত্রুগুলো তখন আমাকে বেঁধে ফেলেছে।

আপদ ছুটিয়ে দেয় মদের নেশা। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এল; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা। ভাবলুম, "উঃ, নেশায় আমাকে কি বিপদেই না ফেলেছে! নগরময় সকলেই জানে ধনমিত্র আমার বন্ধু, রাগমঞ্জরী আমার ভার্যা। আমার এই পাপ তাদের স্পর্শাবে। কাল নিশ্চয়ই তারাও ভোগ করবে নিগ্রহ। এখন আমার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এমন একটা কিছু করা, যাতে ক'রে প্রথমেই রক্ষা পায় তারা। ওরা রক্ষা পেলে, আমাকে রক্ষা করার পথ ওরাই বার করবে।"

এই স্থির ক'রে শৃগালিকাকে চীৎকার দিয়ে বললুম, "দূর হ বুড়ী

কোথাকার। হুঁঃ, চর্মরত্ন পেয়ে মত্ত হয়ে উঠেছেন ধনমিত্র। সে বেটা ভণ্ড, আমার কপট মিত্র। আমার পরম শত্রু। অর্থের লোভ দেখিয়ে সে বেটা আমার রাগমঞ্জরীকে লুটেছে, ভোগদখল করছে। বেটী দগ্ধ-গণিকা···ম'রে গেছে, সে ম'রে গেছে···হাপরটাকে চুরি করেছি, তোর মেয়েটারও সারধন চুরি করেছি, এখন যায় যদি যায় যাক্ প্রাণ,··· দুঃখু নেই জীবনে।"

শৃগালিকা পরম ধূর্ত। আমার কথা ও কথা-বলার ভঙ্গি থেকে সে তখনি সব বুঝে নিল। কাঁদতে কাঁদতে, হাতজোড় করতে করতে, নগররক্ষীদের পায়ে পড়তে পড়তে, স্তবস্তুতি ক'রে ভিক্ষা চাইল, বললে, "ও ভালমানুষেরা, আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন; এঁর কাছে আমাকে দয়া ক'রে জেনে নিতে দিন উনি চুরি করে কোথায় রেখেছেন আমাদের রাগমঞ্জরীর গয়না।' অনুমতি পেয়ে আমার কাছে এসে প্রকাশ্যে বললে—

দাসীর প্রথম অপরাধ···ক্ষমা করুন। আপনার ভার্যাকে নিয়ে ধনমিত্র এই ইতর কাণ্ডটা ক'রে বসেছেন, সে কথা সত্যি। তিনি নিশ্চয় আপনার শত্রু। কিন্তু রাগমঞ্জরীর নিত্যসেবা স্মরণ ক'রে এবারের মতো ক্ষমা ক'রে দিন রাগমঞ্জরীকে। জানেন তো, রূপ বেচে যাঁরা বাঁচে, তাঁদের মজ্জাগত হয়ে যায় পোষাকপরিচ্ছদ অলঙ্কারের লোভ। তাঁর গহনাগুলো কোথায় রেখেছেন আমাকে দয়া ক'রে ব'লে দিন।' এই ব'লে শৃগালিকা আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

আমি তখন, যেন দয়া দেখিয়েই চীৎকার ক'রে বললুম, 'বেশ, আমি তো মরতে চলেছি, কী হবে আর এখন একটা হতভাগিনীর শত্রুতা ক'রে!' এই কথা ব'লে শৃগালিকার কানে কানে যথা-করণীয়টি শিক্ষা দিয়ে দিলুম। যেন সব বুঝতে পেরেছে, এই রকমের একটি ভাব দেখিয়ে শৃগালিকা ব'লে উঠল—'চীরঞ্জীব হোন্ আপনি, ভগবান আপনার ভাল করবেন। অঙ্গরাজ তিনি দেবতা, আপনার

পৌরুষে প্রীত হয়ে নিশ্চয় আপনাকে মুক্তি দেবেন। এই সব ভদ্রলোকেরাও দয়া করবেন।' বলতে বলতে রাত্রির অন্ধকারে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল শৃগালিকা। রক্ষি-নায়কের আদেশ অনুসারে আমাকে তখন রক্ষীরা হাজতে এনে বন্ধ ক'রে রাখল।

তার পরদিন। কারাধ্যক্ষ 'কান্তক' হাজতে এসে উপস্থিত। তাঁর পিতার মৃত্যুর পরেই মহারাজ তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই পদে। তারুণ্য-মদ যেন ঝ'রে পড়ছে তাঁর দৃপ্ততর অঙ্গ থেকে। দেখেই মনে হ'ল লোকটি অনতিপক্ক, নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবান মনে করেন এবং একটি সুন্দর পুরুষ ব'লে বৃথা গর্ব রাখেন মনে। এসেই আমাকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা ক'রে বললেন,—'ধনমিত্রের হাপরখানা যদি না ফিরিয়ে দিস, আর নাগরিকদের লুঠ-করা ধন যদি না ফিরিয়ে দিস, তা হ'লে বুঝেছিস, প্রথমেই আঠারো রকমের শাস্তি ভোগ করতে হবে তোকে ; অন্তে দেখবি মৃত্যু-মুখ।'

মৃদুমন্দ হাস্য ক'রে আমি বললুম, "সৌম্য, জন্মের প্রথম দিন থেকেই যা কিছু চুরি করেছি সব ফিরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ঐ মিত্রমুখো ধনমিত্র—সে আমার শত্রু, অর্থপতির সে পত্নী-চোর,—সে ফিরে পাবে না তার রত্ন-হাপরখানি। সম্পূর্ণ দুরাশা। তার জন্যে যদি আমাকে অযুত যাতনাও সইতে হয়, তাতেও রাজী আছি। এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"

এর পরে কয়েকটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল ; চলতে লাগল কান্তকের সান্ত্বন, তর্জন, গর্জন। প্রশ্নের বিরাম নেই, উত্তরেরও বিরাম নেই। কারাগার সুরা-সম্পর্কহীন। নিয়মিত দানাপানি। কিছুদিনের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম।

একদিন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, দিনান্তের রঙখানি হয়েছে ভগবান অচ্যুতের বসনখানির মত পীত, এমন সময় দেখি শৃগালিকা উপস্থিত হয়েছে কারাগারে। সাজ-সজ্জা উজ্জ্বল···মুখখানিতে হাসি-হাসি

ভাব। অনুচরেরা দূরে দাঁড়িয়ে গেল। কাছে এসে শৃগালিকা আমাকে বললে—

'"আর্য, আর ভয় নেই। সুনীতির ফল ধরেছে। আপনার আদেশ মত আমি ধনমিত্রকে গিয়ে বলি—

"বিপদের মধ্য থেকে বন্ধু আপনাকে ব'লে পাঠিয়েছেন ঃ

বেশ্যাসংসর্গ-সুলভ পান-দোষের অপরাধে আমি আজ বন্ধ হয়েছি। তুমি আজই রাজার নিকটে উপস্থিত হয়ে ব'লো,—'হে দেব, আপনার প্রসাদেই কিছুদিন পূর্বে অর্থপতির চুরি ধরা পড়েছিল এবং আমি আমার রত্ন-হাপরটি ফিরে পাই। ফিরে পাওয়ার পর, রাগমঞ্জরীর স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পাশাখেলায় তিনি ওস্তাদ,—কলাবিদ্যায়, কবিত্বে, লোকবার্তায় তিনি অতি বিচক্ষণ। সেই সূত্রে বস্ত্র-আভরণ ইত্যাদি প্রায়ই আমি পাঠাতুম তাঁর ভার্যার কাছে। কিন্তু তিনি আমাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। ছোট মন। ক্রুদ্ধ হয়ে আমার চর্ম-রত্নটি এবং রাগমঞ্জরীর অলঙ্কার-পেটিকাটি চুরি করেন। অধিক-চুরির আশায় পুনর্বার রাত্রে তিনি পথে পথে ঘুরছিলেন। নাগরিক পুরুষেরা তাঁকে বন্দী করে। সন্ধানে ফিরছিল রাগমঞ্জরীর পরিচারিকা। ধরা পড়তে দেখে পরিচারিকা তাঁর পায়ে কেঁদে পড়ে। পূর্বপ্রণয়ের অনুবর্তী হয়ে তিনি তখন আভরণ-পেটিকাটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ব'লে দিয়েছেন পরিচারিকাকে। এখন মহারাজের অনুগ্রহ ও ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করছে আমার রত্নহাপরটির উদ্ধার।'···ধনমিত্র দেখো, এই রকম নিবেদনের পর মহারাজ আমার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখবেন এবং মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে যাতে আমি নিজেই তোমাকে হাপরটি ফিরিয়ে দিই তার প্রচেষ্টা করবেন। সেই প্রচেষ্টাই হবে আমাদের পথ্য।"

এই কথা বলাতেই ধনমিত্র সব বুঝে ফেললেন। ভয় পাবার ছেলে তিনি মোটেই নন। যথাদিষ্ট করলেন। তার পরে আমি রাগমঞ্জরীকে আপনার নির্দেশ মতো সব বোঝাই এবং তাঁর কাছ

থেকে দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে ভেট পাঠিয়ে দি রাজনন্দিনী 'অম্বালিকা'র ধাত্রী 'মঙ্গলিকা'র কাছে; ঘটিয়ে নিই প্রীতিপরিচয়। মঙ্গলিকা গ'লে যায়, এবং তাকে ধ'রেই আমি রাগমঞ্জরী ও অম্বালিকার মধ্যে ঘটিয়ে দিই একটি সুন্দর সখীত্ব। অহরহঃ নতুন নতুন কাপড়, ফল, ইত্যাদি স্নেহ-শ্রদ্ধার ভেট নিয়ে আমি রাজপ্রাসাদে যাই; এবং নানান ধরনের সুখের কথার ফাঁদ পেতে রাজকন্যা অম্বালিকার মনখানি মাতাই। পাত্রী হয়ে উঠি তাঁর পরম প্রসন্নতার।

তার পরে একদিন রাজকন্যা এবং আমরা প্রাসাদের শিখরে ব'সে আছি; এমন সময় দেখি, কান্তক বিচরণ করছেন কন্যাপুরের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, কী জানি কেন। তাঁকে দেখেই মাথায় বুদ্ধি এল। রাজকুমারীর কানের নীল পদ্মটি ঠিকই পরা ছিল তাঁর কানে, কিন্তু স্রস্ত হয়ে প'ড়ে যাছে—এই ভনিতা ক'রে, সেটিকে সামলিয়ে দিতে গিয়ে—সেটিকেই ফেলে দিই মাটিতে। ধূলো লেগেছে, আর তো কানে পরা চলতে পারে না সেই পদ্মটি,...তাই পায়রাগুলোকে শাসন করবার অছিলায়,...কান্তকের গায়ে ছুঁড়ে মারি নীলকমল। ফুলের আঘাতে কান্তক উপর দিকে মুখ তুলে চান আর আমার হাসিমুখ দেখে হেসে ফেলেন। রগড় দেখে রাজকুমারীও হেসে ফেলেন। বেচারী কান্তক! ধন্য হয়ে যান এবং আমিও সেই ক্ষেত্রে এমন চাতুর্যের সৃষ্টি করি, হাবভাব দেখাই,—যাতে ক'রে কান্তকের মনে স্থির বিশ্বাস হয়ে যায় যে, রাজনন্দিনীর হাসিখানির মূলে রয়েছে কান্তকের উপরেই তাঁর...ভালবাসা। মনসিজ তো ফুলের ধনুকে গুণ টেনেই রয়েছেন, কান্তককে আর বিঁধতে কতক্ষণ! কিন্তু কান্তক বুঝলেন না,—ফুলবাণ নয়, সেদিন বিষবাণ তাঁকে বিঁধেছে। মোহগ্রস্তের মতো কোনক্রমে টলতে টলতে সেখান থেকে তিনি চ'লে যান।

সন্ধ্যাবেলায় আমি এক কাণ্ড ক'রে বসি। রাজনন্দিনী অম্বালিকা নিজের অঙ্গুরীয়ের শীল-মোহর-দেওয়া একটি বেতের ঝাঁপি...

রাগমঞ্জরীকে দেবার জন্যে আমার হাতে দিয়েছিলেন। তাতে ছিল সুগন্ধি পান, দুখানি রেশমের ওড়না, আর গয়না। একটি ছোট্ট মেয়ের হাত দিয়ে আমি সেই ঝাঁপিটি সোজা পাঠিয়ে দি কান্তকের বাড়ীতে। আর তার কিছুক্ষণ পরেই···উপস্থিত হয়ে যাই স্বশরীরে।

আমাকে পেয়ে,···তিনি বুঝি খুশীতে ফেটে পড়েন! তাঁর অগাধ কামনার সাগরে আমি নাকি তারণকর্ত্রী তরণী। রাজকুমারীর অবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটছে, নিদারুণ অসহ্য হয়ে উঠছে তাঁর বিরহ,—আমার মুখে এই সব বার্তা শুনে লক্ষ্মীছাড়াটা প্রায় যেন উন্মাদ হয়ে উঠল আনন্দে। আমারি মুখোচ্ছিষ্ট তাম্বুল, আমারি অনুলেপন, আমারি নির্মাল্য, আমারি গায়ের মলিনাংশুক—তাঁর প্রিয়ার প্রেরিত ব'লে তাঁকে খাওয়ালুম, পরালুম, দিলুম। ফিরে তাঁর কাছ থেকে আদায় ক'রে নিলুম—রাজকন্যাকে দেবার জন্য—উপহার। সব ফেলে দিলুম পথে।

ধীরে ধীরে ক্রমে মন্মথের আগুনে যখন প্রজ্বলন্ত হয়ে উঠলেন কান্তক, তখন একান্তে তাঁকে একদিন আহ্বান ক'রে মন্ত্রণা দিলুম,

'দেখুন, আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি। মিলে যাচ্ছে আপনার সঙ্গে সব লক্ষণগুলো। এক জ্যোতিষী, তিনি আমার প্রতিবেশী, সেদিন আমাকে বললেন,—'কান্তকের হাতেই রাজ্যভার পড়বে। গণনায় তাই বলে।' দেখুন, আমারও মন···তাই বলছে। তা না হ'লে রাজার মেয়ে হঠাৎই বা কেন এত থাকতে আপনাকেই ভালবেসে ফেলবেন? মহারাজেরও পুত্র নেই, ঐ এক কন্যা। ারীর সঙ্গে আপনার মিলন হয়েছে শুনলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন মহারাজ; না হওয়াটাই আশ্চর্য; কিন্তু এও ঠিক যে, পাছে তাঁর কন্যা আত্মহত্যা ক'রে বসে সেই ভয়ে তিনি আপনাকে উৎসন্নে দিতে পারবেন না। বরং আমার মনে হয়, যৌবরাজ্যে করবেন অভিষেক। জ্যোতিষীর ঐ গণনার ঐ অর্থ না হয়েই যায় না। আর আপনি চেষ্টাই বা ক'রে দেখবেন না কেন? কুমারীপুরের অভ্যন্তরে

কেমন ক'রে প্রবেশ করবেন ? উপায় ব'লে দিচ্ছি শুনুন। রাজকন্যার আরাম-কাননের পাঁচিলটি কারাগারের ভিত্তি থেকে মাত্র বিঘৎ দুয়েক দূরে। সেই পথটুকু···সুড়ঙ্গ খনন করালেই নিশ্চিন্তি। নিশ্চয়ই আপনার কারাগারে একটা না একটা হাত-সাফাই চোর পাওয়া যাবে, যে বেটা প্রলোভনে প'ড়ে আপনাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে। আর—উপবনে একবার প্রবেশ করতে পারলে—উপরে থাকব আমরা—আপনি তো আমাদের হাতেই এসে পড়লেন! তখন আর ভয় কি ? সখীরা সকলেই বড্ড ভালবাসেন রাজকুমারীকে; তাঁরা কেউ এ রহস্য ভাঙবেন না।'

কান্তক বললেন, 'তোমার বুদ্ধি আছে, ভাল বলেছ। হ্যাঁ, কারাগারে এক বেটা চোর আছে বটে, সগর রাজার যেন পুত্তুর—খনন-বিদ্যায় ধুরন্ধর। সে বেটাকে যদি হাত করতে পারি তা হ'লে এক নিমেষেই কার্যোদ্ধার।'

লোকটা কে, তাকে হাত করাই বা যাবে না কেন—এই সব প্রশ্ন করাতে কান্তক বললেন, 'ধনমিত্রের হাপরটাকে যে বেটা চুরি করেছিল সেই বেটার কথাই বলছি। সে বেটাই এক পারতে পারে।'

আমি তখন কান্তককে বললুম,—"বেটাকে দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়াতে হ'লে শপথ ক'রে আপনাকে বলতে হবে—'দেখ, কাজ শেষ হ'লে তোমাকে ছেড়ে দেবো।' কিন্তু কাজ ফুরোলেই বুঝেছেন, আবার বেটাকে শিক্‌লি পরিয়ে মহারাজের কাছে আপনাকে নিবেদন করতে হবে—'মহারাজ, অনেক চিকিৎসা করলুম, কিন্তু··ধৃষ্টতা দেখুন, হাপরের সন্ধান না দিয়েই আবার আমার হাত থেকেই কি না পালায়!···ওর চিত্রবধের আদেশ হবে। আমাদের স্বার্থও সাধন হবে, রহস্যও গোপন থাকবে।"

এই কথা বলাতে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে গেলেন কান্তক।···প্রলোভন দেখিয়ে আপনাকে ভোলাবার জন্যে আজ আমাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নিজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন

কারাগারের বাইরে। সব কথা তো শুনলেন, এখন কি করা উচিত চিন্তা ক'রে দেখুন।'…"

রাজকুমার, আনন্দে লাফিয়ে উঠল আমার আত্মা। বললুম—

"কথায় কাজ নেই, তাঁকে এখানে নিয়ে এস।"

কান্তক প্রবেশ ক'রে শপথ করলেন—'মুক্তি দেব' এবং আমিও শপথ করলুম 'রহস্য ভেদ করব না।' শৃঙ্খল খুলে গেল। স্নান ভোজন অঙ্গপ্রসাধন ইত্যাদি সাঙ্গ ক'রে কারাগারের নিত্য অন্ধকার ভিত্তি-কোণে পুনর্বার প্রবেশ করলুম। ফণীমুখ যন্ত্রের আনুকুল্যে সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করতে আমার বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। তখন মনে মনে ভেবে দেখলুম,—

"কান্তক বেটা স্থির ক'রেই রেখেছে কার্যোদ্ধার হ'লেই আমাকে বধ করাবে। আবার এদিকে…শপথও করেছে। এখন যদি বেটাকে হত্যা করি তা হ'লে দোষ লাগে না সত্যভঙ্গের।"

দেখতে দেখতে কান্তক উপস্থিত হয়ে গেলেন। হাতে লৌহ শৃঙ্খল। আমাকে বাঁধবার জন্যে যেই হাতখানি বাড়িয়েছেন অমনি আমি তাঁর বুকে পদাঘাত ক'রে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলুম। এবং পরমুহূর্তেই তাঁরি কৃপাণখানি ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরই মস্তকটিকে পৃথক ক'রে ফেললুম দেহ থেকে। শৃগালিকাকে ডেকে বললুম, "এখন আমাকে দেখিয়ে দাও কন্যাপুরের সংস্থান, সন্নিবেশ। আমার এত বড় প্রয়াস কি বিফলে যাবে? না, তা হবে না। কন্যাপুর থেকে… কিছু…হাতিয়ে তবে আমি ফিরব।"

পথ দেখাল শৃগালিকা। কন্যাপুরে অসংখ্য মণি-প্রদীপ,…জ্বলছিল। সারাদিন খেলা ক'রে শ্রান্ত হয়ে এদিকে ওদিকে সুখে ঘুমিয়ে পড়েছে পরিজনেরা। হাঁসের পালকের তৈরী নরম বিছানা, বালিশ। কক্ষের মাঝখানে বৃহৎ পর্যঙ্ক; সিংহাকার হাতীর দাঁতের পায়া; মহামূল্য স্থূলরত্ন জ্বলছে। পালঙ্কের চৌদিকে ফুলের পরাগ; ভুর ভুর করছে গন্ধ।

প্রথমেই চোখ নামল···ছুখানি চরণের উপর। দক্ষিণ চরণের সুন্দর তলদেশের উপর ভর রেখে বাম চরণের মনোহরণ পাতাখানি প'ড়ে রয়েছে! আর একটু চোখ তুলতেই দেখি—আহা, ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে তো একজোড়া তুলতুলে গোছ! চোখ আপনিই উঠতে লাগল উপরে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল—

ছুটি জঙ্ঘা···পরস্পরকে তারা জড়িয়ে রয়েছে,
ছুটি জানু···কোমল অল্প-কুঞ্চিত তাদের রেখা,
ছুটি উরু···একটু যেন লতানো,

নিতম্বের উপরে স্রস্তমুক্ত একখানি ভুজলতার লালিত্য; অন্য বাহুখানি···ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উত্তানিত কর-পল্লবের মধ্যে ধ'রে রয়েছে সুন্দর শিরোভাগ;

লীলাভরে এলিয়ে পড়েছে গ্রীবা; গ্রীবার হেমসূত্রে পদ্মরাগ মণির একখানি ধুকধুকি জ্বলছে।

সুপ্তির রাজত্ব···নিঃশঙ্কচিত্তে দেখতে লাগলুম—

শ্রোণীমণ্ডলের রেখাটি···একটু যেন বাঁকা;
চীনাংশুকের অধোবাস নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে দেহটিকে;
মৃদু নিঃশ্বাসে ধীরে কাঁপছে স্তন-মুকুলের কাঠিন্য।

একটি কান চাপা, অর্ধেক দেখা যাচ্ছে কুন্তল;—অন্য কানটি স্পষ্ট, উপরে ভাসা; কুণ্ডলের রত্ন-কর্ণিকা থেকে ভাঙা-ভাঙা চুলিগুলির উপর ছড়িয়ে পড়েছে কিরণের হলুদ রঙের রেণু।

মুখের ভিতরখানি টুকটুকে লাল;

ওপাশের গালের নীচে হাতখানির মায়া,···কানপাশার যেন নবকল্পনা;

আর, উপর-গালের আয়নাটিতে ছায়া পড়েছে বিতানের ফুল-কারীর; ফুটফুটে নতুন-ফোটা যেন তিল।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এত সৌন্দর্য দেখবার তখন আমার সময় কোথায় ? তবু চোখ যেন···স'রে যেতে চায় না। সে দেখল—

ঘুমভরা নয়নে,—নীলপদ্মের মুদিত-মহিমা ;

নিশ্চয় ভুরুর বিজয়পতাকাটি···কাঁপছে না ;

সামান্য একটু শিথিল হয়ে পড়েছে চন্দনের তিলকখানি—

শ্রমজলের পুলকে ;

আর মুখের উপর, হালকা হাওয়ায় ধীরে ধীরে দুলছে অলকের লতিকা।

শয্যার শুভ্রতায় একপাশ চেপে শুয়ে রয়েছেন···রাজনন্দিনী অম্বালিকা···বিশ্রব্ধ-প্রসুপ্তা ; শরতের শুভ্র মেঘে সৌদামিনীর এক স্বপ্ন !

তাঁকে দেখতে দেখতেই, আমার সর্বাঙ্গ···থিরথির ক'রে কাঁপতে লাগল ; কী যে চুরি করব···ভুলে গেলুম, হারিয়ে গেল স্পৃহা। চুরি করতে এসেছিলুম, হঠাৎ মনে হ'ল আমারি হৃদয়···চুরি হয়ে যাচ্ছে ! মূঢ়ের মতো স্থির দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ বুকের মধ্যে কথা ক'য়ে উঠল মন,—

"কী ডাগর···চোখের দুটি ছাঁদ ! এঁকে যদি নিজের করতে না পারি তা হ'লে বসন্ত-বন্ধু আমাকে বেঁচে থাকতে দেবেন না। কিন্তু ওঁকে স্পর্শ করাও তো বিপদ ! আচমকা জেগেই যদি চীৎকার দিয়ে ওঠেন তা হ'লেই আমার সঙ্কল্পের মাথায় পড়বে বাজ। আমিই মরব।"

তখন এক কাজ করলুম। হাতীর দাঁতের আলনা থেকে লিখন-ফলক নামিয়ে নিলুম ; হিঙ্গুলের মতো সেটি চকচকে লাল ; মণিপাত্র থেকে তুলে নিলুম তুলি। একখানি ছবি এঁকে ফেললুম ;—যেমন ক'রে তিনি শুয়েছিলেন তেমনি, আর তাঁর পায়ের কাছে,—বদ্ধাঞ্জলি আমি। এঁকে, তাতে আর্যাছন্দে লিখে দিলুম,—

"অঞ্জলি রচনা ক'রে এই দাস একটি গূঢ় কথা বলছেন ;—
ঘুমিয়ে থাকুন···আমার সঙ্গে,···মিলনমঙ্গল-শ্রান্তার মতই,···
—এ যেন না হয়—না হয়।"

সোনার পানদার থেকে তুলে নিলুম সুবাসিত ছোট্ট পানের পাতা ; কর্পূর আর সুগন্ধ খয়ের দিয়ে খিলি বেঁধে আরাম ক'রে সেবা করলুম তাম্বুল। আলতার মতো লাল পানের রস দিয়ে, এবার চূণের দেয়ালের উপর এঁকে দিলুম একজোড়া চক্রবাক। তারপরে সন্তর্পণে অঙ্গুরীয়-বিনিময় ক'রে সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে কোনক্রমে বেরিয়ে এলুম। ফিরে এলুম কারাগারে।

সেখানে বন্দী ছিলেন জনৈক নাগরিক-শ্রেষ্ঠ। 'সিংহ-ঘোষ' তাঁর নাম। তাঁর সঙ্গে মিত্রতা পাতিয়ে, সব কথা ব্যক্ত ক'রে শেষে বললুম—"দেখুন, কান্তক বেটা তো মরেছে, আপনি এখন মহারাজের কাছে রহস্যটি উদ্ঘাটন ক'রে দিন, মোক্ষ পাবেন।"

উপদেশ দিয়ে শৃগালিকার সঙ্গে কারাগার পরিত্যাগ করলুম।

কিন্তু এমনি কপাল? রাজপথ দিয়ে চলেছি···নগররক্ষীরা আমাকে ধরতে এল। ভাবলুম,···দৌড়ে যদি পালাই এরা হয়তো আমাকে ধরতে পারবে না, কিন্তু বেচারী শৃগালিকা পড়বে বিপদে। টপ ক'রে তাই বুদ্ধি স্থির ক'রে পাগল সেজে গেলুম। রক্ষীদের কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে, কনুই দুটো নিজের পিঠের দিকে ঠেলে দিয়ে বললুম,

"ও মশায়রা, আমি চোর, আমায় বাঁধো···আমায় বাঁধো। তোমরা বাপু বোঝ না, আমাকেই বাঁধতে হয়, বুড়ো-হাবড়াকে নয়।"

শৃগালিকা বুঝে নিলে ব্যাপারখানা কোন দিকে গড়িয়েছে। সে তখন তাদের প্রণাম ক'রে বললে,

'আমার এই ছেলেটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা করিয়ে সেদিন বাড়ী আনি। এই কাল পর্যন্ত বেশ ভালই ছিল।

আমি ওর শিকল খুলে দিলুম, স্নান করালুম, তেল-চন্দন মাখালুম, পাট ভেঙে একজোড়া কাপড় পরালুম, পরমান্ন খাইয়ে আনন্দে ওকে ছেড়ে দিলুম। আজ আবার এই মাঝরাতে ওকে দেবতায় ভর করেছেন, কেবল চেঁচাচ্ছে—"বেটা কান্তকটাকে খুন করব, রাজার মেয়েটাকে বিয়ে করব—।" কী যে পাগলামি, বুঝতে পারছি না বাপু ছুটেছে ··আমিও ছুটেছি। এখন দয়া ক'রে আপনারা আমার ছেলেটাকে ধরুন ; শিকল দিয়ে বেঁধে আমাকে দিন।'

শৃগালিকা যখন কাঁদতে কাঁদতে এই সব আওড়াচ্ছে ততক্ষণে আমি—

"ওরে বেটী বুড়ী,···আমি পবনদেব, আমায় আবার···বাঁধবে কে ? কাকগুলোর কর্ম নয় গরুড়টাকে ঠোকরানো।"—এই না বলতে বলতে পা চালিয়ে অন্তর্ধান।

বক্ষীরা শৃগালিকাকে কদর্থ ক'রে বলতে লাগল—"তুমিই বাপু পাগল, পাগলকে পাগল না ভেবে যে মানুষ ছেড়ে দেয়, সেই পাগল। ও বেটাকে এখন বাঁধবে কে ?"

চ'লে গেল ; শৃগালিকাও আমার অনুসরণ করল। কামমঞ্জরীর গৃহে ফিরে এসে দেখি—সে বেচারী বহুদিনের বিরহে শ্রান্তা বিহ্বলা হয়ে রয়েছে। তাকে সমাশ্বস্ত ক'রে পরের দিন প্রত্যুষে ধনমিত্রের কাছে যাই।

তার পরেই জানতে পাই—

ভগবান মরীচির বারাঙ্গনা-অধ্যায়ের কৃচ্ছ্রসাধনার অবসান ঘটেছে। প্রখর তপস্যার প্রভাবে তিনি পুনর্বার ফিরে পেয়েছেন তাঁর দিব্যচক্ষুঃ। তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তাঁর কাছেই জানতে পারি, রাজকুমার, এবম্ভুতপ্রকারে আমি আপনার দেখা পাব।

এদিকে সিংহ-ঘোষ কান্তকের অপকীর্তির কথা সবিশেষ নিবেদন, করলেন মহারাজের নিকটে। মহারাজ প্রসন্ন হয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন

এবং তাঁকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন কান্তকের পদে। সিংহ-ঘোষের দাক্ষিণ্যে আমি বহুবার সুড়ঙ্গপথে কন্যাপুরে প্রবেশ করবার সুযোগ পাই এবং শৃগালিকার দৌত্যে বাণী-মুগ্ধা রাজনন্দিনী অম্বালিকার সঙ্গে আমার মিলন ঘটে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই, 'চণ্ডবর্মা' অবরোধ করলেন অঙ্গরাজ 'সিংহবর্মা'র রাজধানী। সিংহবর্মার দুহিতা···কুমারী অম্বালিকার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন চণ্ডবর্মা। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে অবরোধ করেন অঙ্গরাজ্য। শত্রু যখন দুর্গ-লঙ্ঘের বিধিব্যবস্থা (পারগ্রামিক বিধি) নিয়ে ব্যস্ত, তখন সিংহবর্মা নিজেই প্রাকার ভেদ ক'রে প্রত্যাসন্ন সহায়দের প্রতীক্ষা না ক'রেই আক্রমণ ক'রে বসলেন শত্রুকে। কিন্তু শত্রুবল অত্যন্ত অধিক ; প্রচণ্ড যুদ্ধ সত্ত্বেও ভিন্নবর্মা হয়ে তিনি বন্দী হলেন। বিবাহের উদ্দেশ্যে অম্বালিকাকে স্ব-ভবনে বলপূর্বক ধ'রে নিয়ে গেলেন চণ্ডবর্মা এবং প্রচার ক'রে দিলেন, 'রাত্রি অবসানে কৌতুকমঙ্গল এবং বিবাহবিধি অনুষ্ঠিত হবে।'

ধনমিত্রের গৃহে উপস্থিত হয়ে আমি তখন নিজের বিবাহের উদ্দেশ্যেই যেন মঙ্গল-সূত্রখানি মণিবন্ধে বাঁধতে বাঁধতে বললুম,

"সখা, অঙ্গরাজকে সাহায্য করবার জন্য শীঘ্রই এসে পড়বেন রাজমণ্ডল। অত্যন্ত গোপনে···বুঝেছ···পৌরবৃদ্ধদের সঙ্গে নিয়ে এখনি তুমি রাজাদের কাছে দৌড়োও। এই আমি ব'লে রাখছি, ফিরে এসেই দেখতে পাবে—শত্রুর ছিন্নশির লুঠোচ্ছে···ধরাপৃষ্ঠে।"

ধনমিত্র চ'লে গেল। আর আমি অগ্রসর হলুম ক্ষীণায়ুঃ চণ্ডবর্মার প্রাসাদের দিকে। সকলে তখন উৎসবে মত্ত। চলেছে বিবাহের বিপুল সমারোহ। আসছে যাচ্ছে বহু লোক। ভিড়ের মধ্যে অলক্ষ্যশস্ত্রিক হয়ে মঙ্গলপাঠকদের সঙ্গে প্রবেশ করলুম প্রাসাদে। উপস্থিত হয়েই দেখি, আথর্বন বিধিতে অগ্নিসাক্ষ্য ক'রে অম্বালিকার পাণি-পল্লব

সমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছেন পুরোহিত এবং চণ্ডবর্মা নিজের বাহুদণ্ড প্রসারিত ক'রে গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সেই পল্লব। আর বিলম্ব নয়। চণ্ডবর্মার বাহুদণ্ডটিকে আকর্ষণ ক'রে তাঁর বুকের মধ্যে তৎক্ষণাৎ বসিয়ে দিলুম···শাণিত ছুরিকা। সাঙ্গোপাঙ্গেরা স্ফুলিঙ্গের মতো লাফিয়ে এল, কিন্তু তাদের এবং আরো কয়েকটা নগণ্যকে যমমন্দিরে পাঠাতে বিশেষ কিছু কষ্ট ওঠাতে হ'ল না। হতবিধ্বস্ত কক্ষ, অসিহস্তে বিচরণ করছি আমি। তখন আমায় পায় কে ?—কোমলা মধুরগাত্রী বিশাল-লোচনার দিকে চেয়ে দেখলুম,···দেখি তিনি কাঁপছেন ; হাতে ধ'রে তাঁকে তুলে নিলুম, আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করতে প্রবেশ করলুম গর্ভগৃহে। প্রবেশ করছি, ঠিক এমনি সময়ে নতুন মেঘের গর্জনের মতে আপনার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে লাগল। অনুগৃহীত হয়ে গেলুম।

অপহারবর্মার কাহিনী শুনে হাসি থামিয়ে রাজবাহন বললেন, "কর্কশতায় আর গুণ্ডামিতে তুমি দেখছি চৌর্যশাস্ত্রকার কর্ণীসূতকেও ছাড়িয়ে গেছ।"

তার পরে উপহারবর্মার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "এইবার আমাদের শোনবার পালা···তোমার কাহিনীটি।"

প্রণাম ক'রে, মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে উপহারবর্মা বলতে লাগল—

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

উপহারবর্মার চরিত

রাজকুমার, অন্যদের মতন আমিও সেদিন আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। তারপরে, চলতে চলতে একদা পৌঁছলুম এসে 'বিদেহে'। মিথিলায় তখনও প্রবেশ করিনি, দৃষ্টিতে পড়ল ছোট্ট একটি মঠ। বিশ্রাম করব ভেবে মঠে উপস্থিত হয়েছি, বেরিয়ে এলেন একটি বৃদ্ধা তাপসী। পা ধোবার জল দিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলুম অলিন্দে। হঠাৎ দেখি, সেই বৃদ্ধা সতৃষ্ণনয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন, আর কাঁদছেন। ধারাকারে চোখের জল। "মা, তোমার এ কান্না কেন?" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন—

' "দীর্ঘজীবী হও বাছা। মিথিলার রাজা প্রহারবর্মার নাম নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ। মগধের রাজা রাজহংসের তিনি ছিলেন প্রাণপ্রিয় বন্ধু; যেন শম্বর আর বল। তাঁদের দুই মহিষী বসুমতী আর প্রিয়ংবদা; তাঁদের মধ্যেও ছিল অপ্রতিম প্রণয়।

প্রিয়সখী বসুমতীকে দেখবার জন্যে প্রহারবর্মার সঙ্গে তাঁর মহিষী প্রিয়ংবদা পুষ্পপুরী-নগরীতে এসে উপস্থিত হলেন—কারণ প্রিয়সখীর কোলে আসছেন প্রথম সন্তান। উপস্থিত হবার পরেই এল দুঃসময়। মালবরাজের সঙ্গে মগধরাজের যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের ফল সাংঘাতিক। মগধরাজ কোথায় গেলেন—খুঁজে পাওয়া গেল না। মালবেন্দ্রের দয়ায় সে যাত্রা বেঁচে গেলেন মিথিলারাজ। নিজের রাজত্বে ফিরে আসছেন, হঠাৎ পথে শুনলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'সংহারবর্মা'র পুত্রেরা অর্থাৎ 'বিকটবর্মা'রা তাঁর মিথিলারাজ্য দখল ক'রে বসেছেন। খবর

পেয়েই তিনি তখন সুহ্মপতির কাছে সাহায্য পাবার আশায় অবগাহন করলেন কান্তার-পথে।

কিন্তু নিয়তি এমন, প্রহারবর্মা আক্রান্ত হলেন। একদল লুঠেল ব্যাধের কবলে প'ড়ে সর্বস্বান্ত হলেন। আমার কোলে ছিল তাঁর ছোট্ট ছেলে। সব চেয়ে ছোট্টটি। তাকে নিয়ে একাকিনী আমি বনের মধ্যে পালাই। পালাব না—? বনচরদের শর আমাদের চারদিকে তখন সন্‌সন্‌ ক'রে ছুটছে।

নিয়তিতে কি করায় দেখুন। বাঘ এল, বাঘের নখ! নখের আঁচড় লেগে প'ড়ে গেলুম। আমার হাত থেকে গড়িয়ে প'ড়ে গেল ছোট্ট রাজকুমার। পড়ল গিয়ে একটা খয়েরী রঙের মরা গরুর পেটের খাঁজে। আমাকে ছেড়ে বাঘ দৌড়ল গরুর দিকে।

কিন্তু আবার সেই নিয়তি। বাঘ মরল। যন্তর পাতা ছিল। যেই বাঘটা ছেলেটার উপর পড়ল, অমনি ছুটে এল মরণ-বাণ।

কিন্তু আবার নিয়তি? ভিলেদের ছেলেরা তখনি ছুটে এল; বাঘ আর কচি শিশুটিকে তুলে নিয়ে অন্তর্ধান। চুরি, চুরি একেবারে চুরি! জ্ঞান ফিরে আসতে, আলো-দেখার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, একটি রাখাল ছেলে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কাটা ঘায়ের কত সেবাই না সে করলে, তার কুটীরে এসে আমি সুস্থ হই। কিন্তু মনের ক্ষত কি এত সহজেই মেটে! তাই একদিন ভাবছিলুম—কেমন ক'রে মহারাজ প্রহারবর্মার কাছে গিয়ে পৌঁছব—কী উপায় করব—একেবারে আমি অসহায়···

এমন সময় আবার সেই নিয়তির খেলা!—আমারি মেয়ে 'পুষ্করিকা' সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল, সঙ্গে এক সমর্থ বয়সের যুবক। অবাক হয়ে গেলুম। পুষ্করিকা কাঁদতে লাগল। কী কান্না! কান্না ব'লে কান্না! তার মুখে শুনলুম, তার কোলে মহারাজ প্রহারবর্মার যে দ্বিতীয় পুত্রটি ছিল সেটিও কিরাত-সর্দারের হাতে গিয়ে পড়েছে। তারপর পুষ্করিকা ধীরে ধীরে আমাকে বলতে থাকে—কেমন ক'রে

একটি বনচরের উদয় হয়, তার ক্ষত আরোগ্য ক'রে দেয়, কেমন ক'রে সে সুস্থ হয়, সেই বনচর ভিল তাকে বিবাহ করতে চায়, তারপর নীচু জাতকে বিবাহ করব না বলাতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভিল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, অরণ্যের মাঝখানে একেবারে একটা বাঘ-চর জমিতে পুষ্করিকাকে ফেলে রেখে পালায়,—কৃপাণ দিয়ে নিজের মাথা কাটতে যায় পুষ্করিকা,—সব। তারপরে শুনলুম, এই যুবকটিই নাকি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তার আত্মহত্যায় বাধা দিয়েছে, তাই সে বেঁচে আছে।

যুবকটিকে তখন জিজ্ঞাসা করলুম, "বাছা, তুমি কে?"

সে বললে, "আমি মিথিলানাথের সেবক। কোনো বিশেষ কারণে আমার বিলম্ব ঘ'টে গেছে, তাই তিনি যে পথে গেছেন সেই পথ অনুসরণ ক'রে এখন আমি চলেছি।"

সেই যুবক আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, আর দুটি হারা-পুত্রের ইতিহাস পাথেয় ক'রে, দেবী প্রিয়ংবদা এবং দেব প্রহারবর্মার কাছে পৌঁছই। আমাদের কথা শুনে তাঁদের কান পুড়ে গেল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংহারবর্মার পুত্রদের বিরুদ্ধে পুনর্বার আরম্ভ হ'ল প্রহারবর্মার অসহিষ্ণু অভিযান।

কিন্তু নিয়তি এমন, রাজা হেরে গেলেন, বন্দী হলেম, দেবীও বন্দী হলেন। আমার সারা গায়ে কে যেন আগুন লাগিয়ে দিল। কিন্তু আমি বৃদ্ধা। কি আর করতে পারি—কিছুই না। মরতে পারলুম না, স্থির করলুম প্রব্রজ্যা নেব। নিয়েছি।

কিন্তু আমার মেয়ে পুষ্করিকা সহ্য করতে পারল না প্রব্রজ্যার কষ্ট। সে আর করে কি! এখন সে আশ্রয় নিয়েছে, 'কল্পসুন্দরী'—যিনি বিকটবর্মার মহাদেবী,—তাঁর কাছে। আমি বুড়ী হয়ে গেছি, তোমাকে দেখে বাছা, তাদের কথাই ভাবছি আর কাঁদছি। সেই দুটি রাজকুমার কি এতদিনেও পূর্ণাঙ্গ হন নি? যদি হয়ে থাকেন তা হ'লে মহারাজ প্রহারবর্মার সিংহাসন-চোর ঐ জ্ঞাতিশত্রুগুলো নিপাত যায়।"

বৃদ্ধা তাপসী কাঁদতে থাকেন।

ব্যাপার বুঝতে আমার বিলম্ব হ'ল না। চোখ ফেটে ইন্দ্রদেবের ধারা নামল। তাপসীকে বললুম—

"মা, তাই যদি হয়ে থাকে, তবে আশ্বস্ত হোন। মনে রাখবেন—একদিন একটি মুনির কাছে আপনি সেই অবস্থাতেই উপস্থিত হয়েছিলেন, ছেলেটির সন্ধান করতে। মুনি সেই ছেলেটিকে পেয়েছিলেন, পালন করেছিলেন। সে এক বিরাট কাহিনী। ভণিতা ক'রে লাভ নেই। সেই ছেলেই···আমি। আমি যদি সেই বিকটবর্মাকে একবার আমার দুটো হাতের মধ্যে পাই, তা হ'লে মরণালিঙ্গন কেমন ক'রে দিতে হয় তা দেখিয়ে দেব। কিন্তু শুনেছি বিকটবর্মার অনেকগুলো ভাই রয়েছেন। পৌরজনপদেরা তাঁদের সঙ্গে মিলে যাবে। মিথিলায় আমাকে তো কেউ চেনে না। আমার বাপ মা, তাঁরাও আমাকে চিনতে পারবেন কি না সন্দেহ, অন্যদের কথা ছেড়েই দিন। নিশ্চয়। এ কাজ আমাকে করতেই হবে, উদ্ধার করতেই হবে, উদ্ধারের পথ বার করতেই হবে আমাকে।"

আমার কথা শুনে ধাত্রী-মার তখন কী ক্রন্দন, আর কী আনন্দ! একবার কোলে বসান, একবার মাথা শোঁকেন। ক্ষীরধারার মতো মাতৃস্তন থেকে যেন উপচিয়ে পড়ল আনন্দ। গদ্‌গদ স্বরে আমাকে বললেন,

"চিরজীবী হও বাছা, তোমার কল্যাণ হোক্। আজ প্রসন্ন হয়েছেন বিধাতা। বিদেহের প্রজারা আজ থেকেই এসে গেল মহারাজ প্রহারবর্মার অধীনতায়। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দুটি বাহুর বিক্ষেপে তুমি আজ পার হয়ে গেলে শোকের অপার সাগর। দেবী প্রিয়ংবদার কি ভাগ্য!"

আনন্দের নির্ভরতায় আমার জন্যে ধাত্রীমাতা সমস্ত বিধিব্যবস্থা ক'রে দিলেন। স্নান্ হ'ল, পরিপাটি ভোজন হ'ল। ছোট্ট মঠের একটি প্রান্তে, তৃণশয্যায় শয়ন করলুম রাত্রে। চিন্তা এল—

"ছল, কৌশল, কাপট্য অবলম্বন না করলে, অর্থসিদ্ধি অসম্ভব।

তবে···স্ত্রীলোকেরাই·· ছল, কৌশল আর কপটতার জন্মক্ষেত্র। তা হ'লে এখন এক কাজ করি। বৃদ্ধার কাছ থেকেই রাজপ্রাসাদের সমস্ত বৃত্তান্তটি জেনে নিয়ে,···জাল ফেলি।"

চিন্তার মধ্যপথে কখন যে শেষ হয়ে এল রাত্রি, চোখেই পড়ে নি। হঠাৎ আলো দেখে চমকে উঠলুম। সে এক আলোকের ছবি।

মহার্ণবে ডুবে ছিলেন যে সূর্যদেব, হঠাৎ তাঁর অশ্বদল যেন লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন আকাশে; আর তাঁদের অসহ্য তপ্ত নিঃশ্বাসে··· বেগে পালালেন ত্রিযামা। সূর্য উঠলেন বটে গগনে, কিন্তু কেমন যেন মন্দপ্রতাপ। সমুদ্রগর্ভে বাস ক'রে জড়ীভূত হয়ে গেছে তার অঙ্গ।

উঠে পড়লুম শয্যা ছেড়ে।

প্রাভাতিক বিধি সমাপন ক'রে ধাত্রীমাতাকে বললুম, "মা, বিকটবর্মা একটা শঠ, প্রবঞ্চক, পামর। ওঁর অন্তঃপুরের খবর কিছু রাখ?"

বাক্য শেষ হয় নি,—হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে আস্ছে,···অঙ্গনডিঙোনো মেয়ে। তাকে দেখেই আনন্দে অশ্রুকুণ্ঠিতকণ্ঠে ব'লে উঠলেন ধাত্রী, "ঐ আমার মেয়ে এসেছে। পুষ্করিকা, এই দেখ,···আমাদের প্রভুপুত্র। চণ্ডালের মতো একেই আমি বনের মধ্যে হারিয়ে ফেলে চ'লে এসেছিলুম। এতদিনে ফিরেছে।"

পুষ্করিকা অনেকক্ষণ কাঁদল, তারপর শান্ত হ'ল। মায়ের প্ররোচনায় পুষ্করিকা তখন আমাকে শোনাতে লেগে গেল রাজার অন্তঃপুরের বৃত্তান্ত। শেষে বললে, "কুমার, কামরূপেশ্বর কলিন্দবর্মার তিনি কন্যা,—কল্পসুন্দরী তাঁর নাম,—কলাবিদ্যায় তাঁর যেমন গুণ তেমনি আবার অপ্সরা-জয়ী রূপ। তিনিই এখন তাঁর স্বামী বিকটবর্মাকে অভিভূত ক'রে রেখেছেন। অবরোধে অনেক রূপসী রয়েছেন কিন্তু কল্পসুন্দরীকে না হ'লে বিকটবর্মা একেবারেই অচল।"

আমি বললুম, "দেখ পুষ্করিকা, আমার উপদেশমতো তোমাকে

চলতে হবে। আমার দান, আমার গন্ধমাল্য ইত্যাদি উপচার নিয়ে কল্পসুন্দরীর কাছে তোমাকে নিত্য যাতায়াত করতে হবে। বিকটবর্মার তো ঐ চেহারা। দোষ দেখিয়ে, নিন্দা রটিয়ে, কল্পসুন্দরীর মনের মধ্যে জন্মিয়ে দিতেই হবে···স্বামীর উপর ঘোর বিদ্বেষ, অপ্রীতি। বাসবদত্তার মতো মেয়েরা মনের মতন যোগ্য-পতিই বেছে নিতেন—পুরাকালের সেই সব কাহিনীর বর্ণিমা করে তাঁর চিত্তটিকে ফিরিয়ে আনতে হবে—ক্রোধের পথে, অনুশোচনার পথে। অবরোধের মধ্যে রাজা কোথায় কি দুষ্কৃতি করেছেন, কোন বিলাস, বা কোনো ব্যভিচার, সম্পূর্ণ সন্ধান নিয়ে···অত্যন্ত গোপনীয় হ'লেও···কল্পসুন্দরীর কাছে তোমাকে প্রকাশ ক'রে দিতে হবে তার পূর্ণ তথ্য। তোমায় বাড়াতে হবে তাঁর অভিমান।"

আরো বললুম, "দেখো ধাই-মা, ঐ একটি কাজ ছাড়া তোমার আর এখন অন্য কাজ নেই। সব সময়েই···ঐ রাজবধূটিকে ঘিরে থাকতে হবে তোমায়, আর প্রত্যহ যেখানে যা যা ঘটবে আমাকে এসে···জানাতে হবে। দেখবে, আমার পরামর্শ মতো চললে মধুর ফলই ফলবে। স্থির ছায়ার মতো কল্পসুন্দরীর পিছনে লেগে থেকো।"

পুষ্করিকাকে সঙ্গে নিয়ে ধাত্রী-মাতা কথামতো কাজ করতে লেগে গেলেন।

কয়েক দিন পরেই ফিরে এলেন ধাত্রী-মা। বললেন, "বাছা, শোচনীয় অবস্থা ক'রে ছেড়েছি কল্পসুন্দরীর। এখন তাঁর দশা হয়েছে সেই রকমের, যেমন হয় মাধবীলতার,—নিমগাছকে জড়ালে। আর কী করতে হবে বল।"

আমি তখন নিজের একখানি প্রতিকৃতি আঁকলুম। হাতে দিয়ে বললুম, "এই প্রতিকৃতিটি কল্পসুন্দরীর কাছে নিয়ে যাও। ছবিখানি ভাল ক'রে তিনি দেখবেনই, তারপর নিশ্চয়ই বলবেন—সত্যি, এই রকমের দেখতে? এমনধারা চেহারার—সত্যিই কি কোনো পুরুষ

মানুষ থাকতে পারে?' তখন তাঁকে ব'লো—'যদি থাকে, তা হ'লে কি হয়?' উত্তর যেটি কানে শুনবে আমাকে এসে জানিও। খুব যত্ন ক'রে শুনো।"

প্রতিকৃতি নিয়ে চ'লে গেলেন ধাত্রী-মা···রাজবাড়িতে। ফিরে এসে একান্তে বললেন—

"কুমার, সুন্দরীকে তোমার চিত্রপটখানি দেখাই। দেখতে দেখতে যেন মাতাল হয়ে উঠলেন, বলতে লাগলেন—

"শ্রী আছে শরীরে·· চিত্রে-আঁকা মানুষটির। সারা জগতে যেখানে পুষ্পধনুর আলোড়ন···সেখানে এতদিন এই সুন্দরটি লুকিয়ে ছিলেন কোথায়? ইনিই তো দেখছি পৃথিবীর ফুলশর। চিত্রটিও আবার বিচিত্র! এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন, এমন তো কাউকে এখানে দেখি নি। এঁকেছেন কে, লিখেছেন কে?"

আদর ক'রে জোর ক'রে বারংবার আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি মুচকি হেসে বলি—"দেবি, ভাল প্রশ্নই আপনি তুলেছেন। ঠিকই বলেছেন আপনি;—বুঝি ভগবান মকরকেতুও এত সুন্দর নন·। তবে পৃথিবীটা মস্ত বড় জায়গা, ছড়িয়ে আছে চারদিকে। দৈবশক্তির কৃপায় কোথাও না কোথাও···এমন রূপও তো থাকতে পারে। অসম্ভব নয় কিছু। আচ্ছা মহাদেবী, একটি প্রশ্ন করি আপনাকে। এই রকমের রূপ নিয়ে, রূপের অনুরূপ শিল্প শীল বিজ্ঞান কৌশল নিয়ে, মহাকৌলিন্য নিয়ে, যদি কোন তরুণ আপনার সামনে এসে হঠাৎ উপস্থিত হন, তা হ'লে তিনি কি পাবেন?" কল্পসুন্দরী বললেন—

"ওমা, তোমাকে আমি আর কত বলব! শরীর, হৃদয়, প্রাণ—এই সমস্ত। তবে ওগুলো অতি অল্প, দেবার মতো জিনিস নয়। পেলেও কিছু তাঁর পাওয়ারসুখ মিটবে না। তোমার এই কথাগুলো যদি আমাকে ঠকাবার জন্যে বলা হয়ে থাকে তো ভাল, আর যদি তা

না হয় তা হ'লে, এঁকে এনে আমাকে দেখাও। ভিক্ষুক চক্ষু সার্থক হোক। তোমার অনুগ্রহই সেখানে সম্বল।"

কল্পসুন্দরীর মনের ভাবটিতে গভীরতর রেখাপাত করবার উদ্দেশ্যে পুনর্বার বলি—"রয়েছেন বটে এমনি একটি রাজার দুলাল। ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে তিনি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই তো সেদিন বসন্তোৎসব হয়ে গেল—সখীদের নিয়ে আপনি গিয়েছিলেন নগরের উপবনে··· বিহারে। সেখানেই তিনি আপনাকে দেখেছেন—বিগ্রহিণী যেন রতিরাণী। দেখা মাত্রই শ্রীমদনের পাঁচটি বাণ লক্ষ্য ভেদ ক'রে তাঁকে পেড়ে ফেলেছে—সেই তিনিই খুঁজে খুজে আমাকে বার করেছেন! যখন আমি দেখলুম···আপনাদের দুজনের রূপ অনুরূপ, অন্য-দুর্লভ চেহারা, অসামান্য গুণ, তখনই আমি সাহস ক'রে,···আর তাঁরি শেখরমাল্য অনুলেপন ইত্যাদি হাতে নিয়ে···আপনার উপাসনা করেছি। সেই কুমারই আপনার প্রতি তাঁর প্রেমের গভীরতা দেখাবার উদ্দেশ্যে···নিজের প্রতিকৃতি নিজহাতে অঙ্কিত ক'রে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার কামনার সুনিশ্চিত যদি কোনো ভিত্তি থাকে তা হ'লে বলতে পারি, এই অতি-মানুষটির সামনে কোনো বাধাই বাধা নয়। প্রাণ, শৌর্য, বুদ্ধির প্রখরতায় তিনি সব কিছুই লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা রাখেন। আজই আপনার কাছে তাঁকে নিয়ে আসতে পারি। যদি চান···সঙ্কেত দিন।"

কল্পসুন্দরী কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে শেষে বললেন—

"দেখ, অত্যন্ত গোপনীয় হ'লেও তোমার কাছে এখন আর কোনো কথা গোপন রাখা চলে না। তাই বলছি শোন। রাজা প্রহারবর্মার সঙ্গে আমার পিতৃদেবের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আমার মা 'মানবতী'র প্রিয়-বয়স্যা ছিলেন দেবী 'প্রিয়ংবদা'। কিন্তু তাঁদের দুজনের···আগে কারও···সন্তান হয় নি ; তাই তাঁরা শপথ ক'রে কথা দিয়েছিলেন,···তোমার কিংবা আমার···ছেলে হ'লে অথবা মেয়ে হ'লে বিয়ে দেব। এখন আমিও জন্মালুম আর প্রিয়ংবদা দেবীর পুত্রও

জন্মাল। কিন্তু কোথায় যেন তিনি নষ্ট হয়ে গেলেন! তাই, পিতার নিকটে বিকটবর্মা যখন আমাকে প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি··· কপালের লিখন···তাঁরই হস্তে আমাকে সম্প্রদান ক'রে দিলেন। কিন্তু এই বিকটবর্মা আমার স্বামী হ'লে হবে কি? তিনি নিষ্ঠুর, তিনি পিতৃদ্রোহী; গুণ ব'লে কোনো কিছুর-ই ধার দিয়ে তিনি যান না; এমন কি কামশাস্ত্রের উপচারগুলোতেও তাঁর বিচক্ষণতা নেই। এঁকে নিয়ে আমি কী করি বলো? কলাবিদ্যা জানেন না, কাব্য বোঝেন না, নাটকে মন নেই; কেবল নিজের শৌর্যে নিজে মাতাল; মুখের ভাষায় ভূত ছাড়ে; মিথ্যা বই সত্য বলতে জানেন না,···আর যদি কদাচিৎ কিছু দান করবার শখ চাপল, সে দান হতেই হবে··· অপাত্রে। এমন স্বামীকে কি কেউ ভালবাসতে পারে,···বিশেষ যখন পূর্ণিমা আসে যৌবনে?

এই তো সেদিন দেখলে, আমি কাছে ছিলুম, তবু কী অবহেলা, কী অপমানটাই না তিনি করলেন আমার অন্তরঙ্গিণী পুষ্করিকাকে!

আর ঐ 'রময়ন্তিকা'! নিজেই বেচারী এখনো চিনতে শেখে নি নিজেকে···বাচ্চা, বলতে গেলে যাকে আমি মেয়ের মতো ক'রে মানুষ করেছি, তাকে আমার স্বামীটি আমারই সপত্নী বানিয়েছেন;··· দেমাকে আজ তাঁর পা পড়ছে না মাটিতে,···খাস-নর্তকী হয়েছেন!

জানই তো, 'চম্পকলতা'কে আমি মানুষ করেছি। সে বেচারী সেদিন ফুল তুলছিল। চিত্রকূটের গর্ভগৃহে রত্নশয়ন ছেড়ে···আমি তখন সবেমাত্র উঠেছি,···ছাড়া পেয়েছি,···আমার স্বামীটি তাকেই কিনা সেখানে জোর ক'রে টানতে টানতে ধ'রে নিয়ে গেলেন! বিহার করলেন! ছিঃ ছিঃ, একেবারে পুরুষ-নামের অযোগ্য! এমন পুরুষকে একবার অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করলে, আর কি কেউ থামে? ইহলোকের যন্ত্রণাটিকে ঠেলে দূর ক'রে দিয়েছে···আমার পরলোকের ভয়। যে মেয়ে প্রেমে পড়েছে তাকে যদি চিরটা কাল থাকতে হয় মনের শত্তুরকে বুকে নিয়ে,···সে দুঃখ অসহ্য,··সে যন্ত্রণা

অমানুষিক।···তাই বলছি, তুমি এই ছবির মানুষটিকে আজই আমার উদ্যানে···মাধবীগৃহে নিয়ে এস। আমাকে দেখতে দাও, আমায় ভুলিয়ে দাও আমার অতীত। তাঁর কথা শোনবার পর থেকে আমার মন তাঁরই জন্যে অতিমাত্রায় রঙীন হয়ে উঠেছে। অর্থ সম্পদ রাশি রাশি আমার রয়েছে। সমস্তই তাঁর পায়ে ঢেলে দেব, তাঁরই সেবায়···চিরদিন আমি বাঁচব।”

কল্পসুন্দরীর মুখে এই সব শুনে···তবেই আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। এখন কুমার, যা ভাল বোঝ, কর।” ’

ধীরে ধীরে আমি তখন ধাত্রী-মা'র কাছ থেকে সন্ধান নিলুম, অন্তঃপুরের কোথায় কি আছে, অন্তঃপুরপ্রধানেরা কোন্ কোন্ জায়গায় প্রহরা দেন, শুদ্ধান্তপুরের ক্রীড়াকাননটি কোথায়। বিভাগগুলি সব জেনে নিলুম। তারপরে—অস্তশিখরে যখন চরণস্খলিত হয়ে রক্তবরণ হলেন সূর্য, পশ্চিম সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে অঙ্গার-দেহ ধারণ করলেন তিনি, আকাশে ঘনিয়ে এল ধূম-সম্ভার অন্ধকার ;— তখন পুনর্বার আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলুম—পরস্ত্রীর সেবা করতে চলেছি, এক্ষেত্রে আচার্য করি কাকে ?

এমন সময়ে গগনে উঠলেন চাঁদ। আহা, সেই চাঁদ, যিনি একদিন গুরু-পত্নীকে গ্রহণ ক'রে ফেটে পড়েছিলেন আত্মশ্লাঘায়। নিশি-উজোর চাঁদ! তিনিই কি তা হ'লে আজ আমার···পথভ্রষ্টা আচার্য হবেন ?

উদয়-রাগ-রঞ্জিত চাঁদের দিকে চেয়ে ব'সে রইলুম। মনে হতে লাগল—কল্পসুন্দরীর পদ্মফোটা মুখখানিও বোধ হয় ঐ চাঁদের মতোই নিথর ; আমাকে দেখে অরুণ-অরুণ হাসছে। ভরা মনের ভাবনা···আগুন ধরিয়ে দিল দেহে। তেজের তীক্ষ্ণতা নিয়ে আমার মধ্যে নৃত্য ক'রে উঠলেন পুষ্পধনু ;···ভুবনজয়ী যাঁর কামনা।

কিন্তু তখনই বেরুতে পারলুম না। পালঙ্কে এলিয়ে দিলুম অঙ্গ ! মানসিক রাজপথে হেঁটে বেড়াতে লাগল বিচার-বিতর্ক :—

"সফল হব-হব ব'লে তো মনে হচ্ছে। কিন্তু পরের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম! ধর্ম-পীড়া হতে পারে। আবার শাস্ত্রকারেরাও অনুমোদন করেছেন পারদারিকবিধি, যদি অর্থ ও কাম···দুটিকেই পেতে হয়! কিন্তু আমি যে এই পথ ধরছি—সে তো কেবল গুরুজনদের বন্ধনমুক্ত করবার অভিপ্রায়ে। তবে আবার কি? পাপের চেয়ে পুণ্যের ভাগ এখানে বেশি। আর···সত্যিই···এই সব ব্যাপার কানে গেলে···দেব রাজবাহন বা আমার অন্যান্য সুহৃদেরা···তাঁরাই বা কি ভাববেন?

চিন্তায় বন্দী হয়ে গেলুম। দুর্বল পেয়ে বন্দীকে অভিভূত করল নিদ্রা।

স্বপ্নে দেখলুম···

হস্তিমুখ ভগবান শ্রীগণনাথ আমাকে বলছেন—

"সৌম্য উপহারবর্মা, আশা করি, তুষ্ট হবে না তোমার বিচার। তুমি আমার অংশ, এবং ঐ বরবর্ণিনী কল্পসুন্দরী—তিনি দেব-নদী। তাঁর পক্ষে লালিত হওয়া উচিত ছিল শঙ্করের জটায়। কিন্তু দেবনদীতে নেমে সেদিন যখন স্নান-রত ছিলুম, তখন আমার বিলোড়ন সহ্য করতে না পেরে আমাকে তিনি অভিশাপ দেন, 'যা, মর্তে যা'। আমিও অভিশাপ দিই—'এখানে যেমন তুই বহুভোগ্যা, মানুষী হয়েও তেমনি তুই সাধারণীর মতো বহুভোগ্যা হবি'।

দেবনদী তখন অনুনয় বিনয় ক'রে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। বললুম, 'তথাস্তু। মর্ত্যলোকে এক-পূর্বা হয়ে তুমিই আমার রমণী হয়ে থাকবে। যাবজ্জীবন রমণী'।······সেই ঘটনাটিই ঘটতে চলেছে, আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।"

ছিঁড়ে গেল স্বপ্ন, ভেঙে গেল ঘুম। জেগে উঠলুম।

মনের মধ্যে অপূর্ব এক প্রীতি। সারাটি দিন কেটে গেল···ভাবতে, ভাবতে, স্মরণ করতে করতে···প্রিয়ার সঙ্কেতটি কেমন, কোথায় হবে

মিলন, কেমন করেই বা মিলন হবে, মিলনের আদিতেই বা কি, অন্তেই বা কি!

তার পরের দিন। সম্পূর্ণ অসহ্য হয়ে উঠল একলা স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকা। সর্বকর্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাকে নিয়েই এ কী খেলা অনঙ্গের! কী দুঃসহ বাণ-বর্ষণ! একটি ফুলের বাণ···তার কৃপাতেই কি শুকিয়ে যায় সূর্যদেবের জ্যোতিঃসায়র, বেরিয়ে পড়ে তিমিরময় পঙ্ক?

শেষ পর্যন্ত ঘরে রইতে পারলুম না।

নীল কাপড়···পরলুম। ক'ষে কোমর···বাঁধলুম। খড়্গখানি হাতে নিয়ে বেরলুম। সঙ্গে নিলুম,···এই রকমের অভিযানে যা নিতে হয় সঙ্গে।

ধাত্রীর মুখে যে অভিজ্ঞানগুলির কথা শুনেছিলুম সেগুলিকে স্মরণ করতে করতে···রাজপ্রাসাদের পরিখার তীরে এসে পৌঁছলুম।

পরিখায় থই থই করছে জল। পরপারে পুষ্করিকা সজাগ।

গৃহদেবতার মন্দিরদ্বারে প্রথম থেকেই পুষ্করিকা রেখে দিয়েছিল একগাছি মই। সেইটিকে পরিখার উপর শায়িত ক'রে দেয় পুষ্করিকা। সেইটিতে ভর দিয়ে পার হয়ে যাই পরিখা, এবং সেইটিকেই প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন ক'রে উল্লঙ্ঘন করি মন্দির-প্রাকার। উল্লঙ্ঘন ক'রে দেখি, পাকা ইঁটের গাঁথনি,—গোপুরমের উপরতলায় উঠে গেছে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নেমে পড়লুম রাজমন্দিরের ভিতর-পিঠে। নামতেই দেখি,—বকুলগাছের সুন্দরী একটি বীথি। পার হয়ে গেলুম। ডাইনে-বাঁয়ে চাঁপাগাছ, পথ ছেড়ে সবেমাত্র বেরিয়েছি, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে আমাকে দাঁড়াতেই হ'ল। কীসের যেন আওয়াজ! নাঃ, ও কিছু নয়। ও শুধু উত্তরদিক-থেকে-ভেসে-আসা চক্রবাকমিথুনের করুণ কূজন। রাঙা-মাটির পথ ধ'রে পশ্চিম দিকে চলতে লাগলুম। বিশাল সৌধশ্রেণীর একেবারে পেটের কাছ দিয়ে, গা ঘেঁষে, শরক্ষেপের মতো ছুটে গিয়ে পড়লুম···বালি-পথে। পথের এপাশে অশোকের

লৌহিত্য, ওপাশে যূথিকার শুভ্রতা। ফিরতেই দেখি,···অবগাহন করেছি মঞ্জরী-মাতাল আম্র-বীথিতে।

কী ঘন সেই আমবাগান! আবর্তুল দীপাধারে দীপবর্তি জ্বলছে। উপরে আলো, নীচে অন্ধকার। স্নিগ্ধালোকে দেখতে পেলুম—আম্রকাননের মাঝখানটিতে মাধবী-লতার একটি মণ্ডপ। উদর-প্রমাণ উঁচু। মণ্ডপের একপাশে গর্ভগৃহ, আর চারপাশে—শিশু কুরণ্টের ফুল-ফোটা বাহার। মাটির উপর ছড়িয়ে রয়েছে অশোক ফুলের তোড়া,·· নতুন কুঁড়ির পুলক-লাগা···প্রবালের মতো রঙ। চোখে পড়ল কপাট। খুলে···ভিতরে ঢুকলুম।

ঘরের ভিতরে দীপাধার, মণি-দীপ জ্বলছে। বিরাট পুষ্পশয়ন। পুষ্পশেজে প'ড়ে রয়েছে হাতীর দাঁতের হাতপাখা; পদ্মপাতা দিয়ে ঢাকা সুরতের নানান্ উপকরণ। পাশেই ছোট্ট ভৃঙ্গার,—গন্ধসলিলে ভরা।

ফুলের বিছানায় বসে পড়লুম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছি, হঠাৎ··· নাকে এসে লাগল মোহ-মোহ সুবাস, কানে এসে লাগল···ধ্বনি। কে যেন মিষ্টি-পায়ের ধ্বনি তুলে এগিয়ে এগিয়ে আসছে। শোনা-মাত্রই···কুঞ্জ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। সামনেই আরক্ত অশোক-গাছ, তারই মোটা গুঁড়িটির পিছনে অঙ্গ-গোপন ক'রে দাঁড়িয়ে গেলুম।

কল্পসুন্দরী এলেন। সারা দেহে,—অ-হিম জ্বলছে কামনার শিখা। দীপের আলো পড়ল মুখের উপর; দূর থেকে আমি কেবল দেখতে পেলুম···সুন্দর ভুরুর দুটি টান। মুহূর্তটি সার্থক।

গর্ভগৃহে প্রবেশ ক'রে আমাকে দেখতে পেলেন না তপ্তকামিনী। ব্যথিয়ে উঠল তাঁর হৃদয়। মাতাল রাজহংসীর মতো কণ্ঠে জাগল গদ্‌গদ বাণী—

"তবে কি···প্রকাশ হয়ে গেছে! প্রতারিত হই নি তো? মরণ ছাড়া এখন আর অন্য পথ নেই। ওরে হৃদয়···যা করা উচিত নয়, তাই যে তুই ক'রে বসলি; এখন এত উতলা হচ্ছিস্ কেন? ভগবান

পঞ্চবাণ, তোমার পায়ে কী এমন অপরাধ, বলো, আমি করেছি ! ছাই না ক'রে কেবলই কি তুমি পোড়াও ?”

অশোকতরুর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসি ; দীপালোকে এসে দাঁড়াই ; মধু ঝরিয়ে বলি—

“ভামিনি, ভগবান মনসিজের কাছে নিশ্চয়ই আপনি অপরাধ করেছেন,···অনেক অপরাধ করেছেন। অপরাধগুলোকে আমি যে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

প্রথম অপরাধ,—শ্রীমদনের প্রাণপ্রিয়া রতিদেবীকে আপনি রূপ-কুণ্ঠিতা করেছেন। দ্বিতীয় অপরাধ,—তাঁর ধনুকটিকে হারিয়ে দিয়েছে আপনার মোহন ভুরুর টান। তৃতীয় অপরাধ,—ভ্রমর-মালার মতো ধনুকের গুণটিকে···হার মানিয়ে দিয়েছে আপনার ঐ নীল অলকের আভা।

কত অপরাধের নাম করব ! মদনের সব কটি বাণের যা অসাধ্য, তা একলাই সাধছে···কটাক্ষের ঐ শাণিত বর্ষণ। অধর থেকে ঐ যে আলোর ধারাটি ঝরছে, তার কাছে কি দাঁড়াতে পারে কুসুম্ভফুলের কেতন ? সুন্দরি, আপনার নিঃশ্বাসের সৌরভ লেগে লজ্জায় ম'রে যাচ্ছেন মদনের প্রথমবন্ধু মলয়সমীর। কথাটি আর বলবেন না, মঞ্জুল প্রলাপ শুনে কোকিল পালাবে। দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছিলেন মদনদেবতা ; কিন্তু কী আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সঙ্গে নিতে হ'ল—

পুষ্পময়ী পতাকা নয়, আপনারই বাহুর পুষ্পতা ;
পূর্ণকুম্ভ নয়, আপনারই স্তনযুগের পূর্ণতা ;
রণ-রথের মণ্ডল নয়, আপনারি শ্রোণীভাগের জয়চক্র !

আর সত্যিই, অপরাধ কি আপনি কম করেছেন ? ছিঃ, আপনার চরণের প্রভার কাছে হার মেনে···মদনের কান থেকে খ'সে যাচ্ছে যে লীলাপল্লব !

অতএব আমাকে বলতেই হচ্ছে, যোগ্যপাত্রীতে বর্তেছে শ্রীমন্মহারাজ মীনকেতনের যোগ্য শাসন। কিন্তু তাঁর একটি মহদ্দোষ,

আমি বেচারী সাক্ষাৎ ভাল মানুষ, কোন অপরাধ করি নি কোনদিন, আমার উপরে কেন তাঁর এই প্রখর যন্ত্রণার বৃষ্টিপাত ?

সুন্দরি, এবার তোলো তোমার প্রসন্ন মুখ। শুভ-দৃষ্টির সঞ্জীবনী-মন্ত্র দিয়ে আমাকে বাঁচাও। অনঙ্গভুজঙ্গ আমায় দংশেছে।"

বলতে বলতে আমি আমার সমস্ত শরীর দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলুম। আমার দিকে মুখ তুলে···কল্পসুন্দরী চাইলেন। কী তাঁর বড় বড় চোখ! অনঙ্গরাগের আবেশে তখন তিনি পেশলা হয়ে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রিয়মিলন ঘটল। পুষ্ট হয়ে উঠল লালসার লাবণ্য; বিদ্যুৎ হানতে লাগল তুষ্ট চোখের দুষ্টু লালি; কপোলমূলে গড়িয়ে পড়তে লাগল চর্মমধু; নবপ্রণীত কর-খলধ্বনির সমারোহ নিয়ে মুখ থেকে অনর্গল বেরতে লাগল প্রলাপের নির্ঝরিণী; আর সেই ধ্বনির মধ্যপথেই অরুণ-দাঁতের উপর-পাতায় আঙুল-ছোঁয়ানোর সে কী অপূর্ব বাহার! দেখতে দেখতে শিথিল হ'ল···তাঁর অঙ্গের বলনী। মনে হ'ল তিনি যেন একটি রস-ক্লান্তা···আপীড়িতা···মাধুরী। আমি তখন প্রেয়সীর মানসী এবং শারীরী ধারণাটিকে শিথিল করতে করতে নিজেও উপভোগ করলুম সম-রসিক সাফল্য। এল সঙ্গম-বিসৃষ্টি। দুজনেই অনুভব করলুম রতাবসানিক বিধি; দুজনেরই দুজনকে মনে হতে লাগল অতি-পরিচিত ব'লে, চির-পরিচিত ব'লে। রূঢ় বিশ্রম্ভের মধ্য দিয়ে কেটে যায় মুহূর্ত। শেষে আমি পুনর্বার তপ্তদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে···কিঞ্চিৎ দীননয়নে···সচকিতে···হাতখানি প্রসারিত ক'রে সুন্দরীকে বুকে জড়িয়ে নিলুম, অতি-পীড়ন না ক'রে ওষ্ঠে এঁকে দিলুম একটি চুম্বন ··অনতিশুভ্র।

কল্পসুন্দরীর ভাসা ভাসা চোখে ভেসে উঠল অশ্রু। বললেন—

"যদি তুমি চ'লে যাও, তা হ'লে জেনো···আমারও চ'লে যাবে জীবন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।···যাকে ভালবাসা দিয়ে কেনা যায়, তার প্রয়োজন সব সময়েই থাকে। নয়তো, আজকের সমস্তই হবে অসার।"

এই ব'লে তিনি তাঁর কানের পাশে···নিয়ে এলেন হাত দুটিকে ; রচনা করলেন অঞ্জলি। এত সুন্দর দেখাল যে কী বলব ! অঞ্জলিটি যেন কানের দুল !

তাঁকে বললুম—

"অয়ি মুগ্ধে, স্ত্রী-পদার্থ যখন নিজে থেকেই সেধে এসে ধরা দেন তখন কে এমন হৃদয়ধর জগতে আছেন যিনি···তাঁকে অভিনন্দিত না ক'রে থাকতে পারেন ? কিন্তু তুমি···সত্যিই যদি চাও আমার অটল ভালবাসা, যদি কিঞ্চিৎ দ্বিধা না থাকে মনে,···তা হ'লে নির্বিচারে আমার উপদেশ মেনে এখন থেকেই তোমাকে চলতে হবে, কাজ করতে হবে। গোপনে রাজাকে দেখাতে হবে আমার এই সাদৃশ্যগর্ভ চিত্রপট। দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে—

'আচ্ছা, বল তো, এঁর চেহারাটি কেমন ? পুরুষের সৌন্দর্যের এই কি একেবারে চরম কথা নয় ?'

রাজাকে বলতেই হবে 'হ্যাঁ, সুন্দর বটে'।

তখন প্রিয়ে, পুনর্বার রাজাকে ব'লো, 'তাই যদি তোমার মনে হয় তা হ'লে বলি শোনো। সেদিন একটি তাপসী এসেছিলেন। দেশদেশান্তর ঘুরেছেন, অন্ত নেই তাঁর অভিজ্ঞতার, জ্ঞানের। তাঁকে দেখেই মনে হ'ল তিনি যেন আমার আর-জন্মের মা ছিলেন। এই চিত্রপটখানি তিনিই আমায় দেখিয়েছিলেন, বলেছিলেন—

'এমন একটি মন্ত্র আছে,···যাতে ক'রে পুরুষ মানুষের চেহারা এই রকমের বদলে যায় ; তবে তার জন্যে নিয়ম-পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। পর্বদিনে বিবিক্ত স্থানে হোমের আয়োজন করবেন—উপবাসিনী স্ত্রী। অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠান ক'রে পুরোহিতেরা বিদায় নিয়ে চ'লে গেলে,···স্ত্রী যদি একাকিনী রাত্রি-যোগে একশত চন্দনকাষ্ঠ, একশত অগুরুসমিৎ, কর্পূরমুষ্টি, এবং প্রভূত পট্টবসন দিয়ে নিজে হোমানুষ্ঠান করেন, তবেই এই রকম আকৃতিলাভের প্রথমে সম্ভাবনা থাকে স্ত্রীর। হোম শেষ হবার ঠিক আগে তখন তিনি একটি ঘণ্টা বাজাবেন। ঘণ্টার ধ্বনি শুনে

স্বামী সেখানে উপস্থিত হবেন ; জীবনের গোপন রহস্য প্রথমতঃ স্ত্রীর কাছে তাঁকে খুলে বলতে হবে ; দ্বিতীয়তঃ তিনি নিমীলিত করবেন নয়নযুগল ; তৃতীয়তঃ, স্ত্রীকে করবেন আলিঙ্গনদান। তবেই স্বামীতে সংক্রামিত হবে নবলব্ধ আকৃতি। এর পরে কিন্তু স্ত্রীর আকার পূর্বের মতোই হয়ে যাবে। প্রিয় স্বামীর যদি আপনি এই রকমের রূপ চান, যদি তাঁর রুচি হয়, তা হ'লে আশা করি, অনুষ্ঠানটি করতে দ্বিধা করবেন না।'

এই উপদেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন। এখন আমি বলি, যদি তোমার এই রকমের দেহসৌন্দর্য, রূপলাভের অভিমত হয়, তা হ'লে ডেকে পাঠাও তোমার অনুজদের, সুহৃদদের, মন্ত্রীদের, পূরবাসীদের। তাঁরা যদি অনুমতি দেন, তা হ'লেই এ পথে নামা তোমার উচিত, নচেৎ নয়।"...

দেখো সুন্দরী, তোমার রাজা এতে রাজী হয়ে যাবেন। এই যে প্রমোদবন, ঐ যে প্রমোদবনের বীথি, ঐ যেখানে চতুষ্পথ এসে মিশেছে...ঐখানেই আথর্বনিক বিধানে পশুহনন করিয়ে পুরোহিতদের দিয়ে অনুষ্ঠান করাবে হোম। ধূমনির্বাণ করতে আমি সেখানে আসব। লতামণ্ডপে লুকিয়ে থাকব। তারপরে, যখন গাঢ় হয়ে উঠবে প্রদোষ, নর্ম-হাসি হেসে বিকটবর্মার কর্ণকুহরে মধু ঢালতে ঢালতে বলবে—

"তুমি একটি ধূর্ত, অকৃতজ্ঞ। আমার অনুগ্রহে রূপলাভ করবে তুমি আর সেই রূপের প্রভায় জগতের নয়নোৎসব হবে তুমি। বুঝতে পারছি কী করবে তুমি...ঐ চেহারা নিয়ে। সতীনদের ঘরে গিয়ে ঢুকবে। এই না ? নাঃ, নিজের পায়ে কুড়ুল মারবার জন্যে বেতাল উত্থাপন করতে আমি পারব না।"

রাজা নিশ্চয় তখন কিছু বলবেন।...তারপরের ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দিও। এখন আমি বিদায় নিচ্ছি। উপবনের যেখানে যেখানে আমার পদচিহ্ন প'ড়ে রয়েছে,...ভাল ক'রে মুছিয়ে দিও... পুষ্করিকাকে দিয়ে।" '

কল্পসুন্দরী সাদরে গ্রহণ করলেন আদেশ,—যেন পাঠ নিলেন শাস্ত্রের। তারপরে যাই-যাই ক'রে, শেষ পর্যন্ত বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন রাজঅন্তঃপুরে ;—তৃপ্তা হয়ে যেমন সদয়-বিদায় নেন প্রেয়সীরা।

আমারও হ'ল যথা-প্রবেশ তথা-নির্গম। ধীরে ধীরে ফিরে এলুম নীড়ে।

মত্ত-প্রেয়সী তখন পরামর্শমতো সমস্তই আয়োজন ক'রে ফেললেন। দুর্মতি বিকটবর্মার মন···মিশ খেয়ে গেল কল্পসুন্দরীর মনের কথার সঙ্গে।

পুরবাসীরা অবাক। তাদের মধ্যে যেন হেঁটে বেড়াতে লাগল বাণীভরা এক বিস্ময়,—

"সত্যিই, শুনেছ হে, ব্যাপার বড় অদ্ভুত,···অদ্ভুত। দেবীর মন্ত্রবলে রাজা পাচ্ছেন দেবতুল্যি রূপ। এ কি কম কথা! লুকো-ছাপা নেই, প্রতারণা নেই। হতেই হবে কল্যাণ। বিপদ ঘটবে? তাও অসম্ভব। কেন না, অন্তঃপুরের ঠিক মাঝখানটিতে রয়েছে উপবন, আর সেই উপবনেই পরীক্ষা হবে মন্ত্রের মাহাত্ম্য। কে করবেন?—অগ্রমহিষী। বিপদ ঘটা অসম্ভব। তার উপর অনুমতি দিয়েছেন বৃহস্পতি-প্রতিম মন্ত্রীরা। তাও অনেক তর্কবিতর্কের পর। যদি সত্যিই ঘটে, তা হ'লে বলতেই হবে, এর চেয়ে অদ্ভুত কিছু ঘটেনি পৃথিবীতে কোনদিন। মণি-মন্ত্রৌষধির মাহাত্ম্য মনুষ্যচিন্তার অতীত।"

রটনার ঘনঘটার পর দেখতে দেখতে পর্বদিন এল। তখন প্রদোষ। জমাট বাঁধছে অন্ধকার। ধূর্জটির কণ্ঠের মতো ধূম্রবরণ··· হোমের ধোঁয়া উঠল আকাশে। বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল··· ক্ষীর, দই, ঘি, তিল, সরষে, মাংস আর রুধির-মেশানো আহুতির পবিত্র গন্ধ। তারপরে যেই সহসা প্রশান্ত হ'ল ধূমোদগার, আমি প্রবেশ করলুম লতাগৃহে।

নিশান্তে উদ্যানে প্রবেশ করলেন গজগামিনী। বক্ষোলীন আলিঙ্গন ক'রে আমার দিকে চাইলেন। তাঁর চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি। বললেন—

"তুমি বড় ধূর্ত। যা চেয়েছিলে, সত্যিই তা আজ সফল হতে চলেছে। পশুটার এবার শেষ। ওঁকে প্রলুব্ধ করার জন্যে যে দিগন্ত আমায় দেখালে সেই দিকেই আমি চলেছি ; রাজাকে বলেছি—

'তুমি একটি শঠ।·· না, না,···তোমার হয়ে অমন চেহারার সৃষ্টি আমি করব না। এত সুন্দর হ'লে, আকাশের অপ্সরারা নেমে আসবেন, তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বেন, মানুষীদের কথা তো কোন্ ছার। আমি পারব না। তুমি নির্দয় নৃশংস ; কালো ভোমরার মতো উড়তে উড়তে নিশ্চয়ই তুমি একটা না একটা রঙিন ফুলে গিয়ে বসবে।'

কিন্তু রাজা আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন ; তোষামোদের কী ঘটা! হাসি পেল যখন আবার কাব্যি ক'রে আমায় সম্বোধন করলেন 'রম্ভোরু'। বললেন—'প্রিয়ে, ক্ষমা কর আমার অপরাধ। এর পর থেকে আমি মনে মনেও চিন্তা করব না অন্য স্ত্রীলোকের কথা। দেরি ক'রো না। সব প্রস্তুত, চলো।'

তারপরে আমি চ'লে এসেছি,···তোমার অভিসারে এসেছি। বিবাহের সাজে আমাকে আগে একদিন শ্রীঅনঙ্গদেব জায়া-রূপে সঁপে দিয়েছিলেন তোমার হাতে ; আর আজ আমার হৃদয় স্বেচ্ছায় তোমার হাতে সমর্পণ করছে এই দেহখানিকে···সাক্ষী রইলেন জাত-বেদা অগ্নি।"

এই ব'লে, কল্পসুন্দরী আমার পায়ের পাতার উপর তাঁর পায়ের আঙুলগুলিকে রেখে, ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গোড়ালিটিকে একটু উঁচু ক'রে, বাহুর বলনী মধ্যে টেনে নিলেন আমার গ্রীবা। অঙ্গুলির কী কোমল আকর্ষণ! লীলাভরে আমার মুখখানিকে নামিয়ে নিয়ে, পদ্মের মতো নিজের মুখখানিকে তুলে ধ'রে বারংবার আমাকে দান করতে লাগলেন চুম্বন। বিশাল নয়নে···বিহ্বল বিভ্রান্তি!

কল্পসুন্দরীকে বললুম—

"কুরণ্টগুল্মের কোল ঘেঁষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি এখন চললুম। কর্তব্য সাধন ক'রে ফিরব।"

তারপরে যেখানে হোমানল জ্বলছিল সেই দিকে অগ্রসর হয়ে, অশোকশাখায় যে ঘণ্টাটি ঝোলানো ছিল, ··সেটিকে বাজিয়ে দিলুম। সে তো ঘণ্টাধ্বনি নয়! যেন আহ্বান জানিয়ে কূজন ক'রে উঠল কৃতান্তের দূতী। ঘণ্টাটিকে বাজিয়ে দিয়ে, ধীরে ধীরে হোমানলে নিক্ষেপ করতে লাগলুম অগুরু আর চন্দন। অবিলম্বে রাজা বিকট-বর্মা এলেন। সর্বশরীরে শঙ্কা, বিস্ময়ের আভাস। চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, স্তব্ধ। আমি বললুম—

"অগ্নি সাক্ষী ক'রে আমায় কথা দাও, আমার এই অপরূপ দেহ-লাবণ্য নিয়ে সতীনদের কাছে তুমি যাবে না। তা না হ'লে আমি তোমাকে সংক্রামিত করব না আমার রূপ।"

বিকটবর্মার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠল দৃঢ়বিশ্বাস। বললেন—"দেবি, তাই হবে। প্রতারণা করছি না।" শপথ করতে প্রবৃত্ত হলেন রাজা। কিন্তু আমি···ঠোঁটে একটু হাস্য ছড়িয়ে বললুম—

"শপথে আর কাজ নেই। কে এমন মানুষী আছে,···আমাকে যে হারায়? হ্যাঁ, তবে যদি অপ্সরাদের সঙ্গে বিহার করতে চাও, অনুমতি দিচ্ছি—ক'রো, প্রভূত ক'রো, সুখে ক'রো।···এখন বল, গুপ্ত রহস্য তোমার কি কি রয়েছে। বলা শেষ হ'লেই দেখবে,—তোমাতে ঘটছে স্বরূপ-ভ্রংশ।"

বিকটবর্মা বলতে লাগলেন—

"প্রথম;—আমার খুল্লতাত 'প্রহারবর্মা'—তিনি বন্ধন-দশায় রয়েছেন; মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করেছি, বিষান্ন খাইয়ে তাঁকে হত্যা করা হবে, এবং প্রকাশ্যে জানানো হবে,···অজীর্ণ দোষে তিনি মৃত্যুর করাল-গ্রাসে পতিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়;—আমার বাসনা আছে, পুণ্ড্রদেশ আক্রমণ করব। সেই

উদ্দেশ্যে আমি আমার ছোট ভাই বিশালবর্মার অধীনে পাঠাতে চাই "দণ্ডচক্র" (রাজ্যসৈন্যের একটি বাহিনী)।

তৃতীয় ;—পৌরবৃদ্ধ 'পাঞ্চালিক' এবং সাহুকার 'পরিত্রাতে'র সঙ্গে গোপনে আমার কথাবার্তা হয়ে গেছে। জনৈক যবন···'খনতি' তাঁর নাম, এসেছেন। বসুন্ধরা মূল্যের একখানি হীরক আছে তাঁর হাতে। সেইটিকে সংগ্রহ করতে হবে। দাম যদি দিতেই হয়,—যত কম দেওয়া যায়,—তারই হবে ব্যবস্থা।

চতুর্থ ;—দেশশ্রেষ্ঠ গ্রামাধ্যক্ষ "শতহলি"—আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ; তাঁকে দিয়ে আমি···জনপদ ক্ষেপিয়ে,···ঐ গেঁয়ো মিথ্যেবাদী দাম্ভিক দুষ্ট 'অনন্তসীর'-টাকে বধ করাব। কার্যোদ্ধারের জন্যে তিনি আমার আদেশমতো সেনাপতি নিযুক্ত করতে চ'লে গেছেন।"

অচিরেই বিকটবর্মার মুখ থেকে প্রকাশ হয়ে গেল হৃদয়ের গুপ্ত রহস্য। মর্মগ্রহণ ক'রে বললুম—

"তা হ'লে তোমার এইখানকার আয়ুঃ এইখানেই রইল ; এবার লাভ কর কর্মধারার সমীচীন গতি।"

ব'লেই ছুরিকা দিয়ে তাঁকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেললুম। দেহখানিকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে,···ঘৃতস্ফীত হয়ে সম্মুখেই জ্বলছিল হোমানল···আহুতি দিয়ে দিলুম রাজদেহ। ছাই হয়ে গেল।

ফিরে গেলুম হৃদয়বল্লভা কল্পসুন্দরীর কাছে। তখনও বেচারী বিহ্বলা হয়ে কাঁপছেন···ভয়ে। স্ত্রীলোকের স্বভাবই ঐ। আশ্বস্তা ক'রে, হাত দুখানি ধ'রে, তাঁকে নিয়ে গেলুম তাঁর ঘরে। মহাদেবীর আদেশ পেয়ে দৌড়ে এল অন্তঃপুর। সেবা-শুশ্রূষার সে এক বিলাস! কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলুম বিস্ময়মানা বিলাসিনীদের সাহচর্যে, তার পরে বিদায় দিয়ে দিলুম অন্তঃপুরিকাদের। কিন্তু কল্পসুন্দরী তখনও··· সংহতোরু। তখনও···এত ভয় তাঁর বুকে! বাহু দিয়ে বাহু জড়িয়ে, 'উরূপপীড়'-মুদ্রায় তাঁকে কত যে নিপীড়িত আলিঙ্গন করলুম, তার ইয়ত্তা নেই। সোহাগে, আলিঙ্গনে আকুল হয়ে উঠলেন তিনি।

রাত শেষ হয়ে আসছে। নতুন ফুলশয্যায় প্রভাত ক'রে দিলুম রজনী।

কল্পসুন্দরীর কাছ থেকে রাত্রেই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে ছিলুম রাজ-পরিবারের আচার-ব্যবহারের সম্পূর্ণ সমাচার। উষা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গলস্নান সমাধা ক'রে মন্ত্রীদের আহ্বান করলুম,—এবং মহাদেবী কল্পসুন্দরীকে সর্বসমক্ষে বললুম—

"আর্যে, রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেছে স্বভাবের। বিষান্ন দিয়ে যাঁকে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলুম, তিনি আমার পিতৃস্থানীয়। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক। স্বরাজ্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্ত-প্রভৃতি লাভ করবেন পুত্রের শুশ্রূষা। পিতৃহত্যার চেয়ে নারকীয় আর কিছু নেই।"

ভ্রাতা বিশালবর্মাকে আহ্বান ক'রে বললুম—

"বৎস, পুণ্ড্রদেশে এখন দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ। যে রাষ্ট্র সুভিক্ষ নয়, সেখানে অভিদ্রব করা অসমীচীন। অতএব বীজপ্রক্ষেপের পর শস্যশালী পুণ্ড্রদেশে অভিযান করা সঙ্গত। এখন জয়যাত্রা স্থগিত থাক্।"

নাগরিক-বৃদ্ধ দুটিকে ডাকিয়ে মিষ্টালাপে তাঁদের বললুম—

"দেখুন, মহার্ঘ বজ্রমণিটি আমি স্বল্পমূল্যে···নিতে চাই না। ধর্মরক্ষা হবে না। অনুগুণ মূল্য দিয়েই আশা করি আপনারা সেটিকে খরিদ করবার ব্যবস্থা করবেন।"

তারপরে রাষ্ট্রমুখ্য শতহলিকে কাছে ডেকে বললুম—

"দেখ ভাই, অনন্তসীরকে বিনাশ করতে চেয়েছিলুম; অনন্তসীর ছিল প্রহারবর্মার সপক্ষে। প্রহারবর্মাই যখন পূর্বাবস্থায় ফিরে এসে আমার পিতৃতুল্য হলেন, তখন আর অনন্তসীরকে খুন করার সার্থকতা কোথায়?"

আভিজ্ঞানিক পরিচয় পেয়ে মন্ত্রীদের মন থেকে সন্দেহের শেষ লেশটুকুও মুছে গেল। তাঁরা দুলতে লাগলেন বিস্ময়ের তরঙ্গে। শত

মুখে প্রশংসা করলেন আমার এবং মহাদেবী কল্পসুন্দরীর। ঘোষণা ক'রে দিলেন মন্ত্রের মহিমা এবং শুভ ফল। পিতা এবং মাতাকে বন্ধন-মুক্ত ক্'রে, তাঁদের প্রত্যর্পণ করা হ'ল রাজত্ব।

আমি তখন ধাত্রী-মাতাকে পাঠিয়ে···পিতৃদেবকে জানালাম আমার প্রচেষ্টার পূর্ণ ইতিহাস এবং পরিণতি। তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। তাঁদের চরণসেবার অনুজ্ঞালাভ ক'রে আমি এখন অভিষিক্ত হয়েছি যৌবরাজ্যে। ইদানীং আমি আমার ক্ষিপ্রগতি সৈন্যচক্র নিয়ে ···চম্পানগরে চলেছিলুম। পিতৃবন্ধু সিংহবর্মার পত্রে জানতে পাই··· চণ্ডবর্মা আক্রমণ করেছেন চম্পানগর। অভিযানে শত্রুবধ এবং মিত্ররক্ষা—দুটি ফলই ফলবে। বন্ধু, সেই সূত্রেই হঠাৎ এখানে আমার আসা, এবং দর্শন-পাওয়া···লক্ষ্মী-সনাথ আপনার পাদপদ্মের। এ যেন আনন্দের মহোৎসব।

উপহারবর্মার কাহিনী শুনে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে রাজবাহন বললেন,—

"ছল-কপট ক'রে, পরের বৌ নাচিয়ে, রাজ্যের ভোগ-দখল···পাপ হ'লেও এস্থলে ধর্মার্থের পুষ্টিই সাধন করেছে। হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে গুরুজনদের শৃঙ্খলমোচনের,···দুষ্টশত্রুর বিনাশের। কল্যাণ হবেই, শ্রীবৃদ্ধি হতেই হবে···মানুষ যদি নিজে একটু বুদ্ধি খেলিয়ে চলে।"

তারপর অর্থপালের মুখের উপর···স্নিগ্ধ এবং দীর্ঘ···দুটি নয়ন রেখে সহাস্যে আদেশ দিলেন—

"এবার তা হ'লে, আপনি বলুন আপনার আত্মচরিত।"

বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বলতে লাগলেন অর্থপাল···

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

অর্থপাল-চরিত

রাজকুমার, সুহৃদেরা যা করেছিলেন আমিও তাই ক'রে ছিলুম। সমান কাজ। সমুদ্রের বেড়-দেওয়া এই পৃথিবীটাতে কী ঘোরানটাই না ঘুরেছি!

ঘুরতে ঘুরতে শেষে একদিন উপস্থিত হই বারাণসীতে,·· কাশীপুরীতে।

গঙ্গার তীর। মণিকর্ণিকার ঘাট। টুকরো টুকরো মণির মতো ঝকঝকে জল। ভগবান অন্ধক-মথন অবিমুক্তেশ্বরকে···প্রদক্ষিণ ক'রে, প্রণাম সেরে···ঘুরছি। চোখে পড়ল···এক বিরাট মানুষ! যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। লোহার মুগুরের মতো বলিষ্ঠ দুটো বাহু দিয়ে, নিজেকে জড়াচ্ছেন আর কাঁদছেন। কাঁদছেন তো কাঁদছেন-ই। তামার মতো লাল হয়ে ফুলে উঠেছে চোখ। ভাবতে লাগলুম—

"লোকটির চেহারা···কর্কশ···দুর্ধর্ষ। অথচ চোখের তারা···ম্লান, যেন বৃষ্টি ঝরাচ্ছে দীনতা। প্রথম-দর্শনেই মনে হয়, সাহসের ব্যাপার কিছু ঘটিয়েছেন; অথচ নিজের প্রাণের উপর মমতা বা স্পৃহা, এমন তো কই কিছু দেখছি না। নিশ্চয়ই প্রিয়জন কেউ মরেছে। জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখি। সাহায্যের অবসর···"

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—

"মহাশয়, আপনার চেহারা দেখে এবং আপনার আচার-ব্যবহারের প্রকাশ দেখে আমার মনে একটু জিজ্ঞাসা···অর্থাৎ কিনা সাহসের সঞ্চার হয়েছে। যদি গোপনীয় না হয়, তা হ'লে শোকের কারণ যদি···বলেন···"

অনেকক্ষণ, ভাল ক'রে তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। শেষে বললেন—"তাতে আর দোষ কি! তবে শুনুন।"

এই ব'লে করবীগাছের তলায় আমাকে নিয়ে বসলেন। বলতে লাগলেন কথা—

"'মহাভাগ, এই যে আমাকে আপনি দেখছেন, এই আমি এক কালে পূর্বাঞ্চলে স্বেচ্ছাচারীর মতো ঘুরে বেড়াতুম। আমার নাম 'পূর্ণভদ্র'। জনৈক সমৃদ্ধ গৃহস্থের আমি পুত্র। অনেক যত্ন অনেক খরচ-পত্তর ক'রে আমায় মানুষ করলেন পিতৃদেব, কিন্তু দৈবের অনুগ্রহে আমার বৃত্তি হয়ে দাঁড়াল চৌর্য।

কাশী-পুরীতে এক বৈশ্য-শ্রেষ্ঠের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে বমাল ধরা পড়ি। বিচার হয়। রাজদ্বারের গোপুরমের উপরতলায় মহামন্ত্রী 'কামপাল' দেখতে এলেন শাস্তি। তাঁর আদেশমতো হিংসা-বিহারী একটি মত্তহস্তীকে, নাম 'মৃত্যুবিজয়'—আমাকে বধ করবার জন্যে নিয়ে আসা হ'ল। শুঁড় উঁচু ক'রে আমার দিকে ধেয়ে এল হাতী। ঢং ঢং ক'রে গলার ঘণ্টা দ্বিগুণ বাজছে; সঙ্গে সঙ্গে জনতার হৈ-হৈ। হুঙ্কার দিয়ে আমিও নির্ভীক ভাব দেখিয়ে···হাতীটাকে আক্রমণ করি ক্ষিপ্র। শুঁড়টি না বাঁকিয়ে,···কাঠের-ভিতরে-আঁটা আমার এই লোহার মতো হাত দুখানা শুঁড়ের নীচে না ঢুকিয়ে···প্রচণ্ড প্রহার করি হাতীকে। দাঁতাল হাতী ভড়কে যায়, থমকে দাঁড়ায়। মাহুত রেগে টং। বচন, অঙ্কুশ আর গোড়ালির দারুণ প্রহারে হাতীটাকে উত্তেজিত করতে করতে আবার আমার দিকে ফেরায়। আমিও তখন দ্বিগুণ-ক্রোধে ভীম নিনাদে আঘাত করলুম হাতীকে পুনর্বার। ঘুরে হাতী পালাল। পিছনে পিছনে দৌড়লুম। ক্রুদ্ধ মাহুত হাতীটাকে রুখে নিল। ধমকে উঠল—"বেটা হাতীর অধম, মরতে চলেছিস কোথায়!" ধারালো অঙ্কুশখানা···হানল হাতীর চোখের কোলে, মুখ ফেরাল হাতীর। আমিও চীৎকার দিয়ে বললুম—"নিয়ে

যা তোর হাতীর পোকাটাকে।" অন্য হাতী থাকে তো নিয়ে আয়। বেটাকে মেরে আমি পথ দেখি। আমার সেই উদ্‌গর্জন শুনে, আর দুর্দান্ত মূর্তি দেখে, মাহুতের নিষ্ঠুর আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে, হাতী···রড়ে পালায়। মহামন্ত্রী তখন আমাকে ডাকিয়ে পাঠান, এবং বলেন—

"ভদ্র, হিংসাবিহারী 'মৃত্যুবিজয়'কে সাক্ষাৎ মৃত্যু ব'লেই জানতুম; তাকেও তুমি এই রকম ক'রে ছেড়েছ! আশ্চর্য! হাত যাতে ময়লা হয়, এমন কর্ম ছেড়ে দিয়ে সভ্যবৃত্তি অবলম্বন করা তোমার উচিৎ।"

আমি যখন যথাজ্ঞাপালনের প্রতিশ্রুতি দিলুম, তখন আমার উপর মহামন্ত্রীর আদেশ হ'ল ;···মিত্রের মতো।

তারপরে একদিন···আমি তখন মহামন্ত্রীর বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছি···একলা পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলুম···তাঁর জীবনের চরিত-কথা। নিজের মুখে যা বললেন তা এই ঃ

' "কুসুমপুর"-এর শত্রুঞ্জয়ী রাজার একটি মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম 'ধর্মপাল'! তিনি বিশ্রুত-কর্মা, এবং শ্রুতর্ষি। তাঁর পুত্র 'সুমিত্র'। প্রজ্ঞাগুণে তিনিও পিতার সমান। আমি 'কামপাল', তাঁরই বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভাই। দাদা ছিলেন বিনয়রুচি, আর আমি হয়ে উঠলুম বারাঙ্গনা-ব্রতী। কত বারণ করতেন, বাধা দিতেন; কিন্তু দুর্নীতি কখনও বারণ মানে না। শেষে ঘর ছেড়ে পালাই। দিকে দিকে ফিরতে থাকি কামচরের মতো। একদা উপস্থিত হই এই বারাণসীরই এক প্রমোদবনে।

উপবনে সেদিন মদন-দমন মহাদেবের আরাধনা করতে এসেছিলেন কাশীরাজ 'চণ্ডসিংহের' কন্যা 'কান্তিমতী'। সখীসঙ্গে কন্দুক-ক্রীড়ায় ছিলেন ব্যস্ত। তাঁকে দেখে···আমি···আতুর হয়ে পড়ি কামনায়। যাক্, সে অনেক কথা; কোনরকমে তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়। কুমারী-পুরীতে গুপ্ত প্রণয়ের ফলে তিনি আপন্ন-সত্ত্বা হন। একটি ছেলেও জন্মায়।···ছেলে হয়েছে,···পাছে এই

রহস্যটির নির্ভেদ হয়ে যায়,⋯ভয়ে পরিজনেরা⋯ক্রীড়াশৈলে ফেলে দিয়ে আসে ছেলেটিকে। শবরী সেটিকে তুলে নিয়ে লুকিয়ে রেখে আসে শ্মশানের এক পাশে। তারপরে নিশীথে⋯রাজবীথি দিয়ে লুকিয়ে সে ফিরছে, আরক্ষিক পুরুষেরা তাকে পাকড়াও করে। তর্জন-গর্জন করে; সাজার ভয় দেখায়। শবরী বেচারী⋯প্রকাশ করতে বাধ্য হয় রহস্য।

নিশ্চিন্তে⋯আরামে⋯নিদ্রা দিচ্ছিলুম ক্রীড়াশৈলের গুহাগৃহে। সেইখানে শবরী আমাকে রাজ-আজ্ঞায় ধরিয়ে দেয়। দড়ি দিয়ে বেঁধে আমাকে নিয়ে আসা হ'ল শ্মশানে। চণ্ডালের হাতে উদ্যত কৃপাণ! যেই আমাকে কাটবার জন্য উল্লসিত হয়েছে কৃপাণ, অমনি⋯নিয়তির এমনি লীলা⋯হঠাৎ খুলে যায় আমার বন্ধন। মুহূর্তের মধ্যে চণ্ডালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিই কৃপাণ, কেটে ফেলি অন্ত্যজটাকে। তারপর শবরীটাকে প্রহার করতে করতে হাওয়া হয়ে যাই।

বনে বনে ঘুরছি, সম্পূর্ণ অসহায়, আশ্রয়হীন;⋯একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘ'টে গেল।

গভীর অরণ্য। লুকিয়ে ব'সে আছি। হঠাৎ সেখানে উদয় হলেন⋯দেবীর মতো চেহারা⋯অশ্রুমুখী এক কন্যা। তাও আবার সপরিবার। মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে বিলোল কুন্তল। অঞ্জলির পল্লব দিয়ে মুখখানিকে অলঙ্কৃত ক'রে মাথা ছুঁইয়ে প্রণিপাত করলেন—আমাকে। তার পরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাণ্ড এক অরণ্যবটের স্নিগ্ধ ছায়ায় এসে বসলেন।

অশান্ত কুতূহলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—কে আপনি, কোথা থেকে এলেন, কী কারণেই বা আমার উপর এই প্রসন্নতার বর্ষণ? প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বললেন, আহা—সে যেন এক মধুধারার বাণীময় বর্ষণ!

"নাথ, যক্ষনাথ 'মণিভদ্রে'র আমি দুহিতা, 'তারাবলী' আমার

নাম। অগস্ত্যপত্নী দেবী লোপামুদ্রাকে নমস্কার ক'রে আমি সেদিন ফিরে আসছিলুম মলয়গিরি থেকে। বারাণসীর নিকটে আসতেই শ্মশানে আমার চোখে পড়ে—ফুটফুটে একটি ছেলে; বেচারী কাঁদছিল। তীব্রস্নেহ আমাকে উতলা করে। ছেলেটিকে কোলে নিয়ে দ্রুত পৌঁছে যাই পিতামাতার চরণে। পিতৃদেব আমাকে সঙ্গে নিয়ে অলকেশ্বরের পুণ্যধামে উপস্থিত হন। কুবের—তিনি মহাদেবের বন্ধু, আমাকে আহ্বান ক'রে প্রশ্ন করেন,—

'কন্যা, এই শিশুটির প্রতি তোমার চিত্তে কী ধরনের ভাবোদয় হয়েছে?'

উত্তর দিই—'বাৎসল্য ভাব। এই ছেলেটি যেন আমার নিজের পেটের ছেলে।'

যক্ষনাথ বলেন—'কল্যাণি, সত্য কথাই বলেছ।'

তারপরে তিনি আমায় শোনান এই ব্যাপারের মূলতত্ত্ব। সে এক অতি মহতী কথা। জেনে রাখুন—

শৌনক শূদ্রক, এবং কামপাল—অভিন্ন। বন্ধুমতী, বিনয়বতী ও কান্তিমতী—অভিন্না। বেদবতী, অর্যদাসী ও সোমদেবী—একই! হংসাবলী, শূরসেনা ও সুলোচনা—অনন্যা। নন্দিনী, রঙ্গপতাকা ও ইন্দ্রসেনা—পৃথক্ নন। এবং শৌনক যাঁকে অগ্নি সাক্ষী ক'রে আত্মসাৎ করেছিলেন সেই গোপকন্যাই পরজন্মে হন অর্যদাসী এবং তার পরের জন্মে 'তারাবলী'।

তারাবলীই আমি।

যখন আপনি শূদ্রক ছিলেন, এবং আমি যখন অর্যদাসী,...তখন আমার গর্ভে এই ছেলেটি জন্মায়। বিনয়বতী তাকে লালন করেন। বিনয়বতী আবার যখন পরের জন্মে কান্তিমতী হন, তখন স্নেহবাসনার হঠকারিতায় কান্তিমতীর গর্ভে জন্ম নেয় ঐ ছেলেটিই। অনেক মৃত্যুমুখ থেকে পরিভ্রষ্ট এই ছেলে। তাকে আমি কুড়িয়ে পাই।

তখন অরণ্যে তপস্যানিরত ছিলেন রাজহংস,...দেবী বসুমতী

ছিলেন সঙ্গে। একপিঙ্গের আদেশে তাঁদের পুত্র···ভাবি চক্রবর্তী··· রাজবাহনের পরিচর্যায় ছেলেটিকে আমি সমর্পণ ক'রে দিয়ে আসি।

"'এদিকে দেখি আপনার কৃতান্ত-যোগ। গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে আপনার চরণপ্রান্তে আজ এসেছি। আপনি এখন কৃতান্ত-মুখ-ভ্রষ্ট।'

"বাক্যহারা হয়ে সব শুনলুম। ইনি তো তা হ'লে আমারি··· বহুজন্মের রমণী! থাকতে পারলুম না। বার বার কতবার যে তাঁকে আলিঙ্গন করলুম তার স্থিরতা নেই। মুহুর্মুহুঃ সান্ত্বনা দিলুম, সৌভাগ্য পেলুম। আমার মুখ বেয়ে ঝরতে লাগল আনন্দিত অশ্রু। যক্ষকন্যা তারাবলী তখন অরণ্যের মধ্যিখানেই,···আত্মপ্রভাবে··· অকস্মাৎ রচনা ক'রে ফেললেন মহীয়ান এক মন্দির। অহর্নিশি অনুভব করতে লাগলুম ইন্দ্র-দুর্লভ ভোগ।

"দুটি তিনটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। মত্ত-সুন্দরীকে বললুম—

'প্রিয়ে, আমার প্রাণদ্রোহী···ঐ চণ্ডসিংহের কিঞ্চিৎ প্রত্যপকার ক'রে আমি অনুভব করতে চাই বৈর-নির্যাতনের সুখ!'

"তারাবলী হাসতে হাসতে বললেন—

'কান্ত, তবে চলুন কান্তিমতীকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

"তখন অর্ধরাত্রি। ঘনান্ধকার ভেদ ক'রে অকস্মাৎ আমাকে রাজার বাস-গৃহে নিয়ে এলেন তারাবলী। চণ্ডসিংহ তখন ঘুমোচ্ছেন। তাঁর মাথার কাছে রাখা রয়েছে ··তলোয়ার। মুঠোর মধ্যে সেটিকে ধ'রে···রাজাকে জাগালুম। আমাকে দেখেই থর থর ক'রে তিনি কাঁপতে লাগলেন। বললুম—

'আমি আপনার জামাতা। আপনার বিনা-অনুমতিতেই কন্যাভিমর্শন করেছি। অপরাধ-ক্ষালনের উদ্দেশ্যে আজ এসেছি।'

"তিনি তো ভয়ে কাঠ! হাতজোড় ক'রে বললেন—

"আমি মূঢ়। অপরাধ আমারি। যিনি আমার কন্যাকে বরণ ক'রে আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখালেন,...আমি এমনি মূঢ় গ্রহগ্রস্তের মতো সীমা লঙ্ঘন ক'রে তাঁরই কিনা প্রাণবধের আদেশ দিতে গিয়েছিলুম! আজ থেকে...আমি আদেশ দিচ্ছি...কান্তিমতী আপনার হোলো, এবং এই রাজ্য ও আমার জীবন আপনার...অধীন।"

"পরের দিন মহারাজ চণ্ডসিংহ প্রজাপুঞ্জকে আহ্বান করলেন এবং কান্তিমতীর সঙ্গে বিধি মতো আমার বিবাহ দিয়ে দিলেন। তারাবলীও ধীরে ধীরে কান্তিমতীর কর্ণগোচর করলেন তাঁর শিশুপুত্রটির বৃত্তান্ত...তাঁকে শোনালেন সোমদেবী, সুলোচনা আর ইন্দ্রসেনার জন্মজন্মান্তরের মহতী কথা।

"সেই থেকে, যদিও আমি লাভ করেছি মন্ত্রীর পদ, তবু সেটি নামেই; আসলে আমি হয়ে রয়েছি যুবরাজ। বিলাসিনীদের নিয়ে... আনন্দে আছি।"

কামপাল-কাহিনী সমাপ্ত ক'রে পুনর্বার ব'লে যেতে লাগলেন পূর্ণভদ্র :—

"এই সব অন্তরঙ্গ আলাপের মাধ্যমে মহামন্ত্রী এবং আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেল মৈত্রীর একটি স্থায়ী সম্পর্ক। সর্বভূতেই তাঁর উদার স্নেহ। সকলেরই তিনি বন্ধু। আমার মতো একটি জন্তুরও পরিচর্যায় সুখী হয়ে উঠল তাঁর মন।

'তারপর একদিন তাঁর শ্বশুর চণ্ডসিংহ 'অলসক' (ডিসপেপসিয়া) রোগে ভুগতে ভুগতে স্বর্গে চ'লে গেলেন। শ্বশুরের স্বর্গবাসের পূর্বেই মন্ত্রীর প্রথম শ্যালক চণ্ডঘোষ...অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি-হেতু যক্ষ্মা-রোগে ভুগে ভুগে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় শ্যালক 'সিংহঘোষ'...তখন তাঁর মাত্র পনর বছর বয়স...তাঁকেই মহামন্ত্রী কামপাল রাজপদে অভিষিক্ত করিয়ে দিলেন। সাধুর মতোই কাজটি

হ'ল এবং মহামন্ত্রীর সেবায় পরিপুষ্ট হয়ে শ্রীবৃদ্ধি পেতে লাগলেন নাবালক নরপতি।

"কিছুদিন এইভাবে কাটল। রাজার যৌবনটিকে উন্মাদিত ক'রে, ক্রমে·· বসন্তদিনের কৃষ্ণভৃঙ্গের মত···আশেপাশে জটলা বাঁধল অন্তরঙ্গ কয়েকটি বয়স্য। গুঞ্জন উঠল দুর্মন্ত্রণার এবং বয়স্যদের মুখে অবাধে প্রবাহিত হতে লাগল খলতার নগ্ন ভাষা। সিংহঘোষের কান ভাঙাতে দেরি হোলো না তাঁদের। বয়স্যদের কথার ধারাই কেমন যেন অন্যধরনের। যেমন—

"কামপালটা একটা ভুজঙ্গ। জগতের কে না জানে—ঐ ভুজঙ্গটিই আপনার বোনের ধর্ম-নাশ করেছেন?—ঐ ডাকাতটাই তো একদিন রাত্রে···তখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন আপনার পিতৃদেব,···খোলা তলোয়ার হাতে···রাজাকে হত্যা করতে যান! প্রাণের দায়ে, নিজের সাধের কন্যাকে লম্পটের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন মহারাজ। এ সব কি সখা, মিছে কথা?

"আপনার বড় ভাই চণ্ডঘোষ···দেবতার মতো মানুষ···ঐ পাপীটিই কি তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করান নি? তারপরে আপনাকে · তখন আপনি নাবালক, অসমর্থ,···পরমাগ্রহে বসিয়ে দিলেন সিংহাসনে। কেন জানেন? প্রজাপুঞ্জকে হাতে রাখতে হবে, তাই! আজও অভিনয় চলেছে সাধুতার! এখনও পর্যন্ত মারাত্মক কিছু করেন নি, আপনাকে উপেক্ষা ক'রেই চলেছেন; কিন্তু রাজা, অদূর ভবিষ্যতে ঐ মতলব-বাজ মহা-কৃতঘ্ন, আমরা ব'লে রাখছি, আপনাকে যমালয়ে না পাঠিয়ে ছাড়বেন না। কেবল যক্ষিণীর ভয়েই এখনও হাট বসাতে পারেন নি পাপের।

"এই ধরণের কথায় সিংহঘোষের মনে যে একটা সন্দেহ জাগবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সন্দেহ না জাগাটাই আশ্চর্য!

"কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজমহিষী 'সুলক্ষণা' দেবীর চোখে পড়ল—ননদিনী কান্তিমতীর চেহারাটিতে কেমন যেন এক

ভাবান্তর! অতএব প্রণয়ের আতিশয্য দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

'কী হোলো আপনার? বাজে কথা ব'লে কিন্তু আমায় ঠকাতে চেষ্টা করবেন না। ম্লান পদ্ম দেখতে কি কারো ভালো লাগে?'

"উত্তর দিলেন কান্তিমতী—

"'কোনোদিন কোনো বাজে কথা ব'লে তোমার মন ভুলিয়েছি ব'লে তো মনে পড়ে না। এটি আমার সখী ঐ সতীন তারাবলীর কীর্তি। বিজনে দুজনে ছিলেন। কী যে দুর্বুদ্ধি হ'ল স্বামীটির। তারাবলীকে ডাকতে গিয়ে আমার নামটি ধ'রেই তাঁকে ডেকে ফেললেন। গোত্রস্খলন! মহা অপরাধ! ভেঙে গেল প্রণয়। পায়ে ধ'রে কত সাধলুম। কিন্তু কোন কিছুরই অপেক্ষা না রেখে, রাগে রীষে জ্বলতে জ্বলতে,·· তারাবলী প্রস্থান করেছেন। সেই থেকে সংসার আঁধার দেখছেন স্বামী। মনটা তাই আমার ভাল নেই।'

"সিংহঘোষকে একান্তে আহ্বান ক'রে এই গোপন খবরটুকু জানিয়ে দিলেন সুলক্ষণা। সিংহঘোষও সেই থেকে লক্ষ্য করতে লাগলেন কামপালকে।

"প্রিয়তমার বিরহে সত্যিই পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল কামপালের শরীর। স্তম্ভিত অশ্রু, বিহ্বল দৃষ্টি। নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় শোষিত হয়েই যেন তাঁর মুখ থেকে বেরুতে থাকৃত রুক্ষবাণী। রাজকার্যে কেমন যেন এক ছন্নছাড়া ভাব! মন্ত্রীর এই পরিবর্তনের কিন্তু অন্যবিধ অর্থ ক'রে বসলেন সিংহঘোষ। কালবিলম্ব না ক'রে পূর্বসঙ্কেতিত পুরুষদের দিইয়ে সহসা বন্দী করালেন মহামন্ত্রীকে, নিক্ষেপ করলেন কারাগারে।

"রাজ্যপদের স্থানে স্থানে, প্রজাপুঞ্জের অবগতির জন্য, ঘনঘটা ক'রে পূর্বেই ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছিল কামপালের দোষাবলী; এবং অধুনা আরো প্রকাশ করা হয়েছে···কামপালের দুটি চক্ষুই উৎপাটিত করা হবে।

"কিন্তু মহাশয়, আমার সন্দেহ হচ্ছে চোখ-ওপড়ানোর মূলে রয়েছে মন্ত্রীর মৃত্যু।

"তাই একান্তে ব'সে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে চোখের জল ফেলছি, আর ভাবছি···কেমন ক'রে একটা মহাপ্রাণ বাঁচাই। অকারণ-বন্ধু, কী এখন এর উপায় করি?"

শেষ হ'ল পূর্ণভদ্রের বিবৃতি।

"রাজকুমার, পিতৃদেবের ঘোর বিপদের কথা শুনে, আমার চোখে তখন থই থই করছে জল। পূর্ণভদ্রকে বললুম—

" 'সৌম্য, আপনার কাছে আর গোপন রেখে কী হবে? দেব রাজবাহনের শুশ্রূষার অভিলাষে, রাণী বসুমতীর হস্তে যে শিশুপুত্রটিকে একদিন এক যক্ষকন্যা ন্যাসরূপে অর্পণ ক'রে এসেছিলেন—আমিই সেই পুত্র। অস্ত্রধারী সহস্র বীরকেও হত্যা ক'রে পিতৃদেবকে মুক্ত করবার ক্ষমতা আমি রাখি। সে বিশ্বাস আমার আছে এবং আমি তা করব। দাঙ্গার সময় যদি একটি ছোট্ট ছোরাও পিতার গায়ে এসে লাগে, তা হ'লে জেনে রাখবেন—আমার সমস্ত প্রচেষ্টাই ভস্মে ঘি ঢালার মতোই হয়েছে,···'

"···বলছি, এমন সময় দেখি—একটা প্রকাণ্ড বিষধর···পাঁচিলের ফাটল থেকে···মাথা বের করছে! মন্ত্রৌষধির বলে আমি টপ ক'রে সাপটাকে ধ'রে ফেললুম। ত্রস্ত পূর্ণভদ্রকে বললুম,—

" 'মহাশয়, এবার দেখছি···সিদ্ধ হবেই হবে আমার অভীষ্ট। হট্টগোলের মাঝখানে পিতাকে লক্ষ্য ক'রে, এই সাপ···ছাড়ব। কোথা থেকে সাপ পড়ল, কেউ বুঝে উঠতে পারবে না। সাপ—দংশাবে। কিন্তু আমি তখনি এমন ক'রে বিষের ক্রিয়া স্তম্ভিত ক'রে দেব, যাতে ক'রে লোকে মনে করে···কামপাল মরেছেন। কিন্তু বন্ধু, আপনাকে তখন লজ্জাভয় ছেড়ে আমার মায়ের কাছে দৌড়ে যেতে হবে। বিশদভাবে মাকে বুঝিয়ে বলতে হবে—'

"রাণী বসুমতীর হাতে একদিন এক যক্ষিনী....যে শিশুপুত্রটিকে

গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন…আপনার সেই ছেলে…এখানে এখন উপস্থিত হয়েছেন। আমার কাছে পিতার শোচনীয় অবস্থার বিবরণ শুনে, বুদ্ধি খেলিয়ে….সর্প-দংশনে,…এই মুহূর্তে তিনি তাঁর কল্প-মৃত্যু ঘটাচ্ছেন। আপনাকে কিন্তু…এখনি লজ্জা ভয় জলাঞ্জলি দিয়ে ডেকে পাঠাতে হবে রাজাকে।—তাঁকে বলতে হবে—

"'বন্ধুই হোন, অবন্ধুই হোন—যিনি দোষী, নিরপেক্ষভাবে তাঁর নিগ্রহ করাই—ক্ষত্রধর্ম। তেমনি স্ত্রীধর্মও বলে,—স্বামী দোষী হোন বা নির্দোষ হোন, তাঁর নিয়তির অনুসরণ করাই স্ত্রীর কর্তব্য। তাই স্থির করেছি, স্বামীর চিতাগ্নিতে ঝাঁপ দেব। যাঁরা অভিজাত, তাঁদের পক্ষেই উপযুক্ত এই অন্তিম বিধান।'

"এই রকম ক'রে বললে নিশ্চয় রাজা অনুমতি দেবেন। তার পরে মহামন্ত্রীর সর্পাহত দেহখানিকে…নিজেদের বাড়িতে আনিয়ে নিতে দেরি করবেন না যেন। নিভৃত স্থানে,…উঁচু কানাত দিয়ে ঘেরাও ক'রে কুশের একটি শয্যা রচনা করিয়ে শুইয়ে রাখাবেন দেহখানিকে। আর দেখবেন…অনুমরণের বসনভূষণ প'রে…স্বয়ং যেন আপনি উপস্থিত থাকেন সেখানে।"

"এবার বুঝেছেন, বন্ধু…আমি তখন পিতৃদেবের বহিঃকক্ষে আসব, —এবং আপনাকেই দরজা খুলে আমাকে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে সেই নিভৃত স্থানে। পিতৃদেবকে আমি উজ্জীবিত করব। পরে যা করণীয়, পিতার অভিরুচি অনুসারেই করব।"

কথা শুনে পূর্ণভদ্রও, 'তাই হবে, তাই হবে' ব'লে আনন্দে লাফাতে লাফাতে প্রস্থান করলেন বেগে।

ঘোষণাস্থানে আমিও পৌঁছে গেলুম। সেখানে দেখি—বিরাট ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তেঁতুল গাছ। মোটা লম্বা ডালের আড়ালে দেহগুপ্তি ক'রে ব'সে রইলুম। দেখতে দেখতে গাছের উচ্চস্থানগুলিকে অধিকার ক'রে বসল—আরো অনেক স্থানীয় লোক।

একটু বাদেই, চোরের মতো পিছমোড়া ক'রে দুহাত বেঁধে, চণ্ডালেরা আমার পিতাকে নিয়ে এল। হট্টরোল তুলে পিছনে পিছনে এলেন নগরীর বহু মহামান্য ব্যক্তি।

যেখানে বসেছিলুম তার খুব নিকটেই অপরাধীকে এনে দাঁড় করাল চণ্ডাল। তারপর উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল···তিনবার ঃ—

"অবধান করুন।—

"ইনি আমাদের মহামন্ত্রী কামপাল। রাজ্যলোভে উন্মত্ত হয়ে ইনি মহারাজ চণ্ডসিংহকে এবং যুবরাজ চণ্ডঘোষকে তিলে তিলে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছেন। আমাদের দেবতা সিংহঘোষ পূর্ণযৌবন লাভ করাতে ইনি পুনর্বার পাপাচরণের বাসনায় অবিশ্বাসী পূর্ব-মন্ত্রী শিবনাগকে, এবং 'হূণ' ও 'অঙ্গারবর্ষ' নামক দুটি প্রসিদ্ধ গুণ্ডাকে রাজ-হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তাঁরা রহস্যের নির্ভেদ ক'রে দিয়েছেন। বিচারপতি দণ্ডাদেশ দিয়েছেন —'রাজ্যকামুক এই ব্রাহ্মণের চক্ষুঃদ্বয় উৎপাটিত করা হউক এবং ততঃপর ইঁহাকে অন্ধগৃহে নিক্ষেপ করা হউক।'

"অতএব চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটনের জন্য অদ্য এই অপরাধীকে এইস্থানে আনয়ন করা হয়েছে। অন্যান্য অপরাধের সমাদিষ্ট দণ্ডগুলিও যথাযথভাবে রাজাদেশ অনুসারে প্রযোজিত হবে।—"

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে উঠলেন মহামান্য ব্যক্তিগণ। আমিও অবসর বুঝে অকস্মাৎ পিতৃ-অঙ্গে ছুঁড়ে মারলুম···জাগ্রত-ফণা সেই বিষধর। 'কি হল, কি হল' ব'লে সোরগোল তুলল জনতা। আর চক্ষের নিমেষে আমিও ড্াল থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মিলিয়ে গেলুম জনতার মধ্যে। শঙ্কিত মূর্তি নিয়ে পরমূহূর্তেই পিতার দেহের পাশে গিয়ে বসলুম। ক্রুদ্ধ সর্পের দংশনে পিতার দেহ তখন মড়ার মতো··· মাটিতে রয়েছে লুটিয়ে। জীবরক্ষ-মন্ত্র দিয়ে স্তম্ভিত ক'রে দিলুম বিষের প্রগতি।

ধীরে ধীরে বিচক্ষণের মতো আওড়াতে লাগলুম—

"সত্যের মার নেই। রাজাকে যিনি অবমাননা করেন, তাঁকে যে দৈবদণ্ড স্পর্শাবে, সে বিষয়ে আর ভুল কি? চক্ষুহীন করবার আদেশ দিয়েছিলেন মর্তের রাজা, প্রাণহীন করবার আদেশ এল দেবের রাজার কাছ থেকে।"

আমার কথা শুনে কেউ কেউ বললেন "ঠিক ঠিক!" আবার কেউ কেউ বললেন "কী যে হয়ে গেল, ছিঃ ছিঃ।"

বিষধর কিন্তু ততক্ষণে চণ্ডালের উপর বিষ ঝেড়েছেন; এবং জনতার 'পালা পালা' রবের মধ্যে দিয়ে বেছে নিয়ে সড়-সড় ক'রে হয়ে গেছেন অন্তর্ধান।

ইতিমধ্যে পূর্ণভদ্র আমার মাতৃদেবীকে জানিয়ে রেখেছিলেন তাঁর যথা-কর্তব্য। নিতান্ত বিহ্বলা হলেও, বিপদের মধ্যে তাই এতটুকুও বিহ্বলতা প্রকাশ করলেন না মা। তুটি চারিটি পরিজন সঙ্গে নিয়ে··· পায়ে হেঁটে···উপস্থিত হলেন ঘোষণাস্থানে। পিতৃদেবের মাথাখানি কোলের উপর তুলে নিয়ে রাজাকে বললেন—

"আমার স্বামী তোমার বিরুদ্ধে সত্যিই কোনো অপরাধ করেছেন, বা, না-করেছেন,···দেবতারা জানেন। সে সব চিন্তায় এখন আর কোন ফলোদয় হবে না। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার যিনি পাণিগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নিয়তির অনুসরণ না করলে, তোমাদের কুলে আমাকে কলঙ্কিনী হয়েই চিরদিন থাকতে হবে। অতএব স্থির অন্তিম করেছি স্বামীর চিতায় আরোহণ করব। আশা করি, অনুমতি দিয়ে আবেদনটি তুমি গ্রাহ্য করবে।"

সিংহঘোষও প্রীতিযুক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করলেন আবেদন। বললেন—

"অগ্নি-সংস্কার যেন কুলোচিত হয়। আশা করি, আমার ভগিনীপতি···স্বর্গধামে উপভোগ করবেন চিতারোহণ-মহোৎসবের অন্তিম সংস্কার সুখ।"

আমি কিন্তু ইত্যবসরে চণ্ডালের দেহ নিয়ে পড়েছি। এমন বিষমন্ত্র প্রয়োগ করেছি, যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ক'রে দেবে অন্য যে কোনো বিষবৈদ্যের আপ্রাণ প্রয়াস। উপস্থিত সকলেই প্রণিধান করলেন,··· সর্পাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন দুজনেই।

মহারাজ সিংহঘোষ···পুনর্বার নিজের মাহাত্ম্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তখন অনুমতি দান করলেন—'কামপালকে তাঁর নিজের প্রাসাদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক'।

ঘোষণাস্থান থেকে পিতৃদেবের দেহখানিকে সরিয়ে আনা হ'ল, এবং যথাযথভাবে শয়ন করানো হ'ল···সেই নিভৃতস্থানটিতে, কুশের সেই বিপুল শয্যায়। তারপরে আমার মা মৃত্যু-আভরণে নিজের দেহখানিকে মণ্ডিত ক'রে শোকের পরিকল্পনার মধ্যে, সখীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; মুহুর্মুহু প্রণাম করলেন গৃহদেবতাকে; এবং পরিজনদের চোখের জল ফেলতে বারণ ক'রে একাকিনী প্রবেশ করলেন পিতার শয়ন-স্থানে।

পূর্ণভদ্র পূর্বেই আমাকে সেখানে রেখে গিয়েছিলেন; এবং আমিও, মাতৃদেবীর শুভাগমনের পূর্বেই, সাক্ষাৎ গরুড়দেবের মতো, নির্বিষ ক'রে উজ্জীবিত ক'রে রেখেছিলুম পিতাকে। মা এসে দেখলেন,·· স্বামী জীবিত! হর্ষ এবং অশ্রুপাত! পতিকে প্রণাম এবং পুত্রকে আলিঙ্গন! দুগ্ধধার-বক্ষে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আশীর্বাদের সে কী বিতরণ-মাধুর্য!

তার পরে অশ্রুজলের ভিতর দিয়ে আমি শুনতে পেলুম মায়ের ভাঙা ভাঙা গলার হর্ষ-স্নাত মিনতি—

"ওরে আমার বাছা, তুই কি জানিস, যেদিন তুই জন্মালি, সেই দিনই তোকে পথে ফেলে দিয়েছিল তোর এই পাপীয়সী মা? যাকে তোর ঘেন্না করা উচিত, তাকে আজ কিনা তুই অনুগ্রহ দেখাতে এলি?

"যমের মুখ থেকে বাপকে ফিরিয়ে এনেছিস, ছেলের উচিত কাজই তুই করেছিস। কিন্তু সত্যিই তারাবালী বড় ক্রূর; তিনি তো তোকে কুড়িয়ে পেলেন, যক্ষরাজ কুবেরের কাছ থেকে তোর সমস্ত ইতিহাস জানলেন; জেনেশুনেও, আমি বেঁচে থাকতেও, আমার কাছে না দিয়ে, দেবী বসুমতীর হাতে···কেন তোকে সঁপে দিতে গেলেন? তা হবে···হয়ত বা তাই তাঁর উচিত ছিল; তাই তিনি করেছেন। তাঁর ভাগ্যের জোরেই তো আমার মতো একটা হতভাগিনী মা···কানে আজ শুনতে পেল···ছেলের মুখের ডাক! তুই অমৃত ঢেলে দিলি আমার কানে। ওরে আয় আমায় জড়িয়ে থাক।"

বলতে বলতে কেমনধারা যেন হয়ে গেলেন মা। কখনও ঘ্রাণ করেন আমার মস্তক, কখনো বসিয়ে নেন আমায় কোলে; কখনও বা গঞ্জনা করেন তারাবলীকে! আর সব সময়েই অশ্রুজলে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন আমাকে। গাছের পাতার মতো থেকে থেকে কাঁপতে থাকে তাঁর দেহ।

আর আমার পিতার অবস্থা? নরক থেকে তিনি যেন দেবলোকে পৌঁছলেন। কী বিপুল বিনষ্টি থেকে কী বিরাট অভ্যুদয়! বন্ধু পূর্ণভদ্রের মুখে সবিস্তর ঘটনা শুনে তিনি যেন মনে মনে গণনা করতে লাগলেন "এইটিই দেবলোক; আমিই ইন্দ্র। ইন্দ্র কি আমার চেয়েও সৌভাগ্যবান্?"

স্বল্পভাষায় পিতার কাছে আমি নিবেদন করলুম আত্মপরিচয়। হর্ষে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তাঁর আত্মা। তারপরে আমি

"এরপর কী আমায় করতে হবে,···আদেশ দিন—।"

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে, পিতৃদেব ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—

"বৎস, আমার এই প্রাসাদে অতিদীর্ঘ···অতিবিশাল···শালের বল্লা দিয়ে ঘেরাও-করা···অক্ষয় অস্ত্রাগার···আছে। অত্যন্ত দুর্ভেদ্য তার গুপ্তি। আর···আমার রয়েছে···বহু বহু উপকৃত সামন্ত। রাজরোষের অকারণ অগ্নিবর্ষণ দেখে বেশির ভাগ প্রজাই···আমি জানি···ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন। আমাকে সহায়তা করবার বাসনায় সহস্র সহস্র বীর তাঁদের বন্ধু, পুত্র, পরিবার নিয়ে ছুটে আসবেন। আসবেনই।···তাই আমার মনে হয়, এই প্রাসাদেই কয়েকটা দিন অপেক্ষা ক'রে, ভিতরে এবং বাইরে, সিংহঘোষের বিরুদ্ধে সত্বর রোষানল প্রজ্বলন করাই আমার এখন কর্তব্য। যাঁরা ক্রুদ্ধ তাঁদের আমি স্বপক্ষে সংগ্রহ করব,···সিংহঘোষের প্রাক্তন শত্রুদের আমি উৎসাহিত করব···সর্বশেষে এই রাজকীয় বংশে নিয়ে আসব কুলধ্বংসী প্রলয়।"

পিতার অভিমতের আমি পূর্ণ সমর্থন করলুম। এবং তারপরেই দুর্গ-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম।

সিংহঘোষও অবগত হলেন সমস্ত বৃত্তান্ত। দগ্ধাতে লাগলেন অনুতাপে। দুর্গ-গ্রহণের বিধান দিলেন। যুদ্ধ বেধে গেল। প্রতিদিন আমাদের হাতে নিহত হতে লাগল অসংখ্য শত্রুসৈন্য।

এই অবকাশে, আমি কিন্তু নিজে একটি · কীর্তি ক'রে বসলুম। পূর্ণভদ্রের মুখ থেকে সিংহঘোষের শয়ন-কক্ষের সংস্থান সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়েছিলুম। এবার নিজের বাসকক্ষের ভিত্তিকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে উরগাস্য যন্ত্রের সাহায্যে একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ··· সময় বুঝে খনন ক'রে ফেললুম গোপনে।

কিন্তু নিশীথে—যখন উন্মুক্ত করলুম সুড়ঙ্গের মুখ, তখন ত্রস্তচক্ষে দেখলুম, রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেনি সুড়ঙ্গ, অন্য একটি কক্ষে এসে থেমে গেছে তার গতি। ত্রস্ত-চক্ষু ক্ষণপরেই মুগ্ধ-চক্ষু হয়ে উঠল। এ কি ভূস্বর্গ দেখছি? মুগ্ধ-চক্ষুর ক্রমে চক্ষু-স্থির হয়ে গেল। এ যে কুমারীর হাট! প্রত্যেকটিই কমনীয়া। কামনার ধন!

অকস্মাৎ আমার মতো একজন পুরুষরত্নের আবির্ভাব দেখে মৃদুস্বরে তাঁরা আর্তধ্বনি ক'রে উঠলেন। কিন্তু সেই রূপের হাটে আমার চোখ তখন আটকে গেছে রূপসী-শ্রেষ্ঠাতে।
হঠাৎ মনে হলো…

এটি তো কন্যা নন,—ইনি বুঝি দক্ষিণ-সমীর-বিকম্পিতা
চন্দন-লতিকা ;
এটি তো কন্যা নন,—ইনি বুঝি আতপ্ত-কাঞ্চন-কান্তি
জ্যোতিঃ-পুত্তলিকা !

আবার মনে হলো,…না না, ইনি মানবী নন।

বুঝিবা রসাতলের অন্ধকারে লাবণ্য ঝরাচ্ছেন
একফালি চন্দ্রিকা ;
বুঝিবা--রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেবী পৃথিবীকা।

আবার মনে প্রশ্নে উঠল,—

তবে কি অসুর-বিজয়ের উদ্দেশ্যে পাতালে অবতীর্ণা হয়েছেন
হরভামিনী ?
কী কারণে…পাতালে নেমে এলেন ভগবান পুষ্পধন্বুর
শ্রীমতী রতিরাণী ?
তবে কি—দুর্মতি রাজাগুলোর দর্শন পরিহার করবেন ব'লে
পাতাল-প্রবেশ করেছেন
রাজ্যের লক্ষ্মীরাণী ?

কিন্তু কোথায় কবিত্ব !—শঙ্কায় অঙ্গনা-সমাজ তখন কাঁপছে।

কন্যাব্যূহ ভেদ ক'রে আমার দিকে এগিয়ে এলেন একটি শুভ্রশীর্ষা স্থবিরা ;—কুসুমিতা যেন কাশযষ্টি। পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে ত্রাস-দীনকণ্ঠে বললেন—

"আমরা অনন্যশরণ, স্ত্রীলোক, আমাদের অভয়দান করুন। আপনি কি কোনো দেবকুমার, অসুর-যুদ্ধের তৃষ্ণা নিয়ে প্রবেশ করেছেন রসাতলে ?" উত্তর দিলুম—

"আমাকে দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। পরিচয় সামান্য। আমার নাম অর্থপাল। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কামপাল আমার পিতা, এবং দেবী কান্তিমতী আমার মাতা। বিশেষ কোনো কার্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের বাসগৃহ থেকে এই রাজগৃহ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে আমাকে বাধ্য হ'তে হয়েছে। আপনারাই বা কে ? আর এই অন্ধকার ভূগর্ভে,...কেমন করেই বা রচনা করেছেন আবাস ?"

হাত জোড় ক'রে বৃদ্ধা বললেন—

"ভট্টারক, আমরা ভাগ্যবতী ;—যেহেতু, চক্ষু দিয়ে আপনাকে শারীরিক স্বস্তিতে দেখতে পাচ্ছি, অক্ষত দেখছি। শুনুন। আপনার মাতামহ চণ্ডসিংহের ঔরসে, ও রাণী 'লীলাবতী'র গর্ভে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডঘোষ আর কান্তিমতী। অত্যন্ত অঙ্গনাসক্ত হয়ে পড়াতে যুবরাজ চণ্ডঘোষের মৃত্যু হয়...যক্ষ্মারোগে। তাঁর ভার্যা 'আচারবতী' তখন সন্তানসম্ভবা। তিনি—এই আমাদের 'মণিকর্ণিকা'র মা। কিন্তু প্রসব-বেদনার অসহ্য জ্বালায় পতিপ্রাণার মৃত্যু ঘটে। তার পরে মহারাজ চণ্ডসিংহ আমাকে গোপনে আহ্বান ক'রে আদেশ দেন—

"'মণিকর্ণিকা বড়ই ঋদ্ধিমতী ও কল্যাণলক্ষণা। আমার বাসনা, —মাতৃহারাটিকে লালন-পালন ক'রে শুভদিন দেখে মালবেন্দ্র-নন্দন দর্পসারের হাতে সম্প্রদান করি। কিন্তু,...কান্তিমতীকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাটির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ছোট ছোট মেয়েদের আর প্রকাশ্যে অবস্থান করাটা আমি সমীচীন ব'লে বোধ করছি না। তাই, আমাকে একটি নতুন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে হয়েছে। বন্দী শত্রুদের জন্যে বিরাট একটি ভূমিগৃহ পূর্বেই আমি নির্মাণ করিয়ে রেখেছিলাম। তার মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম শৈল। শৈলগর্ভে উৎকীর্ণ রয়েছে নানান মণ্ডপ, প্রেক্ষাগৃহ। তুমি—প্রচুর সাজসজ্জার ব্যবস্থা ক'রে কন্যা-গুলিকে সঙ্গে নিয়ে,—সেই ভূমিগৃহে থাকবে। লোকচক্ষুর অগোচরে তাদের লালনপালন করবে। সেখানে এত ভোগ্যবস্তুর আয়োজন করিয়ে রেখেছি যে শতবর্ষ উপভোগ করলেও ক্ষয় হবে না।'

"এই ব'লে মহারাজ নিজের শয়নকক্ষের ভিত্তি থেকে, এক বিঘৎ-প্রমাণ একটি লোহার হাতল ঘোরাতেই দু আঙুল-ভর মোটা ভিত্তিতে একটি দরজা খুলে যায়।

"সেই দ্বারপথে আমাদের হয়েছিল···ভূগর্ভে প্রবেশ। তারপর দ্বাদশটি বসন্ত এখানে কেটে গেছে। সে দিনের সেই ছোট্ট মণিকর্ণিকা এখন তরুণী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কেন জানিনা, আজও আমাদের স্মরণে আনছেন না মহারাজ। আমরা জানি, দর্পসারের সঙ্গে মণিকর্ণিকার বিবাহ-বন্ধন···সংকল্প করেছিলেন এঁর পিতামহ। আবার এও জানি, যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন মণিকর্ণিকা তখন তাঁর মা আপনার মা কান্তিমতীর সঙ্গে সজীব পাশা খেলতে খেলতে জয়লাভ করেছিলেন ; পণ ছিল,···জিতলে, আপনি হবেন বর এবং মণিকর্ণিকা হবে বধূ। এখন আপনি এখানে এসে গেছেন, কী করবেন ভালমন্দ চিন্তা ক'রে দেখুন।"

উত্তরে বললুম—

"রাজগৃহে একটু কাজ আছে। আজই সমাধা ক'রে, ফেলবার মুখে যথাকর্তব্য সম্পন্ন করব।"

তখনো অর্ধেক রাত বাকি। দীপদর্শিত সুড়ঙ্গপথ ধ'রে, লোহার হাতল ঘুরিয়ে প্রবেশ করলুম রাজার শয়ন মন্দিরে। দেখি, সিংহঘোষ অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। জীবন্ত বন্দী করলুম তাঁকে। সর্পশত্রু নকুল যেমন ক'রে গর্জমান বিষধরকে টানতে টানতে চলে, আমিও তেমনি সিংহঘোষকে টানতে টানতে ভিত্তির রন্ধ্রপথ দিয়ে পৌঁছে গেলুম পাতাল-ঘরে। তারপর স্বভবনে তাঁকে নিয়ে এলুম। শ্রীচরণে লোহার শিকল পরাতেই, পালটে গেল রাজ-চেহারা। মাথা নত, মুখ ফ্যাকাশে, রক্ত চক্ষুঃ, টস্ টস্ করছে জল। একান্তে পিতৃদেবকে ডেকে এনে সিংহঘোষকে দেখালুম, নিবেদন করলুম সুড়ঙ্গের প্রবন্ধ। কীর্তি দেখে সকলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। এবং ভূমিগৃহ

থেকে রমণী-সজ্ঘকে আনিয়ে নিয়ে যথাবিহিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পিতৃদেব সত্বর আমার হাতে সমর্পণ ক'রে দিলেন মণিকর্ণিকার দুখানি হাত।

আমাদের আয়ত্তাধীন হ'ল নায়কহীন রাজ্য। প্রজারা পাছে ক্রুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ক'রে বসে, সেই ভয়ে মা আমার কাছে মিনতি করলেন—'সিংহঘোষকে মুক্তি দাও।' কিন্তু আমি মুক্তি দিইনি সিংহঘোষকে।

এই হেন অবস্থায় আছি, এমন সময় রাজকুমার, একদা আমরা শুনতে পাই, আপনার ভক্ত অঙ্গরাজ সিংহবর্মা আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা তাঁরই সহায়তায় সৈন্যাভিসরণ করতে করতে আজ হঠাৎ এখানে এসে গেছি, এবং···লাভ করেছি আপনার পাদপঙ্কজের দর্শন-সুখ।

রাজবাহনকে বদ্ধাঞ্জলি প্রণাম জানিয়ে অর্থপাল পূনর্বার বললেন—

"অনার্য সিংহঘোষ এখন আপনার পা ছুঁয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক, ক্ষালন করুক নিজের দুষ্কীর্তি।"

রাজবাহন আদেশ দিলেন—

"অর্থপাল, একদিন···অত্যন্ত পরাক্রান্ত এবং সত্যিই, বুদ্ধিবিষয়ে··· অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন তোমার এই শ্বশুর। তাঁর বন্ধন খুলে দাও। আমার সঙ্গে তিনি যেন একবার দেখা করেন।"

তারপরে প্রমতির দিকে প্রীতিভরে কটাক্ষ ক্ষেপণ ক'রে হাসতে হাসতে পুনর্বার বললেন—

"এবার তাহলে আরম্ভ হোক···তোমার আত্মচরিত"।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

প্রমতি-চরিত

প্রণামান্তে প্রমতি ছাড়লেন তাঁর বিজ্ঞাপনী ঃ—

দেবতা, আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে কোথায় যে না ঘুরেছি, তা বলা কঠিন—। শেষে একদিন হঠাৎ দেখি বিন্ধ্যাচলের···অভ্রচুম্বী এক বনস্পতির তলদেশে আমি দাঁড়িয়ে আছি। পাহাড়ের পাশ বেয়ে উপরে উঠে গেছে বিরাট গাছ। সূর্য ডুবছেন ; অস্তসূর্যকে দেখাচ্ছে··· তিনি যেন পশ্চিমদিগঙ্গনার আননে···রাঙাপাতার একটি কুণ্ডল। সমীপেই জল-ভরা ছোট্ট দীঘি।

শীতল জলে আচমন সারলুম। বন্দনা করলুম সন্ধ্যা। দেখতে দেখতে আকাশের লাল রঙ্···নীল হয়ে এল। তমসার আশীর্বাদে যা কিছু ছিল নিম্ন, যা কিছু ছিল উন্নত, সমস্তই সমান হয়ে গেল। মাটিতে আর পা ফেলা চলে না।···অন্ধকার। নিরুপায়! সংগ্রহ করলুম কিশলয়, পরিচ্ছন্ন ক'রে গাছের তলায় রচনা করলুম শয্যা।

এবার তবে ঘুমোই, এই চিন্তা ক'রে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে, ···বনস্পতি-দেবতাকে প্রণাম করলুম। গম্ভীরস্বরে বললুম—

"হে দেবতা, আমি আপনার শরণ নিলাম। এখানকার ঘনকান্তারে, ক্রুর-পদসঞ্চারে, বিভীষিকা দেখায় শ্বাপদ ;—তাদের ঘাতকতা থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

"এখানকার গভীর গহ্বরগুলির হৃদয় চিরে ছুটে যায়···শিবকণ্ঠের মতো নিবিড়নীল · যে তামসিক বন্যা,···তার প্রতাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

"একাকী-প্রসুপ্ত আমাকে রক্ষা করুন।"

ঘুমিয়ে পড়লুম···বাম বাহুটিকে উপাধান ক'রে। তার পরে

কতক্ষণ যে কেটে গেছে···জানি না। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে আমার মনে হ'ল···আমার সমস্ত গা কেমন যেন সুখী-সুখী হয়ে উঠছে, কে যেন এই আমাকে পরশ দিয়ে,···চ'লে গেল! আশ্চর্য, এমন স্পর্শ··· পৃথিবীতে কই, আগে তো কখনও অনুভব করিনি! ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে বহে গেল যেন আহ্লাদ! ব্যথিয়ে উঠল অন্তরাত্মা। সত্যিই ত, গায়ের লোমগুলো পর্যন্ত শিরশিরিয়ে উঠছে আনন্দে; সত্যিইত··· ডান হাতখানা···থর থর ক'রে কাঁপছে!···ভেঙে গেল ঘুম। তন্দ্রাবিজড়িত দুটি নয়ন ধীরে ধীরে খুলতে লাগলুম। চোখ যে কেন বাক্যহারা হয়—সেই প্রথম করলুম অনুভব!

দেখলুম,···আমার মাথার ঠিক উপরে···টাঙানো রয়েছে শুক্লবিতান; একঝলক যেন ঝকঝকে জ্যোৎস্না! ভয়ে আর কৌতুকে আমি আমার দেহটিকে নাড়াতে পারলুম না।···তারপরে···প্রথমে আমি বাঁ চোখ ঘুরিয়ে···বাম দিকে চাইলুম। দেখি, সৌধভিত্তির কাছেই বিছানো রয়েছে একখানি কারুকাজ-করা গালিচা, তার উপর শুয়ে রয়েছেন সুখ-নিদ্রালসা কয়েকটি সুন্দরী!···এবার আমি ডান চোখ ঘুরিয়ে···দক্ষিণ দিকে চাইলুম। চক্ষুঃসার্থক দর্শন!

—তাঁর বুকের উপর থেকে হালকা চাদরখানি একটু যেন স'রে গেছে! অমৃতের ফেনার মতো পাণ্ডুবরণ একখানি পালঙ্কে তিনি শুয়ে রয়েছেন; আদিবরাহের দংষ্ট্রা-লগ্ন কিরণ-জালের মতোই—যেন দুধসায়রে শিথিল হয়ে পড়ে রয়েছে তাঁর একখানি কাঁধের ফিনফিনে ওড়না: আর তিনি যেন লজ্জায় শঙ্কায় মূর্চ্ছিতা হয়ে প'ড়ে রয়েছেন,···দেবী ধরিত্রীর প্রতিরূপিণী। সত্যিই! সত্যিই কি ইনি···রূপবতী তরুণী? না, স্বর্গের ঐরাবত মদবিহ্বল হয়ে পৃথিবীতে ভুল ক'রে ফেলে রেখে গেছেন নন্দন-কল্পদ্রুমের এই রত্নমঞ্জরী?

—কী অনিন্দ্য তাঁর আধ-নিমীলিত নয়ন!···মুখের ডোলে নীলপদ্ম হাসছে। বাতাসের দেবতা বোধ হয় ধীরে ধীরে অরুণ-

বরণ অধর-মণির পাপড়িটিকে নাচাচ্ছেন, তাই মধুর গন্ধ ভাসছে পবনে।···আর নয়নতারায় ভোমরা ছুটি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলছে —'ভস্ম হয়েছেন বটে মদন, কিন্তু এখনও নিঃশেষ হয়নি···স্ফুলিঙ্গ।'

মনের নেশাটা···হঠাৎ আমার যেন কেটে গেল! এল জিজ্ঞাসা, এল তর্ক। কোথায় গেল সেই মহাবন, আর কোথা থেকেই বা এল এই সৌধ,···শক্তিধ্বজের যেন শিখরশূল, ব্রহ্মাণ্ডলেহি···বিপুল! আর কোথায় বা গেল আমার সেই পর্ণশয্যা? তার বদলে কে আমাকে শুইয়ে রেখে গেল···হাঁসের পালকের মতো শুভ্র-কোমল এই পালঙ্কে? তবে কি এই স্বৈরসুপ্তা সুন্দরীরা···চন্দ্রালোকের দোলনায় ছুলতে ছুলতে···খসে পড়ে গেছেন জ্যোৎস্নাপুলকিত এই সৌধটির শিখরে? এঁরা কি তবে অপ্সরা? এঁদের মূর্চ্ছাও কেমন যেন সুন্দরী!···

আর ইনিই বা কিনি? হাতদুখানিতে যাঁর শ্বেতপদ্মের শোভা? দিব্যকন্যা নয় ত? অথচ···শরতের জ্যোৎস্নার মতো বিছানা, গায়ে রয়েছে ধবধবে ফিনফিনে ওড়না! নাঃ, ইনি দেবকন্যা নন, হতেই পারে না। পদ্মিনী ঘুমোচ্ছেন, আর জ্যোৎস্না-কন্যারা এসে ধীরে ধীরে···পা টিপে দিচ্ছেন! গাল নয় ত, যেন রসাল! কেমন যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছে স্তনতটের অঙ্গরাগ, প্রথম যৌবনের হয়তো বা অসহনীয় প্রতাপে। দুখানি কাপড়, তাও পরা-পরা লাগছে। কিছু···ধোঁয়াটে!

ক্রমে মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল সংশয়, অন্তরে লাফিয়ে উঠল আনন্দ। মহিলাটি মানুষী না হয়েই যান না। এঁর যৌবনটি উচ্ছিষ্ট হয়েছে ব'লে তো মনে হয় না। তা না হলে, সুকুমার এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলিতে কেমন ক'রেই বা ঘনাবে এমন একটা জমজমাট ভাব? স্নিগ্ধাতিস্নিগ্ধ দেহচ্ছবিতে কেমন ক'রেই বা ফুটে উঠবে এমন একটা হলুদ্‌ধোওয়া রঙ?

প্রবালের মতো অধরমণি; তবু কঠোর তো নয়!

কপোলদুটি···ভরাট হয়েও ··ভরাট তো নয়; একটু যেন কঠোর, ···রক্তমূল চাঁপার কলির মতো কঠোর।

না জাগাবো না, ঘুমোন্; পুষ্পবাণের আঘাত-শঙ্কা নেই; তাই বোধ হয় এমন বিশ্রব্ধ-মাধুর্যে ঘুমোতে পারছেন। কই,···ওঁর ঐ বক্ষস্থলে, নির্দয়-নিষ্পেষণে, এখনও তো ফেটে পড়েনি স্তনমুকুলের মুখ?

এবার শিষ্টতার মর্যাদা বুঝি আমার ভাঙে! কিন্তু না, ভাঙল না। চোখের পাতার উপর ভর ক'রে···দাঁড়ালেন ভালবাসা। আমার ভালবাসাই···শেষে যদি···বুকে তুলে ওঁকে জড়িয়ে ধরেন! তা হ'লে, না, না ··ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে!

স্পষ্ট ক্রোধে যদি কেঁদে ওঠেন? আর···আমিই বা কতক্ষণ··· এমন ক'রে পড়ে থাকব? না জড়িয়ে শুয়ে থাকব? নাঃ। যা হবার তাই হোক। কপালে কী লেখা আছে,·· পরীক্ষা করেই দেখি।

অনুরাগ, লজ্জা ও আশঙ্কার আতিথ্যে, ছুঁয়েও-যেন-ছোঁয়া-নয় এমনি ধারা একটি ভাব নিয়ে, স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইলুম।···সুপ্তিমার ভান।

মুহূর্ত কয়েক কেটেছে। এমন সময় সেই নিথর চন্দ্রালোকে দেখতে পেলুম, সুন্দরী বাম পাশে পাশমোড়া দিয়ে শুলেন।···তাঁকেও কি তবে নিষ্পেষণ করছে অনিন্দ্য কোনো সুখ? হঠাৎ থরথর ক'রে কেঁপে উঠল তাঁর দেহলতা।···গায়ের উপর···হাতখানি একবার বুলিয়ে নিলেন। রোমাঞ্চই তো! অলসভাবে এলিয়ে নিলেন শিথিল-ঘুম অঙ্গ। গ্রীবা বাঁকুল। ঠোঁটের কপাট খুলে···ছোট্ট ছোট্ট বেরিয়ে এল হাই। চঞ্চল হ'ল চোখের বড় বড় পাতা। সুন্দরী উন্মীলন করলেন ছুটি আঁখি। রহস্যজড়ানো···কালো চোখের তারা। তার উপরে··· কাঁচা-ঘুম-ভাঙার হালকা-লাল মাধুরী।

চোখ-চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই···ওদিক থেকে ঘ'টে গেল এক নির্বাক অভিনয়! অদ্ভুত এক অনুভাবের স্রোতে, নিজেদের সমস্ত অবস্থা ভুলে গিয়েই যেন, তরুণীর···

ত্রাস ব'লে উঠলেন—"ত্রস্ত হবারই তো কথা, এ রকমের পুরুষমানুষ আগে তো কখনো দেখি নি। ও যদি আমায় স্পর্শ করে!"

বিস্ময় ব'লে উঠলেন—"ওমা, কোন্ পথ দিয়ে এল এই ঘুমন্ত কুমার?"

হর্ষ হাসলেন—"সত্যিই···দেখতে ভাল।"

অনুরাগ হানলেন—"যাই হোক্···উনি সুখী পুরুষ।"

বিলাস নড়ে উঠে বললেন—"জানি···তোর মন ভুলেছে।

বিভ্রম থমকালেন, চমকে বললেন—"নিজেকে সাম্‌লাও, ছড়িয়ে বোসো না ভুলের ফুল।"

এইবার বুঝি চেঁচিয়ে ওঠেন! পরিজনদের ঘুম,···যদি ভেঙে যায়! তার পরেই হঠাৎ কী যেন কী মুখ ফুটে বলতে গিয়ে, জোর ক'রেই যেন নিজেকে সামলিয়ে নিলেন সুন্দরী। ডাকতে পারলেন না। বোধ হ'ল ঠোঁট দুটিতে আঙুল টিপে ধরল···প্রথম প্রেম। কোনক্রমে নিগৃহীত ক'রে নিলেন নিজের লজ্জা ভয়। ঘাম ঝরতে লাগল মুখে। চক্ষুর রত্নপল্লব দিয়ে ভ্রমরটির তিনভাগ ঢেকে, কুঞ্চিত নয়নে,···মৃদু মৃদু···মদীয় অঙ্গগুলি দেখলেন! দেখে দিয়ে, নিজের দেহের উপর-দিকটা একটু দূরে সরিয়ে, সচকিতার মতো, শুয়ে পড়লেন,···সেই পালঙ্কেই!

তারপরে আমি হৃদয়-ঘট তখনও আমার ছলছল করছে ভালবাসায়···কেন জানি না···অকস্মাৎ ঘুমিয়ে পড়লুম।

ক্ষণ পরেই আবার জেগে উঠলুম। কে যেন আবার আমায় স্পর্শ ক'রে জাগিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। এবার অনুকূল স্পর্শ নয়, সারা দেহে যেন ছড়িয়ে দিয়ে গেল·· দুঃখ। জেগে দেখি,···সেই বন সেই গাছতলা সেই ঝরাপাতার বিছানা! বিভাস হয়ে গেছে বিভাবরী!

এ কেমন ক'রে হ'ল? লাফিয়ে উঠলুম।···একি স্বপ্ন, না প্রতারণা? একি আসুরী, না দৈবী মায়া? যা হবার হোক।

ব্যাপারটার পূর্ণ তত্ত্ব উদ্ধার না ক'রে ··মাটির বিছানাটি ছেড়ে একটি পাও আমি নড়ছি না। যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ এই আমি ধরনা ধ'রে প'ড়ে রইলুম···এখানকার এই বনস্পতির দেবতার চরণে। স্থির ক'রে,···স্থির হয়ে সেইখানেই প'ড়ে রইলুম।

তারপরে রাজকুমার, বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়!

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই···সীমন্তিনী এক রমণীর আবির্ভাব! জীর্ণ নিবসন, জীর্ণ উত্তরীয়! সূর্য-করাহত নীলপদ্মের যেন একগাছি শুষ্ক মাল্য। তপ্ত নিঃশ্বাসে রুক্ষ তাঁর ঠোঁট, আলতা নেই। এত চোখের জল ফেলেছেন যে, লোচনে আর অশ্রু নেই···রয়েছে রুধির। এক-বেণী। পরনে নীল রঙের একখানি চোলী। পাতিব্রত্যের যেন পতাকা।

অতি-কৃশ দেহ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। দেবীভাব ছিল ব'লেই, গায়ের রঙ···ম্লান ব'লে মনে হ'ল না।

তাঁকে দেখে প্রণাম না ক'রে আমি থাকতে পারলুম না। হর্ষকম্পিত তুটি বাহু প্রসারিত ক'রে মাটি থেকে তিনি আমাকে তুলে নিলেন। পেটের ছেলের মতো বুকে ধরলেন জড়িয়ে। আঘ্রাণ করলেন শির। অশ্রুবিন্দুতে, স্তনবৃন্তে, ক্ষরিত হ'তে লাগল বাৎসল্য। নিরুদ্ধকণ্ঠে স্নেহ ভরিয়ে বললেন,—

"কুমার, মগধের রাজমহিষী বসুমতী নিশ্চয় তোমাদের বলেছেন··· তাঁর হাতে শিশু অর্থপালকে গচ্ছিত রেখে এক রাত্রে এক যক্ষিণী,··· মণিভদ্রের তিনি কন্যা,···দূরে চ'লে যান; তারপরে কথা-কাটাকাটির ফলে তিনি তাঁর নিজের পেটের ছেলে এবং সখীদের ফেলে রেখে স্বামীর ঘর ছেড়ে চ'লে যান রাজরাজ কুবেরের চরণে।

আমিই সেই যক্ষিণী···আমি তোমার মা। ধর্মপালের পুত্র, সুমতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা কামপাল তোমার জনক। স্বামীর চরণ ছেড়ে অকারণ কোপে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে প্রবাসে অনুতাপে অনুশোচনায় দগ্ধবিহ্বল হয়ে যখন রয়েছি, সেই সময়ে এক রাত্রিযোগে আমি স্বপ্ন পাই; এবং

অনুভব করি···কে যেন এক রক্ষোরূপী পুরুষ আমাকে শাপ দিয়ে বললেন—

"এত ক্রোধ ভাল নয়, এক বর্ষ তোকে প্রবাস-দুঃখ ভোগ করতে হবে।"

শুনেই আমার ঘোর কাটে, জেগে উঠি। বর্ষসহস্রের মতো দীর্ঘ একটি বৎসর···আমাকে কাটাতে হবে!

রাত্রি যখন অতীত হয়ে গেল, তখন স্থির করলুম—প্রথমে যাব·· শ্রাবস্তীতে, দেবাদিদেব ত্র্যম্বকের উৎসবসমাজে, তারপরে স্থানে স্থানে বন্ধুস্বজনদের পরিদর্শন ক'রে মুক্তশাপ হয়ে স্বামীর পাশে গিয়ে পৌছব। অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ চলতে চলতে হঠাৎ আমি দেখতে পাই···অরণ্যে তুমি বিব্রত হয়ে পড়লে, এবং ইহস্থ দেবতার শরণ-প্রার্থনা ক'রে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখে ছিল অভিশাপের দুঃখ, তাই তোমাকে স্পষ্টভাবে আমি চিনতে পারি নি। তোমাকে অসহায় দেখে আমার যেন কেমন···মায়া হয়। বিন্ধ্যবনে বিল নয় প্রমাদ, একাকী ফেলে রেখে যাওয়া···অনুচিত; এই ভেবে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তোমাকে তুলে নিয়ে আমি পথ চলতে থাকি। ত্রম্ব্যকের দেবগৃহের নিকটে যখন পৌছেছি তখন চিন্তিত হ'ল মন;—ঘুমন্ত একটি তরুণকে কেমন ক'রেই বা নিয়ে যাই উৎসব সমাজে!

আকাশপথে চলতে চলতে এমন সময় আমার চোখে পড়ে··· শ্রাবস্তীরাজ 'ধর্মবর্ধনে'র কন্যা 'নবমালিকা'কে। বৈশাখ-রজনীতে, কন্যাপুরের বিমানহর্ম্যের শিখরে, বিশাল একটি কোমল পালঙ্কের উপর তখন তিনি শুয়েছিলেন। কাছে গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তাই, নবমালিকা গভীর নিদ্রায় মগ্না, পরিজনেরাও ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত ব্রাহ্মণকুমারকে কয়েক মুহূর্ত তা হ'লে এইখানেই শুইয়ে রেখে কৃতকৃত্যটি সেরে আসি—এই স্থির ক'রে তোমাকে সেইখানে শুইয়ে রেখে আমি চ'লে যাই।

দেবগৃহের উৎসব-শ্রী দর্শন ক'রে স্বজন-দর্শনের সুখভোগ করতে করতে, ত্রিভুবনেশ্বর মহেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করি। দেখি তিনিও—দুই দেবী-সপত্নীর চরণে···কিছু অলীক অপরাধ ক'রে ফেলে ধরা প'ড়ে যাওয়াতে···আমারি মতন কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও শঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। তারপরে···ভক্তি-প্রণত-হৃদয়ে ভগবতী অম্বিকাকে আমি যেন নমস্কার করলুম, দেবী পার্বতী অমনি ওদিক থেকে হঠাৎ মৃদুহাস্যে ব'লে উঠলেন—

"ভদ্রে, আর তোমার ভয় নেই; পতিপার্শ্বে এবার তুমি যাও;···ঐ শেষ হয়ে গেল তোমার অভিশাপ।"

আশীর্বাদে অনুগৃহীতা হয়ে আমার মনে হ'ল আমি যেন সদ্য ফিরে পেলুম আমার নষ্ট মহিমা। ফিরে এসেই তোমাকে আমি পুনর্বার দেখি, আর দেখবামাত্রই চিনে ফেলি। নিশ্চয়, এইই তো আমার ছেলে—প্রমতি; অর্থপালের সখা, সেই তো এর প্রাণ। প্রমতিই তো। কিন্তু এ···কী আমি ক'রে বসেছি! আমি একটা পাপীয়সী। আমার অজ্ঞানতাই এই উদাসীনতার জন্যে দায়ী।

আমি লক্ষ্য করেছিলুম তোমার আসক্ত-ভাব; লক্ষ্য করেছিলুম তরুণের প্রতি কন্যাটিরও কামনা; দুজনেরই···নিদ্রার ভান! লজ্জায় শঙ্কায় তোমাদের আত্মপ্রকাশে এসেছিল সঙ্কোচ। আবার এদিকে··· আমাকেও এবার যেতে হয়! ভালবাসার বাতাস-লাগা সত্ত্বেও, কন্যাটি যখন রহস্য-রক্ষার জন্য সখীদের কাছে কিছু ভাঙেননি,—তখন মঙ্গল।···তা হ'লে নিয়েই যাই কুমারকে। ছেলে যদি ওঁকে চায়,··· নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নিতে সে পারবে। এই ভেবে,—আমি তখনই আমার মায়া বিস্তার ক'রে তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে দি; এবং তোমাকে তুলে নিয়ে আবার এই অরণ্যের পত্রশয়নে শুইয়ে রাখি। এই ঘটনাই ঘটেছিল।"

বৃত্তান্ত শুনে ধৈর্য ধ'রে থাকতে পারলুম না। অঞ্জলি রচনা ক'রে মাকে করলুম প্রণাম। তিনিও বারংবার—আমাকে জড়িয়ে ধরলেন

বুকে, চুম্বন করলেন কপাল, আঘ্রাণ করলেন শিরঃ। শেষে স্নেহবিহ্বল-কণ্ঠে বললেন—

"আমাকে এইবার এখান থেকে চ'লে যেতে হবে তোমার পিতৃদেবের পদমূলে।"

যেমন হয়েছিল তাঁর আবির্ভাব, তেমনি হ'ল তাঁর অন্তর্ধান। শূন্যাকাশে চেয়ে রইল আমার অবাক্ নয়নের বিস্ময়।

রাজকুমার, আমি তখন সম্পূর্ণরূপে পঞ্চবাণের বশীভূত হয়ে পড়েছি। এক মুহূর্তও বিলম্ব না ক'রে শ্রাবস্তীর পথ ধরলুম। পথে পড়ে সাহুকারদের মস্ত বড় একখানি গ্রাম,···খর্বট। দেখি—বিরাট জনতা; উঠছে—বিপুল কোলাহল। তাম্রচূড়—মোরগের লড়াই হবে। কুক্কুট-যুদ্ধ দেখতে দাঁড়িয়ে গেলুম।

বোধ হয় সেখানে ব'সে আমি একটু···হেসে ফেলেছিলুম। আমার পাশেই ব'সে ছিলেন জনৈক বৃদ্ধ শৌখীন ব্রাহ্মণ। দেখেই মনে হ'ল তিনি 'বিট';—সর্বস্ব খুইয়ে এখন বারাঙ্গনার অন্নভোজী হয়ে জীবনের শখগুলোকে মেটাচ্ছেন। তিনিও···মুচকি হাসির ঝিলিক হেনে জিজ্ঞাসা করলেন—

"মহাশয়ের এত হাস্য কেন?"

"হাসি পাচ্ছে হাসছি। তাম্রচূড় কুক্কুট হচ্ছেন বলাকাজাতীয়; আর ঐ পূর্বদেশী কুক্কুটটি হচ্ছেন নারিকেলজাতীয়। এগুলোর যেমন প্রমাণ, তেমনি বল। আশ্চর্য, পশ্চিম-পল্লীর মনুষ্যেরা এই সামান্য বিভেদটুকু না জেনেই লড়িয়ে দিচ্ছেন···হাল্কা তাম্রচূড়টাকে?"

উত্তর এল—

"আরে মশাই, যারা বোকা তাদের···অতশত···বুঝিয়ে লাভ কি? চুপ দিয়ে ব'সে থাকুন।"

এই ব'লে চামড়ার বটুয়া থেকে কর্পূর-দার এক খিলি পান বার

করে তিনি অভ্যর্থনা করলেন আমাকে। তার পরে যেমন হয়,···বিচিত্র কথার মধ্য দিয়ে আমাদের জ'মে উঠল আলাপ।

এদিকে মোরগ দুটো তখন ভীষণ লড়াই শুরু ক'রে দিয়েছে। এ ওকে মারে তো ও একে মারে। কী তাদের ডানা ঝাপটানোর কায়দা! গলা-ফাটানো ডাক! ডাক তো নয়, যেন সিংহনাদ! অবাক কাণ্ড! জিতে গেল···পশ্চিম পল্লীর তাম্রচূড়! সাদা পর-ওয়ালা লাল-ঝোঁটন মোগরটারই জয়! নিজের পল্লীর কুক্কুট জিতেছেন, বিটব্রাহ্মণ তো আহ্লাদে আটখানা। কোথায় ভেসে গেল আমাদের বয়সের বিরোধ! সেই দিনই তিনি তাঁর বাড়ীতে আমাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ ক'রে বসলেন। স্নান-ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে সেখানেই আমার রাত কাটাতে হ'ল।

পরের দিন শ্রাবস্তীর পথ ধরব। পথ ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ বন্ধু হেসে বললেন—

"ভায়া, প্রয়োজন হ'লে স্মরণ ক'রো, ভুলো না যেন।"

শ্রাবস্তীতে পৌঁছলুম, নগরের বাইরে মনোরম উদ্যান, লতামণ্ডপ। তারই তলদেশে শয়নের ব্যবস্থা করলুম। পথশ্রান্তের চোখে···ঘুম আসতে দেরি হয় না।

পরের দিন। ঘুম ভাঙল···নূপুরের ধ্বনিতে! রুণরুণ ক'রে কার যেন চরণে···নূপুর বাজছে! কিমাশ্চর্যং! অতঃপর লাফিয়ে উঠে দেখি,—একটি যুবতী···আমারি দিকে এগিয়ে আসছেন···আর তারই পায়ে বাজছে···নূপুর।

তিনি কাছে এলেন।

ঝকমারি! যুবতীটি,···তাঁর হাতে একখানি চিত্রপট,·· একবার পটের দিকে চান, একবার আমার দিকে চান! কী যেন মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন! ভারি অদ্ভুত লাগল···পর্যায়ক্রমে,···যুবতীটির দুনয়নের ঐ ধরনের দেখন। তার পরেই দেখি, বিস্ময়ে ভ'রে উঠেছে

তাঁর মুখ,···সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। এ পাশ ও পাশ ক'রে···আমি শেষে পটখানি দেখলুম। আরে, এ যে আমারই ছবি, হুবহু সাদৃশ্য! তা হ'লে তো দেখছি, এঁর দৃষ্টিপাতের ঐ অদ্ভুত প্রযত্নটি আকস্মিক নয়! এখন কি করা যায়?

যুবতীকে বললুম—

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর কষ্ট করবেন? পুণ্যারাম উদ্যানটি সর্বসাধারণের উপভোগ্য। দ্বিধা না করেন তো আসুন, এইখানেই একটু বসা যাক।"

মৃদু হেসে যুবতী বললেন—

"অনুগৃহীত হলুম।"

তারপরে আমাদের দুজনের মধ্যে চলতে লাগল লৌকিক অলৌকিক বিষয় নিয়ে নানান ছাঁদের কথা। কথার মধ্যপথে যুবতী বললেন—

"আপনি এখন এ দেশের অতিথি। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, পথশ্রমে···ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যদি দোষ না ধরেন, তা হলে আজ আমার গৃহে বিশ্রাম করলে সুখী হব।"

"মুগ্ধে, এটি দোষ নয়, এটি আপনার গুণ।"

এই ব'লে যুবতীর প্রদর্শিত পথ ধ'রে তাঁর গৃহে গেলুম। সেখানে একেবারে রাজ-স্নান রাজভোজের আয়োজন! দস্তুর-মতো অভ্যর্থিত হয়ে যখন সুখে আরাম করছি, তখন সঙ্গোপনে আমাকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বসলেন যুবতী; বললেন—

"আপনি মহা ভাগ্যবান। কত না দেশ-দেশান্তরেই আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় আপনার ভাগ্য। এই ভ্রমণের মধ্যে···সব চেয়ে অদ্ভুত···কী এমন আপনি দেখলেন বা জানলেন বা পেলেন?"

নেপথ্যে ব'লে উঠল আমার মন—

"এটি তো দেখছি, বড় আশাস্পদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমস্ত পরিজনদের মধ্যে ইনিই তাহ'লে রাজপুত্রীর···সংলক্ষিতা সখী।

চিত্রপটটির মধ্যে রয়েছে···হর্ম্যতল···শুভ্র বিতান···শরৎকালের মেঘের মতো এক অতিবিস্তীর্ণ শুভ্রশয্যা, আর তার উপর শুয়ে রয়েছি আমি ; আবার গাঢ় নিদ্রায় মুদ্রিত ক'রে আঁকা হয়েছে ·· আমার আঁখি ! অতএব এ থেকে নির্ঘাত আমাকে বুঝে নিতে হবে— অনঙ্গদেব অধুনা রাজকন্যাকে এমন একটি পরমপদে তুলেছেন, যেখানে তাঁর ভালবাসার জ্বর···বিকারে এসে দাঁড়িয়েছে, দশার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন সখীরা, সনির্বন্ধ প্রশ্ন করতে তাঁরা ছাড়েন নি ; এবং তাঁদের মন ভোলাবার জন্যে, অর্থাৎ তাঁদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে···বড় চতুর দেখছি তো তিনি···রাজকুমারীকে সমর্থ উত্তর দিতে হয়েছে···এই শিল্পরূপখানির অঙ্কন ক'রে। রূপের যে মিল হয়ে গেছে···এখন বুঝতে পেরেছেন ইনি···এই সখীটি ; কিন্তু মনের সংশয় দেখছি···মেটেনি। যা অনুভব করেছিলাম তাই এখন এঁকেজুঁকে, তা হ'লে আমাকে ভাঙতেই হয় এঁর সংশয়।"

মনস্থির ক'রে বললুম—

"আপনার প্রশ্নটি বড় মিঠে। আচ্ছা দেখি···চিত্রপটটি আমায় দিন।"

ছবিটি আমার হাতে এল। ছবিটির মধ্যেই আমি তৎক্ষণাৎ এঁকে দিলুম···পূর্বরাগ-বিহ্বলা এক প্রিয়তমার ভান-ক'রে-ঘুমিয়ে-থাকার ছবি। আঁকা শেষ হয়ে গেলে মুখ তুলে বললুম—

"অরণ্যের মধ্যে একদিন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। তখন এই গড়নের একটি যুবতীকে এই রকমের একটি যুবকের পার্শ্বশায়িনী অবস্থায়···দেখেছিলাম। এটি স্বপ্ন নয়।"

আনন্দে ডগমগ করতে করতে যুবতীটি যখন আমায়···প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লেগে গেলেন ; বিস্তর কথা। সমস্ত ঘটনাটি···তখন তাঁকে খুলে বললুম। তিনিও তখন আমার কাছে বর্ণনা ক'রে ব'লে ফেললেন···এই হতভাগ্যটির জন্যে তাঁর সখীর কি কি অবস্থান্তর ঘটেছে। শুনে একটু ভেবে বললুম—

"আমাকে অনুগৃহীত করবার শুভেচ্ছায় যদি আপনার সখীর মন এতই উন্মুখ হয়ে থাকে···তা হ'লে আরও কয়েকটি দিন আমায় সময় দিন···আমি কন্যাপুরে নিঃশঙ্ক-নিবাসের বিধিব্যবস্থা ক'রেই উপস্থিত হব।"

যাই হোক যুবতীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেদিন আমি বিদায় নিই।

উপায় উদ্ভাবনের আশায়···সেই সাহুকারদের খর্বটে আবার আমি ফিরে আসি এবং বৃদ্ধ বিটের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। পূর্বের মতোই স্নান-ভোজন করালেন। তারপর নিভৃতে প্রশ্ন করলেন—

"বলি ব্যাপার কি হে! সাত-তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে বড়!"

উত্তরে বললুম—

"ঠিক প্রশ্নই করেছেন। বলি শুনুন—। শ্রাবস্তীর যিনি রাজা, তাঁর নাম 'ধর্মবর্ধন'; তিনি ধর্মপুত্রবিশেষ। এবং তাঁর যিনি দুহিতা, —আহা, লক্ষ্মীদেবীর তিনি গর্বশেষ, পুষ্পধনুর তিনি প্রাণ। নামটি 'নবমালিকা'। তাঁর রূপের সুকুমারতার পাশে লজ্জায় নুয়ে পড়ে নবমালিকার মঞ্জরী। হঠাৎ তাঁকে আমি দেখেছি। একগাছি কটাক্ষের মালা···আমার মর্মে তিনি মেরেছেন;···মালা নয় তো, যেন শ্রেণী দিয়ে গাঁথা শ্রীকামের বাণ! বন্ধু, আপনাকেই করতে হবে সেই মর্মশেলটির বিশল্যী-করণ। আপনিই একা পারেন। ধন্বন্তরির মতো মহান্ বৈদ্য এলেও,—আপনি ছাড়া—সে কাজ যে কেউ করতে পারবে···তা আমার বিশ্বাস হয় না। তাই আমি দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসেছি।"

"বন্ধু, প্রসন্ন হোন্।

"উপায় একটা আমি উদ্ভাবন করেছি···কিন্তু তস্য প্রয়োগ··· আপনার হস্তে। আপনাকে হতে হবে আমার বাপ, এবং চেহারা বদলিয়ে···স্ত্রীবেশ চড়িয়ে,···এই আমাকেই হতে হবে আপনার

কন্যে। কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পিতা একদিন উপস্থিত হয়ে যাবেন মহারাজ শ্রীধর্মবর্ধনের ধর্মাসনে এবং বলবেন—

"'মহারাজ, আমার এই একটিই মাত্র মেয়ে। ভূমিষ্ঠ হবার ঠিক্ পরেই মেয়ের মা স্বর্গে যান। একাধারে পিতা এবং মাতা··· আমাকেই এখন হতে হয়েছে। বিবাহের স্থিরও করেছি। বিবাহ-যোগ্য ঘর। আমার ভবিষ্য জামাতা···একটি ব্রাহ্মণ-কুমার। তিনি··· বিদ্যার বিনিময়ে কন্যা-পণ অর্জন করতে চান। অবন্তিনগরী উজ্জয়িনীতে তাই তিনি গমন করেছেন। তাঁর হাতেই মেয়েটিকে সম্প্রদান-করা আমার ঐকান্তিক বাসনা, অন্য হস্তে নয়। এদিকে, তরুণী হয়ে উঠেছে আমার কন্যা, ওদিকে ব্রাহ্মণ-কুমারটিও ফিরে আসতে দেরি করছেন। আমার বাসনা,—বিবাহ দিয়ে জামাতাকে কন্যা-ভার সমর্পণ ক'রে সন্ন্যাস নিই। কিন্তু মহারাজ, আমি নিতান্ত অসহায়। ছেলেমানুষটি নেই, মেয়েটিকে যে কার তত্ত্বাবধানে রেখে যাব···এই হয়েছে ভাবনা। বিশেষতঃ মা-হারা মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণ বড় দুরূহ। আপনি প্রজাপুঞ্জের পিতৃমাতৃ-স্থানীয়। বিপদে প'ড়ে, তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার মতো ·· অগতি এবং অধীতী···এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আবেদন যদি গ্রাহ্য করেন, আদিরাজ-চরিতধুর্য আমার মহারাজ যদি এই অখণ্ডিত-চরিত্রা দুহিতা-টিকে স্বীয় ভুজচ্ছায়ায় কিছুকাল আশ্রয়ের বরাভয় দান করেন, তা হ'লে···আদেশ-পাঠে···উজ্জয়িনী থেকে আমার ভবিষ্য-জামাইটিকে নিয়ে-আসবার ব্যবস্থা করি, এবং কৃতার্থ হই।'

"এই রকমের আবেদন···আশা করি ঠেলতে পারবেন না মহারাজ; এবং তত্ত্বাবধানের জন্যে রাজ-দুহিতার কাছে, নির্ঘাত আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আপনি তখন গৃহে ফিরে যাবেন। আগামী ফাল্গুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকবেন। উত্তর-ফাল্গুনীতে রাজার অন্তঃপুরচারিণীরা পালন করেন তীর্থযাত্রা-উৎসব। শ্রাবস্তীর পূর্বদিকে যে স্নানঘাটা রয়েছে, তারই যৎ-সামান্য দূরে দেখতে পাবেন

বেতসলতার বেড়া দিয়ে ঘেরা···কার্তিক-ঠাকুরের একটি মন্দির। দুখানি সাদা কাপড় হাতে নিয়ে, সেখানে আমার জন্যে নিভৃতে আপনি অপেক্ষা করবেন।

"এই অবকাশটি আমিও···সন্দেহাতীত-ভাবে···কাটিয়ে দেব; এবং উৎসবের সময় রাজকন্যার সঙ্গে স্নানে যাব। গঙ্গার জলে নেমে যখন কন্যাসমাজ খেলায় মত্ত হয়ে উঠবেন, তখন আমি···ডুবব, স'রে পড়ব।···আর কিছু পরেই ভেসে উঠব·· আপনার কাছেই। সাদা কাপড় দুখানি প'রে, এক মুহূর্তে আপনার জামাতা সেজে আপনার পিছন পিছন স'রে পড়ব।

"হাহাকার প'ড়ে যাবে; রাজনন্দিনীও আমাকে ইতস্ততঃ খোঁজ করাবেন, খুঁজে পাবেন না, এবং আমাকে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি মুখে অন্ন দেবেন না,···ইত্যাদি ক'রে একটি বিলাপ-বিলাসের অভিনয় সৃষ্টি ক'রে তুলবেন। এই মূলে বিরাট সোরগোল প'ড়ে যাবে, কেঁদে আকাশ ফাটাবেন সখীরা, পুর-বৃদ্ধারা হা-হুতাশ করতে থাকবেন। কী অলক্ষুণে কথা! ব্রাহ্মণ-কন্যা ডুবেছেন···সহজ ব্যাপার! দেখবেন, অশৌচ নেবেন পৌরজনপদ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবেন অমাত্য···সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ!

"সময় বুঝে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তখন আপনি উপস্থিত হবেন রাজসভায়। আশীর্বাদান্তে নিবেদন করবেন—

"'মহারাজ, আপনার শ্রীভুজ-আরাধনের উপযুক্ত · ইনিই আমার জামাতা। চতুরাম্নায়ে ইনি অধীতী, ষড়ঙ্গে ইনি গৃহীতী; আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রে বিচক্ষণ এবং চতুঃষষ্টি কলার আগম-প্রকরণ ও প্রয়োগ-প্রকরণে সুচতুর। বিশেষ ক'রে···হস্তিরথাশ্বতন্ত্রে, ধনুর্বিদ্যায়, অস্ত্রবিদ্যায় এবং গদাযুদ্ধে ইনি অনুপম। পুরাণ-ইতিহাসে ইনি কুশল। কাব্য-নাটক-আখ্যায়িকার ইনি রচয়িতা। সোপনিষদ অর্থশাস্ত্রে এঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অসামান্য। এর মাৎসর্য নেই···গুণগ্রহণে। বন্ধুদের··· বিশ্বাসস্থল। কর্মী, সংবিভাগশীল এবং শ্রুতিধর। গর্বের বালাই এঁর

নেই। এতদিনে এতটুকুও ছিদ্র খুঁজে পাই নি। আর···গুণ যে নেই, তাই বা বলি কেমন ক'রে? আমার মতো দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে এ রকমের জামাতা-লাভ আশাতীত। এখন মহারাজের যদি অনুমতি হয়, তা হ'লে এঁর হস্তে কন্যা-সম্প্রদান ক'রে আমি গ্রহণ করি, বৃদ্ধদের যা নেওয়া উচিত,—সন্ন্যাস।'

"শুনতে শুনতেই দেখবেন, মহারাজের মুখ আঁধার হয়ে যাচ্ছে; তিনি অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছেন, হতবুদ্ধি হয়ে জড়ের মতো হয়ে যাচ্ছেন। মন্ত্রিদের আনুকূল্যে আপনাকে অনেক অনুনয়···মিনতি করতে তিনি আরম্ভ করবেন। জগৎ-সংসার অনিত্য, দৈবের উপর কারো হাত নেই,···এই সব কীর্তন ক'রে আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন। আপনি কিন্তু তখন···কোনো কথাই কানে নেবেন না,··· কেবল ডুক্‌রে কেঁদে উঠবেন, চোখের জলের নদী বইয়ে দেবেন। বাষ্পকুণ্ঠ-কণ্ঠে সেখান থেকে চ'লে গিয়ে, কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসবেন। রাজদ্বারেই আগুন জ্বালিয়ে স-ক্রন্দন চিতারোহণের উপক্রম করবেন। দেখবেন,···সামাত্য মহারাজ আপনার পায়ে পড়ছেন, প্রচুর মুদ্রা ঢালছেন, আর আমার শ্রীহস্তে তুলে দিচ্ছেন রাজনন্দিনীকে; এবং ততঃপর মদীয় যোগ্যতায় অতি-মুগ্ধ হয়ে আমারি হস্তে সমর্পণ করাচ্ছেন···রাজ্যভার।

"এখন বন্ধু, এই ফন্দী খাটে···যদি আপনি রাজী হন।"

রাজকুমার, অত্যন্ত-পটু সেই বিট-কুল-শিরোমণি···'পাঞ্চাল শর্মা'·· অবিলম্বে মেতে উঠলেন। কপট-প্রপঞ্চে যিনি পূর্ণ অভ্যস্ত··· দশগুণ বেশি ক'রেই তিনি হাসিল করেন কাজ। বিলক্ষণ নৈপুণ্যে উৎরে গেল তাঁর অভিনয়। আমাদের অভিসন্ধি সফল হয়ে গেল··· স্বল্পেই। নবমালিকার আর্দ্র কুসুমের উপর মধুকর যেমন গুনগুনিয়ে এসে বসে, তেমনি হ'ল রাজনন্দিনীর উপর আমার প্রবন্ধ। কোথায়

একদিন ঘটেছিল···বিন্ধ্যবনে পর্ণ-শয্যা, আর কোথায় একদিন ঘ'টে গেল···নবমালিকায় ফুল-শয্যা। আশ্চর্য!

এর পরে রাজকুমার, দুটি কর্তব্য আমার বাকি রইল। এক, রাজা সিংহবর্মার সহায়তা-করণ; দুই, সুহৃৎদের সঙ্কেত-স্থানে গমন। তাই সমস্ত সৈন্যবল সঙ্গে নিয়ে এই চম্পা-নগরীতে আসতেই···দৈবাৎ আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

প্রমতির আত্মচরিত শুনে রাজবাহন হেসে উঠলেন;···পদ্মের পাপড়ির মতো তাঁর হাসি। বললেন—

"প্রমতি, সত্যিই তোমার কাহিনীটি·· বিলাস-বহুলা,···উর্জস্বলা, ···দরদ-বিশালা। প্রজ্ঞাপথের পথিকদের এই পথটিই কাম্য।"

মিত্রগুপ্তের দিকে চোখ ফিরিয়ে ক্ষিতিশপুত্র আবার হেসে বললেন—

"রঙ্গমঞ্চে তা হ'লে এবার প্রবেশ হোক···মিত্রগুপ্তের॥"

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

মিত্রগুপ্ত-চরিত

মিত্রগুপ্ত তখন আরম্ভ করলেন ঃ—

হে দেব, বলাই বাহুল্য, একই উদ্দেশ্যে আমরা ভ্রমণে বেরুই। তারপরে ঘুরতে ঘুরতে একদা আমি উপস্থিত হয়ে যাই,—'সুহ্ম' দেশের –'দামলিপ্ত'-নগরে। নগরের বাইরে উদ্যান। সেখানে তখন বিরাট উৎসব জমেছে। ঘোরাফেরা করছি। এমন সময়ে দেখি, দূরে, উৎসব-সমারোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে,– যুঁই আর বেলফুলে ছাওয়া একটি লতা-নিকুঞ্জে—জনৈক যুবা-পুরুষ ব'সে রয়েছেন···একাকী, বাজাচ্ছেন বীণা,···আত্মবিনোদন করছেন! তাঁকে প্রশ্ন করল আমার রসনা—

"মহাশয়, এ উৎসব কিসের? কী উদ্দেশ্যেই বা আরম্ভ হয়েছে উৎসব? আর আপনিই বা কেন উৎসব-সমাজে যোগদান না ক'রে, বরং যেন উৎসব-লক্ষ্মীকে অনাদর ক'রেই, কেবলমাত্র রতি-পরিবাদিনী বীণাখানি হাতে নিয়ে উৎকণ্ঠিতের মতো একান্তে রয়েছেন ব'সে?"

তিনি বললেন—

"সৌম্য, সুহ্ম দেশের রাজা 'তুঙ্গধন্বা'র···ছেলে ছিল না। এই দামলিপ্তনগর···দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর পীঠস্থান। প্রবাদ আছে, বিন্ধ্যাচলের নিবাস-প্রীতি বিস্মৃত হয়ে এই পীঠেই···চির-স্থায়িনী হয়ে রয়েছেন দেবী বিন্ধ্যবাসিনী। তুঙ্গধন্বা তাঁর চরণে ভিক্ষা চান দুটি সন্তান। মানত ক'রে দুয়ার ধ'রে প'ড়ে থাকেন। স্বপ্নাদেশ হয়—

"'তোমার একটি পুত্র হবে; পরে একটি দুহিতা। কিন্তু পুত্রটি দুহিতার পাণি-গ্রাহকের অনুজীবী হয়ে থাকবে। সপ্তম-বর্ষ বয়স

থেকে আ-বিবাহ,—গুণবান্ পতিলাভের উদ্দেশ্যে কন্যাটি যেন প্রতি মাসের কৃত্তিকাতিথিতে কন্দুক-নৃত্যের লাস্য-নৈবেদ্য দিয়ে আমার সমারাধনা করে। কন্যার অভিলাষ অনুযায়ী যেন বিবাহ হয়।'…

আজকের যে উৎসব চলেছে…এ সেই 'কন্দুকোৎসব'। স্বপ্নাদেশের কিছুকাল পরেই রাজার প্রিয়মহিষী 'মেদিনী' দেবীর‥ ছেলে হয়; তারপর একটি কন্যা। সেই রাজকন্যা 'কন্দুকাবতী' আজ এখানে আসবেন— কন্দুকনৃত্য ক'রে আরাধনা করবেন চন্দ্র-মালিনী দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে।

"রাজনন্দিনীর যিনি ধাত্রীকন্যা তাঁর নাম 'চন্দ্রসেনা'। রাজকন্যার তিনি সখী, কিন্তু আমার তিনি প্রিয়া। একদিন প্রিয়া ছিলেন, কিন্তু এখন আর তা…নেই। এই সেদিন…রাজপুত্র 'ভীমধন্বা' তাঁকে অবরোধে পুরেছেন—বলপ্রয়োগ ক'রে। পুষ্পশরের যন্ত্রণায় একেই তো আমার উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে হৃদয়, তার উপর আবার এই অসীম উৎকণ্ঠা! তাই একান্তে ব'সে রয়েছি, বীণায় তুলছি ঝঙ্কার; বীণার ঝঙ্কারে যদি আশ্বস্ত হয় হৃদয়,…।"

ভাষণের মধ্যপথেই আমরা চমকে উঠলুম। মণি-নূপুরের নিক্বণ না? দেখতে দেখতে হাজির হয়ে গেলেন একটি চুলবুলে তরুণী। তাঁকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল যুবকটির দৃষ্টি। বীণা ফেলে দাঁড়িয়ে উঠলেন। দু হাত বাড়িয়ে তরুণীটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। সে কী প্রগাঢ় আলিঙ্গন! তরুণীটিও জড়িয়ে ধরলেন তার কণ্ঠ। তারপরে দুজনেই‥ব'সে পড়লেন। যুবকটির মুখ থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসতে লাগল বাক্য,—

"ইনিই আমার প্রিয়া, প্রাণসমা,…প্রেয়সী। বিরহ?…সে তো একটা আগুন; কেবল দগ্ধায়, আমাকে পোড়ায়। আমার…এঁকেই সেদিন চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন রাজপুত্তুর,…উঃ কী ভীষণ তাঁর নাম…'ভীমধন্বা'; …যম যেমন ক'রে চুরি ক'রে নিয়ে যান জীবন।

একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিলুম। হিম হয়ে গিয়েছিলুম। তিনি রাজপুত্তুর,...তাঁকে তো আর খুন করতে আমি পারি না। তাই তোমায় আমি বলছি...প্রিয়ে, আমার চোখের সামনে তুমি আর একটিবার ভাল ক'রে দাঁড়াও, শেষের দেখাটি দেখে নিই। যে প্রাণ প্রতিশোধ নিতে অক্ষম তাকে আমায়...পরিত্যাগ করতেই তো হবে।"

চোখের জলে ভিজে আসা তরুণীর মুখ। আবেগ-চঞ্চলা হয়ে ব'লে ওঠেন—

"না, না, আমার জন্যে, অমন ক'রে অসম সাহস তোমায় ফলাতে হবে না। তুমি তো জানো,—শ্রেষ্ঠ সাহুকার অর্থদাসে'র তুমি ছেলে ব'লেই গুরুস্থানীয়েরা তোমায় মর্যাদা দিয়ে 'কোশদাস' নাম দিয়েছেন; কিন্তু আমাদের ভালবাসায় অসহ্য হয়ে ঐ যাঁরা ঈর্ষায় ফুলছেন, তাঁরা তোমার নাম দিয়েছেন 'বেশ্যা-দাস,' ঢাক পেটাচ্ছেন ঐ নামে। এখন তুমি যদি আত্মহত্যা কর, আর আমি থাকি বেঁচে, তা হ'লে সারা জগৎ আমায় দুষবে, নৃশংস বেশ্যা বলতে আমায় কুণ্ঠা করবে না, সার্থক হবে...অপবাদ। ওসব চিন্তা ছাড়ো, যে দেশে খুশী, আমায় সঙ্গে নিয়ে...আজই তুমি বেরিয়ে পড়।"

আমার দিকে ফিরে চাইলেন কোশদাস, বললেন,—

"মহাশয় আপনি তো একটি ভৌগলিক মানুষ। আচ্ছা, আপনার দেখা এই এতগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে কোন্ রাষ্ট্রটি বেশ সমৃদ্ধ আর সম্পন্নশস্য ব'লে আপনার মনে হয়?. কোন্ রাষ্ট্রেই বা রয়েছে সত্যি-কারের ভদ্রমানুষের বাস?"

ঈষৎ হেসে উত্তর দিলুম,—

"মহাশয়, অতি বিস্তীর্ণা এই অর্ণবাম্বরা ধরণী। ধরণীর এখানে ওখানে কত যে রম্য জনপদ ছড়িয়ে রয়েছে, তার কি আর হিসাব চলে? সে কথা এখন থাক্। আপনারা দুজনেই যাতে এইখানেই সুখে ঘর করতে পারেন, তার একটা সুব্যবস্থা যদি আমি ক'রে দিতে

পারি, তা হ'লেই তো গোলযোগ মেটে। যদি না পারি আমিই তখন না-হয় আপনাদের পথ-প্রদর্শক হব।"

এমন সময় আমাদের কানে এল···অনেকগুলি চরণের, রতন-নূপুরের রুণু রুণু ধ্বনি। সসম্ভ্রমে উঠে পড়লেন চন্দ্রসেনা, বললেন—

"রাজনন্দিনী কন্দুকাবতী এসে গেছেন। কন্দুকখেলা দেখিয়ে আরাধনা করবেন ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীকে। কন্দুকোৎসবে এঁর দর্শন···নিষিদ্ধ নয়। যদি সার্থক করতে চান চক্ষুঃ, দুজনেই দেখবেন আসুন। আমি সখীর কাছে চলছি।"

এই ব'লে চন্দ্রসেনা চ'লে গেলেন। আমরা দুজনে অনুগমন করলুম তাঁর।

বিরাট রত্ন-রঙ্গপীঠ। মাঝখানে·· তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। লাল টুকটুকে ঠোঁট। এই প্রথম দেখলুম তাঁকে···আর দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার হৃদয়পীঠে চিরস্থায়িনী হয়ে গেলেন তিনি।

আমার মতো অন্যেরাও তাঁকে দেখলেন;—আড়াল থেকে নয়, প্রকাশ্যে। তবু···অদ্ভুত একটা বিস্ময়,···চিহ্নিত হয়ে রইল আমার চিত্তের চিন্তায়। চিন্তায় ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠল 'আক্ষেপ'-অলঙ্কার—

"ইনিই কি লক্ষ্মী? না, না। তাঁর হাতে তো পদ্ম থাকে! কিন্তু এঁর হাতখানিই যে পদ্ম! তিনি তো পুরাতন পুরুষ-প্রবরদের, প্রাচীন রাজাদের···ভুক্তপূর্বা। কিন্তু এঁর মধ্যে যে আমি কেবল দেখতে পাচ্ছি অভুক্ত একখানি অনবদ্য যৌবন!"

এই রকমের চিন্তা করছি; এমন সময় রাজনন্দিনী···সর্বগাত্রে একখানি অনিন্দনীয় শ্রীবিকাশ দেখিয়ে, বিপর্যস্ত হস্ত-পল্লবের অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করলেন মণিকুট্টিম। থরে থরে ঝরে পড়ল··· আলোল অলকের কুটিল নীলিমা। সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন ভগবতী ভবানীকে।

তারপরে ধীরে ধীরে গ্রহণ করলেন কন্দুক।···কন্দুকটি যেন অনঙ্গদেবের তপ্তরাগরূষিত চক্ষুঃ।

মণিভূমিতে ফেলে দিলেন সেই কন্দুক···লীলার শিথিলতায়। মাটি ছুঁয়ে উর্ধ্বে লাফিয়ে উঠল কন্দুক। কোমল অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত ক'রে, পদ্মের স্পন্দিত পাপড়ির মতো স্বল্পকুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে···তিনি কঠোর আঘাত করলেন কন্দুকটিকে। করপৃষ্ঠে সেটিকে গ্রহণ ক'রে, আবার ছুঁড়ে দিলেন···উপরে। কন্দুকটি যখন নীচে পড়তে লাগল, তখন শূন্যেই সেটিকে ধ'রে ফেললেন। মনে হ'ল চটুল চোখের গঞ্জনায় ভীত হয়েই যেন তাঁর মুঠোর মধ্যে ধরা দিয়ে গেল··· ভ্রমরের-মালায়-গাঁথা ফুলের একটি তোড়া।

তার পরে তিনি ছুঁড়তে লাগলেন কন্দুকটিকে—মধ্যলয়ে, বিলম্বিতলয়ে এবং দ্রুতলয়ে। মৃদু মৃদু প্রহার করতে করতে, একবার এগিয়ে গিয়ে, আবার আচম্‌কা ফিরে এসে···প্রদর্শন করলেন 'চূর্ণপদ'-মুদ্রা। কন্দুকটি থামতেই, আবার সেটিকে নির্দয়ভাবে প্রহার-জর্জরিত ক'রে আকাশে দিলেন উড়িয়ে; এবং ওড়াবার মুখেই বিপরীত-প্রহার ক'রে পলকে নিলেন থামিয়ে। বাঁ হাত এবং ডান হাত দিয়ে পর্যায়ক্রমে ঘাত অভিঘাত করতে করতে, ডানা-মেলা পাখীর মতো, সেটিকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন শূন্যপথে। দূরে উঠে আবার যখন সেটি পড়ছে ··তখন অভি-হননের সঙ্গে সঙ্গে·· দশ-পা পরিক্রমা ক'রে রচনা করলেন 'গীতমার্গ'-মুদ্রা। দিকে দিকে কন্দুটিকে পাঠিয়ে দিয়ে, আবার যেন টেনে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন সেটিকে।

নৃত্যের করণ-গুলির মাধুর্য উপভোগ করতে করতে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন দর্শকেরা। তাঁদের মুখ থেকে প্রতিক্ষণ ঝ'রে পড়তে লাগল প্রশংসার ঝর্ণা। আর আমি···কোশদাসের কাঁধের উপর হাত রেখে অবাক্-বিস্ময়ে রাজনন্দিনীর মুখের পানে চেয়ে··· দেখতে লাগলুম নাচের ঠাট্-ভাব। কোশদাসের অবস্থাও আমারি মতন; কণ্টকিত তাঁর গণ্ড, ফোটা ফুলের মতো চোখ।

ভুলতে পারব না রাজনন্দিনীর সেই নৃত্য। পরমোত্তেজিত একখানি আগ্রহ আমাকে যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে দিতে লাগল নৃত্তের উপকরণ ও প্রয়োগ।

তাঁর নয়নকটাক্ষ,···সে কি নবাগত কন্দর্পের প্রাথমিক সৃষ্টি?

কটাক্ষের অনুসরণ ক'রে···ভাঙ্ ভুটির সে কী লীলায়িত হিন্দোল!

নিঃশ্বাসের বেগে হিল্লোলিত হয়ে উঠল রাজনন্দিনীর অধরমণির কিরণজাল!···মনে হ'ল একখানি লীলাপল্লব যেন কেবল···তাড়া দিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে মুখ-পদ্মের গন্ধ-মাতাল মধুপ-দের।

'মণ্ডল'-ভ্রমণ ক'রে নাচতে নাচতে রাজকন্যা···এত জোরে আর ছড়িয়ে···নাচাতে লাগলেন সেই কন্দুকটিকে যে মনে হ'ল;··· আমাকে দেখতে পেয়েই যেন লজ্জায়·· একটি ফুলের পিঞ্জর তৈরি ক'রে ফেলেছেন তিনি অচিরে এবং নিজে প্রবেশ করেছেন তার মধ্যে!

'পঞ্চবিন্দু'-করণের প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়ে, নৃত্যের পঞ্চঘূর্ণির মধ্যে এমনভাবে পাঁচবার প্রহার করলেন কন্দুকটিকে, যে দেখে মনে হ'ল, পঞ্চবাণের পাঁচটিই বাণ একসঙ্গে যেন ছুটে এল,—মূর্তিমান ত্রাস তাঁকে যেন জাঁতায় ফেলে পিষল।

তারপরে তিনি নেচে দেখালেন 'গোমূত্রিকা-প্রচার'। সে কী নাচ! মেঘের মধ্যে অনুরাগের বিলাস ফলিয়ে···যেন খেলে গেল বিদ্যুতের লতা। ভূষণমণির ঝঙ্কারের তালে তাল রেখে রেখে সে কী লয়দার সংবাদী চরণ-পাত! আর তার সঙ্গে সঙ্গে···ছলভরা হাসির মিষ্টি আলোকে বিম্বাধরের সে কী মধুস্নান!

দ্রষ্টব্য বটে,—নাচতে নাচতে···

চুল খুলে দিয়ে ফিরে-চুল-বাঁধাটি,···

ঝঙ্কারিণী মেখলার মালাটিকে টান-ক'রে-বাঁধাটি ;···

নিতম্বের প্রথিমার উপর দিয়ে শিথিল অঞ্চলখানিকে গুটিয়ে ধ'রে উপরে তোলার কায়দাটি ;···

আর সঙ্গে সঙ্গে···হাত তুটি কুঞ্চিত ক'রে, কখনো বা প্রসারিত ক'রে, কখনো বা তুলিয়ে তুলিয়ে, আঘাতের পর আঘাত দিয়ে, কন্দুকটিকে নাচানোটি।

কখনো আবর্জিত হ'ল তাঁর বাহুপাশ; পরিবর্তিত ত্রিকের উপরে কখনো লুটিয়ে পড়ল লোল কুন্তল; মূল-খেলায় বাধা না জন্মিয়ে যথাস্থানে কখনো বা সত্বর ফিরিয়ে রাখা হ'ল কান-থেকে-খসে-পড়া সোনার ঝুম্‌কো।···আর তারি মধ্যে···কী আশ্চর্য,···হস্তপদের ভিতর দিয়ে, অথবা বাইরে দিয়ে, বারংবার উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘোরে কন্দুক; উন্নমন এবং অবনমনের মাঝখানে, ঐ বুঝি হারায় হারায় দেখা দিয়েও অদৃশ্য হয়ে যায়··ক্ষীণ কটির ভ্রমী; উৎপতন এবং অধঃপতনের মধ্যে, ঐ বুঝি,···গণ্ডগোলে প'ড়ে গেল মুক্তার নহর! আর থেকে থেকে, স্তনতটের শিথিল অংশুকটিকে···হাল্কা হাতের পাতা দিয়ে রাজনন্দিনীর সে কী গুছিয়ে গুটিয়ে-তোলার বাহার-টি! অদ্ভুত · বিচিত্রভাবে—নৃত্যকলায় প্রকাশ পেতে লাগল,—

কখনো শয়নের, কখনো জাগরণের ভঙ্গিমা,
কখনো নিমীলন, কখনো উন্মীলনের মাধুর্য,
কখনো গতির, কখনো স্থিতির···লালিত্য।

তারপরে তিনি নিবেদন করলেন ভূতলচারী ও আকাশচারী নৃত্য; এবং সেই সঙ্গে একটিমাত্র কন্দুক নিয়ে, অনেকগুলি কন্দুকের ভ্রমজন্মানো এক আশ্চর্য কন্দুক-ক্রীড়া! তারপরে হ'ল চন্দ্রসেনা-প্রমুখ প্রিয়সখীদের নিয়ে মণ্ডল-নৃত্য-বিহার। বিহার-শেষে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে অভিবন্দনা ক'রে রাজনন্দিনী প্রস্থান করলেন কুমারীপুরের অভিমুখে। অনুগামী হয়ে ধীরে ধীরে চ'লে গেল তাঁর পরিজন, এবং প্রেমারুণ আমার মন।

যেতে যেতে তিনি কি সত্যিই আমার কাছে রেখে দিয়ে গেলেন ফুল-শরের নীলপদ্মে-গড়া বাণখানি ?···তাঁর ঐ নয়ন-কোণের দিঠি ?

যেতে যেতে তিনি কি সত্যিই আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন ·· বারংবার···তাঁর ফেরা-মুখের চন্দ্রোচ্ছলা ছলনা ?·· যেন তাঁর নিজস্ব হৃদয় ?

আবার···ফিরিয়ে দিলুম কিনা,···সেটি নিরীক্ষণ করতে করতে, সত্যিই কি কুমারীপুরে প্রস্থান করলেন রাজবালা ?

আর আমি ! আমার কথা আর কি বলি ! আমি সেদিন প্রথম বুঝলুম,—অনঙ্গ-বিহ্বল হয়ে পড়াটি···কী নিদারুণ একটি বস্তু !

ঘরে ফিরে এলুম। কেমন যেন আচ্ছন্ন। যত্নের উদারতা দেখিয়ে আমাকে স্নানভোজন করালেন কোশদাস।

সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রসেনা এলেন,···সঙ্গোপনে। আমাকে প্রণাম করলেন।

কোশদাসের কাঁধটিতে নিজের কাঁধ দিয়ে, প্রণয়-পেশল একখানি পেষণ দিতে দিতে ব'সে পড়লেন পার্শ্বে। হর্ষের পরামর্শে ব'লে উঠলেন কোশদাস,

"বলি···ও ডাগর চোখের লক্ষ্মী, যে কটা দিন বাঁচি, যেন এমনি ক'রেই তোমার প্রসাদ পাই।"

একটু হাস্য ক'রে বললুম—

"সখে, এত হতাশ হবার কিছু নেই। আমার কাছে···অঞ্জন আছে। অঞ্জনটি আঙুলের ডগায় নিয়ে আপনাকে কেবল টেনে দিতে হবে প্রেয়সীর চোখে। অদ্ভুত কাণ্ড ঘ'টে যাবে। রঞ্জিত-অবস্থায় রাজপুত্র···আপনার প্রেয়সীর দিকে নয়ন-নিপাত করলেই··· দেখবেন বানরী-মূর্তি ! বিরক্ত হয়ে তখন জংলীটাকে ত্যাগ করবার পথ নিজেই তিনি খুঁজে পাবেন না।"

বাণীতে হাসি ঠেসে চন্দ্রসেনা বললেন—

"আপনার মতো একজন আর্য-পুরুষের মুখে এমন একটি আজ্ঞা লাভ ক'রে আমার মতো প্রাণীর তবু এখন সংজ্ঞা ফিরে এল। অনুগৃহীত হয়ে গেলাম। মানুষ-মূর্তি ছেড়ে ইহ-জন্মেই বানরী-মূর্তি লাভ,– এর চেয়ে আর বড় সৌভাগ্য কী হতে পারে মেয়েমানুষের? তা সে বিয়ে এখন স্থগিত থাক্, ··নিষ্প্রয়োজন। কার্যোদ্ধারের অন্য পথও রয়েছে। আজ যে ঐ কন্দুকখেলাটি হয়ে গেল, সেখানে রাজকুমারী একটি পুরুষ-মূর্তিতে লক্ষ্য করেছেন 'শ্রীমদনের ভাঁড়-মূর্তি'। মূর্তিটিকে তাঁর মনে ধরেছে। তিনিই··মহাশয় আপনি। ঠাট্টা নয়। আর কী যাতনাটাই না এখন ইন্দ্রদেব দিচ্ছেন আমাদের রাজপুত্রীকে! আমি জানতে পেরে গেছি রাজকন্যার মনের ভাব। যাই হোক্, এখন কিন্তু আমাদের আসল কাজটি সারতে হবে। আমার মা—তিনি রাজকুমারীর ধাই-মা তাঁর কাছে আমি সমস্ত প্রকাশ ক'রে দেব। মা আবার তখনি ছুটে যাবেন মহিষীর কাছে;—মহিষী আবার ছুটে যাবেন মহারাজের কাছে। সব জানাজানি হয়ে যাবে। মহারাজ তখন উপায়ান্তর না দেখে, আপনার হাতেই তুলে দিতে বাধ্য হবেন দুহিতাটিকে। রাজপুত্তুরটিকেও তখন আপনার অনুজীবী হয়েই থাকতেই হবে। দেবতার আদেশ,—লঙ্ঘাবে কে? রাজ্য আপনার করায়ত্ত হবে,—আর আপনার আদেশ অমান্য ক'রে আমাকে তখন অবরুদ্ধ ক'রে রাখা···ভীমধন্বার পক্ষেও নিতান্তই হবে অসম্ভব। আপাততঃ কিন্তু আমাদের অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে তিন-চারটে দিন।"

এই মন্ত্রণা দিয়ে আনন্দের আতিশয্যে,·· কোশদাসকে পুনর্বার জড়িয়ে ধরলেন চন্দ্রসেনা। সোহাগ-শেষে ফিরে গেলেন মন্দিরে। কোশদাস আর আমি···প্রস্তাবটি নিয়ে বহুক্ষণ জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলুম। দেখতে দেখতে ক্ষীণ হয়ে এল রাত্রি।

প্রভাত হ'ল। প্রাভাতিক বিধি সমাপন ক'রে, উদ্যানের দিকে বেড়াতে বেড়াতে চলেছি;—আহা, সেই উদ্যান—যেখানে দর্শন দেন

প্রিয়া ; মন নিয়ে করছি খেলা ; এমন সময় উদ্যান-ভ্রমণে এলেন রাজপুত্র। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কী তাঁর নিরভিমানতা! কী তাঁর সুন্দর বচন-ভঙ্গি! অলৌকিক কত কথা! কী অনুকুল! আমার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে, শেষে আমন্ত্রণ ক'রে আমাকে ধ'রে নিয়ে গেলেন রাজ-অতিথিশালায়। রাজ-খাতিরে স্নান, রাজার হালে ভোজন, শয়নাদির সে কী আত্মসমান পরিপাটি ব্যবস্থা! মাথায় বালিশ দিয়ে শেষে আরামে শুয়ে পড়লুম পালঙ্কে। স্বপ্ন দেখতে লাগলুম,—প্রিয়া এসেছেন, আমি তাঁকে দেখছি, ধীরে ধীরে অঙ্গে দিচ্ছি আলিঙ্গন, ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে এক অনিন্দ্য সুখের জড়িমা···এমন সময় হঠাৎ আমার উপর লাফিয়ে পড়ল কতকগুলো ষণ্ডামার্কণ্ড প্রহরী। হাত-পা ছোঁড়বার অবকাশ পেলুম না। লোহার শিকল দিয়ে তারা বেঁধে ফেলল আমাকে। চেয়ে দেখি রাজপুত্র দাঁড়িয়ে আছেন,···বলছেন,—

"মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল আপনার। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, হতভাগিনী চন্দ্রসেনার আলাপ,·· জালি-কাজের ফাঁক দিয়ে। আর·· আমি শুনেছি আমার সেই কুঞ্জী বোনটির সঙ্গে আপনার স্বপ্ন-সম্ভাষণ। কী মধুরালাপ! কী আদরের ডাক! 'বরাকী কন্দুকাবতী'!···তাঁকে আপনি চান। বিবাহ করবেন। আমাকে থাকতে হবে আমরণ আপনার অনুজীবী হয়ে? আর আপনার আদেশ মান্য ক'রে কোশদাসের হস্তে আমাকে সঁ'পে দিতে হবে···চন্দ্রসেনা? পাকা বন্দোবস্ত!"

তারপরেই এক পার্শ্বচরকে ডেকে আদেশ দিলেন—

"যাও, মহাপুরুষটিকে সাগরের জলে ফেলে দিয়ে এস।"

পুলকিত হয়ে উঠল পার্শ্বচর। যেন হাতে পেয়ে গেল রাজত্ব। "যে আজ্ঞা" ব'লে সরাসরি তামিল ক'রে বসল হুকুম। নিক্ষিপ্ত হলুম দূর সমুদ্রের গর্ভে।

অবলম্বনহীন, নিরুপায়···হাত চালাতে পারছি না···ইতস্ততঃ স্পন্দমান · অকস্মাৎ দৈব যেন আমার হাতের মধ্যে ঠেলে দিলেন একখানা কাঠ। বুকের নীচে কাঠখানাকে রেখে ভাসতে লাগলাম। দিন শেষ হয়ে গেল, রাতও শেষ হয়ে গেল। পরের দিন, সবে তখন ভোর হয়েছে, চোখে পড়ল একটি 'বহিত্র'। দাঁড়টানা সেই অর্ণব-যানটির নাবিকেরা ছিল যবন। তারা আমাকে উদ্ধার ক'রে বাঁচায়। নাবিক-নায়ক 'রামেষু'র কাছে গিয়ে তারা বলে—

"লোহার জিঞ্জির-বাঁধা একটা মানুষকে জল থেকে আমরা তুলেছি। লোকটা আশ্চর্য, বলে কি না, এক মুহূর্তে সে হাজার দ্রাক্ষার রস বার করতে পারে!"

এমন সময়ে তারা দেখতে পায়,···বহু নৌকা-পরিবৃত হয়ে একখানি 'মদ্‌গু' (রণপোত) বহিত্রটির দিকে ধেয়ে আসছে। যবনেরা ভয় পেয়ে যায়। শিকারী কুকুর যেমন ক'রে বরাহকে আক্রমণ করে, নৌকোগুলোও সেই রকম ক'রে ঘেরাও ক'রে ফেলে আমাদের বহিত্র-টিকে। আরম্ভ হয় সংঘাত। যবনেরা হারতে থাকে। অন্য কোনো গতি নেই, ধীরে ধীরে তারা অবসন্ন হয়ে পড়ছে দেখে, আমি তাদের আশ্বাস দিয়ে বলি—

"আমার শৃঙ্খল খুলে দাও। আমিই পরাস্ত করব তোমাদের শত্রু।"

শৃঙ্খল খুলে গেল। আমি তখন ভীমটঙ্কার শার্ঙ্গধনু থেকে ভল্ল বর্ষণ করতে করতে নিপাত করতে লেগে গেলুম শত্রু। হত-বিধ্বস্ত যোদ্ধা নিয়ে আমাদের বহিত্রটি তখন মদ্‌গুর গায়ে এসে ভিড়েছে। লাফিয়ে পড়লুম। দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন নাবিক-নায়ক, একাকী; জীবন্ত বন্দী করলুম তাঁকে। তিনি আর কেউ নন···আমাদেরই রাজপুত্তুর ভীমধন্বা। তাঁকে চিনতে পেরে আমার কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা···হতে লাগল। শেষে হেসে বললুম—

"মহাবীর কৃতান্তের খেলা তো এবার দেখলেন?"

কিন্তু ততক্ষণে যবন-বণিকেরা, আমারই শৃঙ্খল দিয়ে কঠিন-বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে ভীমধন্বাকে এবং হর্ষধ্বনিতে গগন ফাটিয়ে পূজো করতে লেগে গেছে আমাকেই।

এর কিছু পরেই ঝড় উঠল। অনেক দাঁড়ী মারা গিয়েছিল। ঝড়ের মুখে অসহায়ের মতো আমরা উড়ে চললুম। ঝড় যখন থামল তখন দেখা গেল, তরী আমাদের আটকে গেছে···অচেনা এক দ্বীপে। কী করা যায়! এখান থেকেই তা হ'লে সংগ্রহ করতে হয় পানীয় জল, জ্বালানি কাঠ, কন্দ, মূল, ফল। গত্যন্তর নেই। সমূহ বিবেচনা ক'রে, শেষে নোঙর ফেলা হ'ল।

দ্বীপে বিরাজমান···একটি মহান্ শৈল। নামলুম। ঘুরতে ঘুরতে পোঁছে গেলুম··পাহাড়তলীতে। নয়ন কেবল দেখে, আর সানন্দে কথা কইতে থাকে মন,—

"সত্যিই, রমণীয় বটে পর্বতের এই নিতম্বভাগ। আবার···তার চেয়েও কমনীয় দেখছি এর গন্ধপাষাণবতী উপত্যকা।···বাঃ, পাহাড়ী ঝরনার জলও তো ভারি ঠাণ্ডা! আবার জলে ভাসছে লাল পদ্ম আর নীল পদ্মের মকরন্দবিন্দুর চন্দ্রক! রমণীয় রমণীয় স্থান। বনের কিনারায়, আহা, কী ফুলটাই না ফুটেছে! রঙের কী জেল্লা! ফুলের মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে একেবারে মশগুল হয়ে গেছে গাছ।"

সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে,···তৃপ্তচোখে ততটা লক্ষ্য করি নি · কখন না জানি উঠে পড়েছি···পাহাড়ের চূড়োয়! একেবারে পরাভূত হয়ে গেলুম। সেখানে এক কুমুদের, কহ্লারের, কমলের পরাগধূসর সরোবর! পদ্মরাগমণির সোপান-শিলা! লাল হয়ে রয়েছে ঘাট।

সরোবরে নেমে স্নান সারছি, ধীরে ধীরে আস্বাদন করছি অমৃত-স্বাদু কচি কচি মৃণাল, কাঁধে এসে লাগছে কহ্লারের কমনীয়তা,··· এমন সময় তীরে এসে উপস্থিত হলেন এক ব্রহ্মরাক্ষস। ভীমের মতো তাঁর চেহারা। ভয়ানক ভর্ৎসনা করতে করতে প্রশ্ন করলেন—

"কে তুই, কোথা থেকে এসেছিস?"

নির্ভয়ে উত্তর দিলুম,

"সৌম্য, আমি দ্বিজন্মা। শত্রুর হাত থেকে সাগরে ; সাগর থেকে যবনের নৌকায় ; নৌকা থেকে এই বিচিত্র-শিলা পর্বত-শ্রেষ্ঠে শুভাগমন করেছি। স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে করতে, এখন আমি সরোবরে স্নানে নেমেছি ; এবং বিশ্রাম করছি। আশা করি আপনার সব কুশল।"

চীৎকার ক'রে উঠলেন ব্রহ্মরাক্ষস। বললেন—

"বাঁচতে যদি চাস্,···আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দে। না দিতে পারিস, তোকে আমি আহার করব।"

আমিও বললুম—

"বেশ, তাই হবে, প্রশ্ন করুন।"

তখন আমাদের মধ্যে আর্যাছন্দে এই সংলাপ হ'ল,—

"ক্রূর কি ?"···"স্ত্রীহৃদয়।"

"গৃহী কে ?"···"যাঁর ঘর আলো করেন প্রিয়কল্যাণী গুণবতী ভার্যা।"

"কাম কে ?" "সংকল্প।"

"দুষ্করের সাধন করেন কে ?" "প্রজ্ঞা।"*

প্রশ্নোত্তর শেষ হ'ল। আমি পুনশ্চ বললুম—

"ধূমিনী, গোমিনী, নিম্ববতী এবং নিতম্ববতীই···আমার উত্তরের প্রমাণ।"

ব্রহ্মরাক্ষস স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বললেন—

"তাঁরা আবার কে ? কীদৃশী ? আমায় বলুন।"

আমি তখন প্রথমটির উদাহরণ দিলুম—

১। 'ত্রিগর্ত' নামে এক জনপদ ; সেখানে বাস করতেন তিন জন

* কিং ক্রূরং স্ত্রীহৃদয়ং কিং গৃহিণঃ প্রিয়হিতায় দারগুণাঃ
কঃ কামঃ সংকল্পঃ কিং দুষ্করসাধনং প্রজ্ঞা ॥

গৃহপতি। প্রচুর সারধনে তাঁরা স্ফীত। তিন জনেই সহোদর ভাই। ধনক, ধান্যক, এবং ধন্যক তাঁদের নাম। তাঁদের জীবদ্দশাতেই আকাল পড়ল ; দ্বাদশ বৎসর বর্ষণ করলেন না ইন্দ্রদেব।

ক্ষীণসার হ'ল শস্য, ওষধিরা হ'ল বন্ধ্যা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ···ফল নেই একটিও। মেঘেরা ক্লীব, ভিন্ন-খাতে বইতে চ'লে গেল নদীর ধারা। পুকুরগুলোয় বেরিয়ে পড়ল পাঁক ; ঝরনায় জল শুকাল ; বিরল হ'ল ফল মূল কন্দ।

মানুষের মুখে রা নেই ; ব্রত পাঠ বন্ধ। বেড়ে গেল চোর-ডাকাতদের আড্ডা। প্রজাদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ির ধুম প'ড়ে গেল। সর্বত্রই লুটতরাজ। পথে ঘাটে, এখানে সেখানে মড়ার হাড়ের ছড়াছড়ি, বক-বলাকদের মতো কেমন যেন ফ্যাকফ্যাকে সাদা।

মুখ হ্যাঁ ক'রে মণ্ডলে মণ্ডলে উড়তে লাগল কাক। শূন্য হয়ে গেল···নগর, গ্রাম, খর্বট, পত্তন ইত্যাদি।

বিপদে পড়লেন তিন জন গৃহপতি। তাঁরা ধনী হলে হবে কি ? ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল প্রলয় তাঁদেরও সংসারে। ধানের অতগুলি গোলা, শূন্য হয়ে গেল। গৃহপালিত ছাগল, ভেড়া, গরু, মোষ···খাওয়া হয়ে গেল। তার পরে তাঁরা একটি একটি করে খেতে লাগলেন— দাস দাসী, ছেলেপিলে ; তারপরে খেলেন বড়বউকে, খেলেন মেজবউকে। এবার এল ছোটবউ ধূমিনীর পালা। স্থির হ'ল আগামী কাল তিন ভাইয়ে মিলে তাঁকেই খাবেন।

কিন্তু ছোট ভাই ধন্যক,···নিজের প্রেয়সীকে ভক্ষণ করতে অক্ষম হলেন, ধূমিনীকে সঙ্গে নিয়ে নিশীথে ঘর ছেড়ে তিনি পালালেন। ভালবাসার বউ ধূমিনী,—পথ চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, আর ধন্যক তাঁকে পিঠে ব'য়ে চলতে থাকেন পথ। চলতে চলতে তাঁরা প্রবেশ করলেন বনে। ক্ষুধায় অন্ন নেই, পিপাসায় জল নেই, নিজের দেহ থেকে মাংস কেটে কেটে ধন্যক খাওয়াতে লাগলেন ধূমিনীকে। এমন

সময়,·· সেই বনের মধ্যে · তাঁরা হঠাৎ দেখতে পেলেন—একটি পুরুষমানুষকে। তাঁর হাত পা নাক কান কাটা—মাটিতে প'ড়ে তিনি ছটফট করছেন। করুণায় ভিজে গেল ধন্যকের মন। কী করেন! তাঁকেও কাঁধের উপর তুলে নিয়ে ধন্যক প্রবেশ করলেন আরো গভীর বনে। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে পাওয়া গেল কন্দ, মূল, ফল এবং মৃগ। সেইখানেই পর্ণকুটির রচনা ক'রে তিন জনে বাস করতে লাগলেন। বিকৃত পুরুষটির ব্রণক্ষত ইত্যাদি ইঙ্গুদী তৈলের উপচারে ধীরে ধীরে নিরাময় ক'রে, শাকপাতা আমিষাদির পুষ্টিকর পথ্য খাইয়ে···ধন্যক তাঁকে আত্মনির্বিশেষে সেবা করতে লাগলেন, ফিরিয়ে আনলেন তাঁর স্বাস্থ্য। নীরোগ পুরুষের মতো ··মানুষটিও ক্রমে উদ্রিক্ত-ধাতু হয়ে উঠলেন। তারপরে একদিন যখন ধন্যক হরিণ-শিকারে বেরিয়েছেন তখন ধূমিনী দেবী কামাতুরা হয়ে পুরুষটির কাছে প্রার্থনা করলেন প্রেম-প্রসঙ্গ এবং ভর্ৎসিতা হয়েও বলপ্রয়োগ ক'রে দেহের ক্ষুধা মেটাতে দ্বিধা করলেন না।

ক্লান্ত স্বামী কুটীরে ফিরে এলেন। ধূমিনীকে বললেন—"একটু জল দেবে?" ধূমিনী উত্তর দিলেন—"কুয়ো থেকে জল তুলে খাও, মাথায় বড় ব্যথা।"

ধন্যকের সামনে তিনি ফেলে দিলেন ঘড়া আর দড়ি। তারপর যখন ধন্যক কুয়ো থেকে জল তুলতে লাগলেন, তখন···পিছন থেকে ধাক্কা মেরে তাঁকে কুয়োর ভিতর ফেলে দিতে একটুও বাধল না প্রেয়সীর, এবং তারপরই বিকলাঙ্গ · পুরুষটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে পর্ণকুটির ছেড়ে উধাও হয়ে গেলেন ছোটবউ। ফিরতে লাগলেন দেশে দেশান্তরে। বিকলাঙ্গ স্বামীকে কাঁধে নিয়ে ভিক্ষা করছেন স্ত্রী···পাতিব্রত্যের এই অদ্ভুত পরিচয় পেয়ে, ধন্য ধন্য করতে লাগল দেশ-দেশান্তরের লোক। পূজা পেতে দেরি হ'ল না ধূমিনীর। রাজার অনুগ্রহ লাভ ক'রে বিশেষ ঐশ্বর্যবতী হয়ে তিনি সুখে বাস করতে লাগলেন অবন্তি-দেশে।

এদিকে সেই বনের মধ্যে সেদিন জলের সন্ধানে প্রবেশ করেছিলেন একদল বণিক। তাঁদের কানে পোঁছয় ধন্যকের আর্তনাদ। কুয়োর ভিতর থেকে তাঁরাই উদ্ধার ক'রে তুলে ফেললেন সঙ্কটাপন্ন ধন্যককে।

সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলেন ধন্যক। কিন্তু আজ ধন্যক নিঃসহায়···নিরন্ন এক ভিক্ষুক। আহারের চেষ্টায় চরতে লাগলেন অবন্তিদেশে।

হঠাৎ ধূমিনী একদিন তাঁকে দেখতে পেলেন নগরের পথে। উর্বর মস্তিষ্কেই বুদ্ধি জোগায়। জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তখনি ধূমিনী দেবী চীৎকার দিয়ে উঠলেন—

"এই দুরাত্মাটাই আমার স্বামীকে বিকলাঙ্গ ক'রে দিয়েছে।"

এবং রাজাকে দিয়ে আদেশ দেওয়ালেন—নির্দোষ ধন্যকের চিত্রবধ! পিছন দিকে দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা বধ্যভূমিতে নীত হলেন ধন্যক। কিন্তু তখনও বোধ হয় তাঁর আয়ুর সামান্য কিছু বাকি ছিল, তাই হঠাৎ ধন্যকের মুখ থেকে বেরিয়ে এল অন্তিম প্রার্থনা—

"মহারাজ, যাঁকে আমি বিকলাঙ্গ করেছি ব'লে আপনি সন্দেহ করছেন, সেই ভিক্ষু আমাকে একবার চোখে দেখুন; তিনি বলুন— আমি পাপ করেছি; তারপরে যেন রাজদণ্ড নামে।"

"দোষ কি?"—এই চিন্তা ক'রে রাজা আদেশ দিলেন—

"বিকলাঙ্গকে নিয়ে এস।"

বিকলাঙ্গ এলেন। ধন্যককে দেখলেন। চোখ ফেটে দরদরধারে ঝরতে লাগল জল। কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন নির্দোষ ধন্যকের পায়ে। আর্যবুদ্ধির উদয় হওয়াতে ধন্যকের সুকৃতির কথা, এবং দুশ্চরিত্রা ধূমিনীর শঠতা মিথ্যাবাদিতা—সমস্তই তিনি সম্পূর্ণ নিবেদন করে দিলেন রাজ-চরণে।

রাজা রেগে আগুন। দুশ্চারিণী ধূমিনীর মুখখানাকে তৎক্ষণাৎ কদাকার করিয়ে দিয়ে আদেশ দিলেন—

"কুক্কুরের পাচিকা হয়ে বেটী থাক।"

রাজার প্রসাদভূমিতে আরোহণ করলেন ধন্যক।

তাই বলেছিলুম—"স্ত্রী-হৃদয় অতিক্রুর॥"

ব্রহ্মরাক্ষস তখন শুনতে চাইলেন দ্বিতীয় উপাখ্যান। "গোমিনী"-বৃত্তান্ত তাঁকে শোনালুম।—

২। দ্রাবিড়দেশে কাঞ্চীনগরীতে, কোটি-কোটিপতি এক শ্রেষ্ঠীর একটি পুত্র ছিলেন। 'শক্তিকুমার' তাঁর নাম। তিনি যখন অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করব করব করছেন তখন তাঁর মাথায় এল এক বিচিত্র চিন্তা,—

> "যিনি অবিবাহিত, তাঁর তো সুখ নেই জীবনে; আবার যিনি বিবাহিত, তিনিও যদি তাঁর স্ত্রীর মধ্যে নিজের পছন্দসই গুণ খুঁজে না পান—তাঁরও সুখ নেই জীবনে। এখন কেমন ক'রে বোঝা যায় গুণবতী ভার্যা কে?"

পরের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রে, আকস্মিক সম্পত্তির মতো একটি মেয়েকে ভার্যারূপে ঘরে তোলার মধ্যে কোন মাধুর্য বা সমীচীনতা নেই, এই উপলব্ধি ক'রে শক্তিকুমার একদা গণৎকারের ভেক নিয়ে, কাপড়ের খুঁটে এক পালি শালিধান বেঁধে বেরিয়ে পড়লেন মুক্ত পৃথিবীতে।

"পাত্রটি জ্যোতিষী, লক্ষণজ্ঞ"···সুতরাং কন্যাবন্ত পিতৃদেবেরা তাঁকে কন্যা প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত হতেন না। আবার ঘুরতে ঘুরতে যদি বা কোন সবর্ণা লক্ষণবতী কন্যা শক্তিকুমারের চোখে পড়ল, তখন তিনিও কন্যার গুণাবলী পরীক্ষা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। গম্ভীর হয়ে তিনি কেবলমাত্র একটি প্রশ্নই করতেন—

"কল্যাণি, এই শালিপ্রস্থ ধান্য দিয়ে,···কৌশলে রেঁধে-বেড়ে পরিপাটী ক'রে ভোজন করাতে আমাকে পারবেন?"

সব মেয়েই হেসে উঠত। এ কী, তামাসা করেছেন নাকি?

খেদিয়ে দিত শক্তিকুমারকে। এমনি ক'রে এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি···শক্তিকুমারের দিক্‌ভ্রমণ চলছিল। শিবিরাজ্যের কাবেরী-তীর-পত্তনে একদিন এসে পৌঁছেছেন, একটি ধাত্রী তাঁকে দেখাল একটি কুমারী। নিরাভরণা কুমারী। বাপ-মায়ের সঙ্গে পত্তনে এসেছেন। এককালে তাঁদের বিপুল ধনমান ছিল, এখন নেই; ঘরবাড়ি যা ছিল, এখন নেই; সব নষ্ট হয়ে গেছে। কুমারীটিকে শক্তিকুমার, যাকে বলে, লগ্ন-চক্ষুঃ হয়ে দেখতে লাগলেন। তর্ক উঠল মনে—

"এই মেয়েটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি···রোগা নয়, মোটা নয়, বেঁটে নয়, বেশি ঢ্যাঙাও নয়। বেঢপ কিছু তো চোখে পড়ছে না। মাজাঘষা গা। আঙুলের তলা লাল। যবরেখা রয়েছে; মৎস্য-কমল-কলস···সমস্তই শুভ-চিহ্ন বিরাজ করছে কর দুটিতে। গোড়ালিতে শির জেগে নেই, মাংসল; খাঁজ পড়ে নি গোছে। জঙ্ঘা···সুডোল। নধর উরু দুটি যেন গ্রাস করতে চায় হাঁটু দুটিকে· দেখাই যাচ্ছে না হাঁটু। চক্রবাকের মতো নিতম্ব; শ্রোণীকূপ দুটিরও বিভাগ···শোভন; চতুরস্রকে যেন একবার মাত্রই ভাঁজ দিয়ে মোড়া হয়েছে। হ্যাঁ··· এদিকে

লক্ষণগুলোও সব মিলে যাচ্ছে—

নাভিমণ্ডল—উঁচু নয়, পাতলা, অথচ গভীর। ত্রিবলীর অলঙ্কার পরেছে উদর। বক্ষঃস্থলটিকে বিভাগ ক'রে রেখেছে দুটি পয়োধর; পয়োধরের আরম্ভদেশ বিশাল, বৃন্ত দুটি উন্মগ্ন।

নখের মণিগুলিও কোমল,·· বেদাগ। কাঁধ দুটিও নীচু হয়ে ঢ'লে পড়েছে। লতার মতো বাহু; সন্ধিগুলিও বেশ টোল-খাওয়া। সুকুমারী বলতে হবে। হাতের রেখায়···ধন-ধান্য-পুত্রের প্রাচুর্য-লক্ষণ প্রকট। শঙ্খের মতো কণ্ঠ। যেটিই লিখিত রয়েছে শাস্ত্রে, সেইটিই যেন বসানো হয়েছে এঁর মুখশ্রীতে।

নীচের ঠোঁট—মাঝখান দিয়ে চেরা, টুকটুকে লাল;

চিবুক—ছোট্ট অথচ নিখুঁত ;

কপোল—কঠিন, এবং ভরাট ;

ভুরু দুটি—জোড়া নয়, বাঁকটিও চমৎকার, রঙটিও স্নিগ্ধ নীল ;

নাসিকা—তিলফুলের যেন অনতিপ্রৌঢ় সংস্করণ ;

চক্ষু দুটি—ডাগর ; সাদা কালো লাল—তিনটি রঙে উজ্জ্বল ;···

অধীর-মধুর···অথচ মন্থর ;

ললাট—খণ্ড চাঁদের মতো সুন্দর ;

সার-বাঁধা অলক—ইন্দ্রনীলমণির যেন স্তবক ;

মুখখানি—পদ্ম ;

কাণপাশা দুটি—কুণ্ডলী-পাকানো যেন দুনহর মৃণাল ;

মাথার চুল—খুব বেশি ঢেউ-খেলানো নয়·· স্নিগ্ধনীল যেমনটি হওয়া উচিত তাই ;

চুলের ডগা—চেরা নয়, রুক্ষ নয়,·· সুরভিত।

নাঃ, এই রকমের চেহারার মেয়ে কখনও শীলভ্রষ্টা হয় না। হতে পারে না। এ কি! দেখতে দেখতে যে এঁতে একেবারে সেঁটে যাচ্ছে আমার হৃদয়! আগে পরীক্ষা ক'রে দেখি, তারপর বিবাহের ব্যবস্থা করা যাবে। অবিবেচকের মতো প্রথমেই কাজটা ক'রে ফেলে, শেষে একটির পর একটি মনস্তাপ ঘাড়ে চাপানোর কোনো অর্থ হয় না।"

সতর্ক চিন্তার পর, দৃষ্টিতে স্নেহ মাখিয়ে প্রশ্ন করলেন শক্তিকুমার,—

"কল্যাণি, এই শালিপ্রস্থ ধান্য দিয়ে · কৌশলে—রেঁধে-বেড়ে···পরিপাটী ক'রে ভোজন করাতে আমাকে পারবেন?"

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধা দাসীর মুখের দিকে চাইলেন কন্যাটি। ইচ্ছা থাকলেও, একটি সঙ্কোচের ভাব ফুটে উঠল তাঁর চোখে। তারপরে. তিনি শক্তিকুমারের হাত থেকে ধান্য নিয়ে, অলিন্দের সুসিক্ত ও সম্মার্জিত একটি প্রান্তে পা-ধোবার জল রেখে দিয়ে, বিছিয়ে দিলেন আসন।

প্রথমে গন্ধশালী ধান্যগুলিকে অল্প অল্প ক'রে রোদ্দুরে বেশ ক'রে

শুকিয়ে নিলেন ; মুহুর্মুহুঃ উলটিয়ে পালটিয়ে, সেগুলিকে চেলে, মেঝের উপর সমান ক'রে বিছোলেন ; কুঁদো দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষতে ঘষতে পৃথক ক'রে ফেললেন তুঁষ থেকে চাল। তারপরে ধাত্রীকে বললেন,

"মা, তুঁষগুলো নিয়ে স্যাকরার বাড়ি যাও। তাদের বড় কাজে লাগে তুঁষ। তুঁষ দিয়ে তারা গয়না মাজে, চিকণ করে। দু-চার বুড়ী কড়ি যা পাবে, তা থেকে কিছু কাঠ কিনে নিও ; দেখো, কাঠ যেন খুব বেশি ভিজে না হয়, আবার খুব বেশি যেন শুক্‌নোও না হয় ; ফাঁপা না হয় ! আর কিনো···মাপসই একটি মাটির হাঁড়ি আর দুখানি মাটির থালা !

আদেশমতো কাজ হ'ল। মেয়েটি চালগুলি নিয়ে তখন চ'লে গেলেন ঢেঁকি-শালে। ককুভ কাঠের ঢেঁকি। গড়টি ··খুব বেশি নীচু নয়, বুক তোলা, চওড়া। খয়ের কাঠের মুষল। মুষলটিও গোলগাল, ভারী, সমান-গা, মাঝ-সরু, লোহার পাত দিয়ে গুলো-মোড়া। নিপুণ হাতে লালিত্য ফলিয়ে চালগুলি কুটতে লাগলেন কন্যা। তোলাপাড়ায় ক্লান্ত হয়ে এল তাঁর হাত। তারপর আঙুল ডুবিয়ে একটু একটু ক'রে চাল তুলে নিয়ে, ঘা দিয়ে দিয়ে, কুলোয় ঝাড়তে ঝাড়তে, বেছে ফেললেন কুঁড়ো, বালি আর কাঁকর।

উনুন-পূজা সাঙ্গ ক'রে ফুটন্ত পাঁচগুণ জলে কন্যাটি ছেড়ে দিলেন জল-ধোয়া চাল। ফুর ফুর ক'রে সিদ্ধ হতে লাগল চাল। দানাগুলো যখন নরম হয়ে ফুলের কুঁড়ির মতো হ'ল, তখন আগুনের আঁচ কমিয়ে; হাঁড়ির মুখটি থালা দিয়ে ঢেকে, গেলে দিলেন ভাত। হাতা দিয়ে একটু-আধটু নেড়ে চেড়ে যখন দেখলেন সমান সিদ্ধ হয়ে গেছে ভাত, তখন হাঁড়ির মুখ উলটিয়ে রেখে দিলেন। তারপর জলের ছিটে দিয়ে আগুন নিবিয়ে, বার ক'রে নিলেন পোড়া কাঠ।

কাঠ-কয়লা তৈরি হয়ে গেল ! এবং সেগুলিকে তিনি তখনই বেচতে পাঠিয়ে দিলেন। ধাত্রীকে ব'লে দিলেন—

"বেচে যা পাবে তাই দিয়ে সুবিধে মতো কিনে এনো শাক, ঘি, দই, তেল, আমলা আর তেঁতুল।"

আদেশমতো কাজ হ'ল। তারপরে মেয়েটি শাকাদি দিয়ে দু-এক রকম ব্যঞ্জন রন্ধন করলেন। ভিজে বালির উপর এতক্ষণ রাখা ছিল অন্য একটি নতুন মাটির থালা। সেইটিতে অন্নমণ্ড ঢেলে দিয়ে, তালপাখার অতি মৃদু বাতাস দিয়ে একটুখানি ধোঁয়া মেরে, সলবণ সম্বরা দিলেন ফোঁড়নের। মিহিন-পেশা আমলার গুঁড়ো দিয়ে পদ্ম-গন্ধী ক'রে দিলেন ব্যঞ্জন। তারপর ধাত্রীকে বললেন—

"ওঁকে স্নান সেরে নিতে বল।"

স্নান হয়ে গিয়েছিল কন্যার। স্নানের জন্য শক্তিকুমারকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন তৈল আর আমলা।

স্নান সেরে শক্তিকুমার দেখেন, মেঝে নিকোনো, পিঁড়ে পড়েছে, আঙিনা থেকে কেটে-আনা তিন ফালি কচি কলাপাতার একটি ফালি পিঁড়ের সামনে পাতা হয়ে গেছে···আর তার উপরে সাজানো রয়েছে মাটির দুখানি ভিজে থালা। ভাবতে ভাবতে পিঁড়েতে ব'সে পড়লেন শক্তিকুমার।

মেয়েটি প্রথমে নিয়ে এলেন ভাতের ফেনের শরবত। পান করতেই শক্তিকুমারের মনে হ'ল—সত্যিই যেন দূর হয়ে যাচ্ছে পথশ্রম, জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। হৃষ্ট-হৃষ্ট বোধ হতে লাগল তাঁর। তারপর কলাপাতার উপর পড়ল,···দু হাতা শালীধানের অন্ন, সামান্য একটু ঘৃত, সূপ, শাকাদি ব্যঞ্জন। সেগুলি নিঃশেষিত হয়ে গেলে মেয়েটি পুনর্বার পাতে দিয়ে গেলেন অবশিষ্ট অন্ন এবং তার সঙ্গে জৈত্রী, এলাচ ও দারুচিনির গুঁড়ো-মেশানো দই, ও সুরভিশীতল ঘোলের শরবত। তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করে শক্তিকুমার জল চাইলেন।

নূতন ভৃঙ্গারে ভ'রে কন্যা তখন নিয়ে এলেন গন্ধবারি; অগুরু-ধূপে···ধূপিত, টাটকা পাটল-ফুলে···সুবাসিত! জলে আবার এক থোকা উৎফুল্ল উৎপল!

ধারাকারে জল ঢেলে দিতে লাগলেন কন্যা। মুখের কাছে খুরি ধ'রে শক্তিকুমারও আকণ্ঠ পান করতে লাগলেন জল।

চোখের পাতার উপরে বড় বড় হয়ে দানা বাঁধল সেই জল; যামিনীর শিশিরকণার মতো। তাই কি অরুণারুণ হ'ল আঁখি?

জলের মোহন ধারারবে খাড়া হয়ে উঠল তাঁর কান। অভিনন্দন পেল কি···শ্রবণ?

জলের ছিটে এসে লাগল তাঁর গালে; স্পর্শসুখের যেন এক রোমাঞ্চকর্কশ যৌবনশ্রী!

সত্যিই শক্তিকুমারকে যেন উৎপীড়িত করতে লাগল পরিমল-প্রবাহ। তাই কি ফোটা ফুলের মতো ফুলে উঠল···তাঁর নাক?

বেরিয়ে পড়ল তাঁর জিহ্বা; সে কি মাধুর্যের আকর্ষণে?

মাথা কাঁপিয়ে ঘন ঘন জানান দিয়ে, যখন শক্তিকুমার বারণ করতে লাগলেন···তখন জল ঢালা বন্ধ রেখে মেয়েটি আর একটি ঘটিতে ভ'রে তাঁর হাতে দিয়ে গেলেন আচমনের জল।

বুড়ী ধাই উচ্ছিষ্টাদি মুক্ত ক'রে নিয়ে গোবরের লেশ দিয়ে দিল মেঝেতে। পরিষ্কার মেঝেটিতে নিজের চাদরখানি পেতে শুয়ে পড়লেন শক্তিকুমার। পরীক্ষার ফল যা অশঙ্কনীয়, তাই হ'ল। পরিতুষ্ট শক্তিকুমার বিধিবৎ প্রজাপতির নির্বন্ধ অনুসরণ ক'রে,··· পতিতুষ্টা গোমিনীকে বিবাহ ক'রে গৃহে ফিরে গেলেন।

কিন্তু এত সুখ সইল না গোমিনীর। উপেক্ষিত হ'ল তাঁর ভালবাসা। শক্তিকুমার নিজের ঘরে হঠাৎ বরণ ক'রে নিয়ে এলেন চৌষট্টি-কলাবতী একটি গণিকাকে। কিন্তু···সেই গণিকার সঙ্গেও বিচলিতা না হয়ে, প্রিয়সখীর মতো আচার-ব্যবহার করতে লাগলেন গোমিনী। চোখে ঘুম নেই, সেবা করেন স্বামীকে,—যেন তিনি ঠাকুরদেবতা। ঘরের কাজ যেমন করতেন, তেমনিই ক'রে চলেন, ···উনিশ-বিশ নেই। দয়াদাক্ষিণ্যের অন্ত নেই, লোকজন তাঁর কথায় ওঠে বসে। আপন গুণে তিনি শেষে বশীকরণ ক'রে ফেললেন

স্বামীকে; আয়ত্তে আনলেন কুটুম্বদের। একটিমাত্র পুরুষেরই··· চিরদিন অধীন হয়ে রইল তাঁর জীবন এবং দেহ।

গোমিনী লাভ করলেন ত্রিবর্গ,—অর্থাৎ ধর্মার্থকাম।

তাই বলেছিলুম—"তিনিই গৃহী যাঁর ঘর আলো করেন প্রিয়-কল্যাণী গুণবতী ভার্যা॥"

ব্রহ্মরাক্ষসের অনুযোগে আমি এবার বললুম 'নিম্ববতী'র আখ্যান।

৩। সৌরাষ্ট্রের 'বলভী'-নগরীতে এক নাবিক-পতি বাস করতেন। 'গৃহগুপ্ত' তাঁর নাম। কুবেরের মতো তাঁর বৈভব। তাঁর দুহিতার নাম 'রত্নবতী'। 'মধুমতী'র এক বণিকপুত্র,—'বলভদ্র'—তাঁর নাম, তাঁকে আনিয়ে মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিলেন গৃহগুপ্ত। কিন্তু কল্যাণপ্রদ হ'ল না এই পরিণয়।

নববধূর সঙ্গে গূঢ়মিলনের মধ্যে···কেমন যেন সুখের পূর্ণ আস্বাদ পেলেন না বলভদ্র! কিসের যেন বাধা ঘটতে লাগল। দেখতে দেখতে বিতৃষ্ণাও জন্মাল অল্পবিস্তর। শেষে এমন হ'ল, রত্নবতীর মুখ দেখতেও চাইতেন না বলভদ্র। বিফলে গেল সুহৃদদের সহস্র উপদেশ। রত্নবতীর ঘরে-যাওয়াও পরিত্যাগ করলেন বলভদ্র। দুর্ভগা রত্নবতীর নাম সেই থেকে বদল হয়ে হ'ল 'নিম্ববতী; নিম্ববতী ব'লেই সকলে তাঁকে তাচ্ছিল্য ক'রে ডাকতে লাগল।

গভীর মনোবেদনা এবং অনুতাপের মধ্য দিয়ে কিছুকাল কেটে যায় রত্নবতীর। মুখে ও মনে তাঁর এক চিন্তা,···"কী হবে আমার গতি? ভগবান্ এ কী তুমি করলে!"

এমন সময় একদিন তিনি দেখতে পেলেন—মাতৃস্থানীয়া একটি বৃদ্ধা প্রব্রাজিকা পূজার নির্মাল্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বেচারী রত্নবতী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ লুকিয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে

ফেললেন। কান্না দেখে বৃদ্ধারও চোখে জল এল। প্রশ্ন করলেন, "কাঁদছ কেন ?"

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর,....লজ্জা পেলেও....কার্য-গৌরবের অনুবন্ধে, রত্নবতী কোনক্রমে বললেন—

"মা, কি আর বলব ! পোড়াকপাল....দৌর্ভাগ্যই....মেয়েদের জীবন্তে মরণ। বিশেষতঃ যাঁরা কুলের বউ·· তাঁদের। আমি তারই একটি উদাহরণ। আমার দিকে সবাই আঙুল দিয়ে দেখায়। এমন কি আমার মা, আমার জ্ঞাতিরা আমায় অবজ্ঞার চোখে দেখেন। তাই আমার প্রার্থনা, আমার এমন কিছু একটা ক'রে দিন, যাতে সকলে আমাকে ভাল-চোখে দেখে। নয়ত···নিষ্প্রয়োজন জীবন··· আমায় বিসর্জন দিতে হবে। যতদিন না শান্তি পাই, ততদিন গোপন রাখাই উচিত রহস্য।"

এই ব'লে রত্নবতী বৃদ্ধার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন। মাটি থেকে তাঁকে উঠিয়ে তাপসী বললেন—

"বাছা, মৃত্যুর দিকে পা বাড়িও না, ও সব অসম-সাহস ··ভাল নয়। আচ্ছা, এই আমি কথা দিচ্ছি, তোমার নির্দেশমতোই আমি চলব। তোমার কাজ শেষ না ক'রে অন্য কাজে আমি হাত দেব না, অন্যের অধীন হব না। দুঃখের ধিক্কারে, যখন তুমি এতই বিপন্ন বোধ করছ, তখন আমার মনে হয়, পারলৌকিক কল্যাণের জন্য তোমার পক্ষে কিছু জপতপ করা প্রয়োজন। এ নিশ্চয় তোমার কোনো প্রাক্তন দুষ্কৃতির উত্তর-ফল। তা না হলে, এমন যার চেহারা, শীল, চরিত্র, এমন অনুকূল যার বংশ, সে কেমন ক'রে তার সতীত্ব নিয়ে স্বামীর কুনজরে পড়ে ? স্বামীর এই বিদ্রোহ দমন করবার যদি কোনো উপায় থাকে, আমাকে জানাও। তুমি বুদ্ধিমতী···নিশ্চয়ই সে বিষয়ে কিছু ভেবেছ।"

রত্নবতী মুখ নীচু ক'রে কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলেন। তারপর তপ্ত নিশ্বাস ফেলে বললেন—

"ভগবতি, স্বামীই মেয়েদের দেবতা ;....বিশেষ ক'রে যাঁরা ভদ্র-ঘরের বউ তাঁদের ;···সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাই এমন কিছু আমায় করতে হবে, যার সুফল হবে....স্বামীর সোহাগ এবং সেবা লাভ।....

"আমাদের একটি প্রতিবেশী রয়েছেন ; তিনি বণিক। বংশ-মর্যাদায়, বৈভবে, রাজার অন্তরঙ্গ হওয়ার দরুন তিনি এখন পুর-বাসীদের মাথার মণি। তাঁর মেয়ে 'কনকবতী' আমারই বয়সী, আর আমারই মতো···হুবহু তাঁকে দেখতে। তিনি আমার ভালবাসার সই। দেখুন, তাঁর চেয়েও দ্বিগুণ গয়না প'রে তাঁদের ওই সাততলা বাড়ির ছাদে আমরা আমোদ-আহ্লাদ করতে থাকব। মা ডেকেছেন —এই খবর দিয়ে আপনি আমার স্বামীকে কোনক্রমে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে আসবেন। আপনারা যখন বাড়ির কাছে এসে পৌঁছবেন, আমি তখন, যেন খেলতে খেলতেই, তাঁর গায়ে ছুঁয়ে মারব একটি কন্দুক। কন্দুকটি কুড়িয়ে নিয়ে আমার স্বামীর হাতে দিয়ে বলবেন—

'বাছা, শ্রেষ্ঠীদের সেরা নিধিপতি দত্তের মেয়ে কনকবতা....যিনি আপনার স্ত্রীর সই....এটি তাঁরই কীর্তি। রত্নবতীর দুঃখের প্রসঙ্গ তুলে সেদিন তিনি আমার কাছে আপনার বহু নিন্দা করেছিলেন;··· বলছিলেন—আপনি নাকি বড় অস্থির, কখন যে কী ক'রে বসেন তার স্থিরতা নেই, প্রেমের ব্যাপারে আপনি নাকি বড় নির্মম !···যাই হোক এখন তা হলে এই কন্দুকটিই হয়ে দাঁড়াল আপনার বিপক্ষধন। তাঁর হাতেই কন্দুকটি আপনার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

"তিনি তখন নিশ্চয়ই···উপর দিকে মুখ তুলে চাইবেন, আর আমাকে···দেখতে পাবেন।···ভাববেন,···আমি প্রিয়সই কনকবতী। হাতজোড় ক'রে ক্ষমা চাইবেন। আমি তখন ফিরে চাইব আমার কন্দুক, আপনি তখন বারংবার প্রার্থনা জানাবেন, তিনিও তখন তাঁর মনোবাসনা জানিয়ে আপনার হাতে দেবেন কন্দুকটি।

"এই ছিদ্রপথেই, ঘনিয়ে উঠবে প্রণয়। প্রণয়টিকে উজ্জ্বল ক'রে তোলার ভার কিন্তু আপনার হাতে। তার পরেই সঙ্কেতাভিসার, এবং তার পরেই আমাকে নিয়ে অকস্মাৎ দেশান্তরী হওয়া।—এর ব্যবস্থা আপনাকে ক'রে দিতে হবে।"

পুলকিতা হয়ে উঠলেন তাপসী। ষড়যন্ত্র-মতো কর্মোদ্ধার করতে বিলম্ব করলেন না তিনি।

শেষে একদিন নিবিড় নিশীথে প্রবাসযাত্রা করলেন···বিপ্রলব্ধ বলভদ্র ; সঙ্গে নিয়ে চললেন কনকবতী-ওরফে-রত্নবতীকে, এবং তাঁর রত্নসার অলঙ্কার। পরের দিন তাপসী রটিয়ে দিলেন—

"এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভালই হয়েছে। বলভদ্র গত-কালই আমার কাছে নিজেই দুঃখু ক'রে বলছিলেন—

'এ আমি কী করলুম ! রত্নকে পায়ে ঠেলেছি, শ্বশুর-শাশুড়ীকে অপমান করেছি, বন্ধুদেরও অবহেলা করেছি ;···অকারণে। এখন এই দেশেই থেকে, আবার তাঁর সঙ্গে সংসার-যাত্রা করাটা আমার পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

নির্ঘাত তিনিই নিয়ে গেছেন রত্নবতীকে। অচিরেই প্রকাশ হবে, সত্য।"

তাপসীর কথা শুনে বলভদ্রের বন্ধুবান্ধবেরা খোঁজ-খবর-নেওয়ার ব্যাপারটিতে ততটা আর গা করলেন না।

এদিকে রত্নবতী···পথ চলতে চলতে সংগ্রহ করলেন একটি ক্রীতদাসী, এবং পাথেয় বাসনকোশন ইত্যাদি তার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে 'খেটকপুর'-এ এসে পৌঁছলেন। ব্যবহারকুশল বলভদ্র অল্প মূলধন ঢেলে, কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে উপার্জন ক'রে বসলেন প্রচুর ধনসম্পত্তি। দেখতে দেখতে পৌরাগ্রণী হয়ে উঠলেন। অর্থ এলে পরিজনও আসে। থই থই ক'রে উঠল বৈভব। তখন বলভদ্র ভাবলেন—

"প্রথম-দাসীটাকে···তাড়াতেই হবে।"

ভাবলেনও যা করলেনও তা। বেটী কোনো কাজের নয়···চোখে দেখেছি চুরি করছে ;···বেটীর মুখ বড় খারাপ ;···ইত্যাদি অপবাদ রটিয়ে, গালমন্দ ক'রে বিতাড়িত ক'রে দিলেন দাসীকে।

কিন্তু প্রতিশোধ নিতে ভুলল না দাসী। প্রভুদের প্রসন্ন অবস্থায়, তাঁদের মুখেই যে সব রহস্যের কথা শুনেছিল—রাগে আগুন হয়ে, এবার সে প্রকাশ ক'রে দিল, হাটে হাঁড়ি ভাঙল। ব'লে বেড়াতে লাগল—

"পরের মেয়ে চুরি ক'রে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন ওই বদমাস।"

ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা। বলভদ্রের উপর তর্জন-গর্জন ক'রে তাঁরা পৌরবৃদ্ধদের বললেন—

"দুর্মতি বলভদ্র···নিধিপতিদত্তের কন্যা কনকবতীকে চুরি ক'রে খেটকপুরে এসে লুকিয়ে বসবাস করছে। আশা করি আপনারা বলভদ্রের সর্বস্বহরণের প্রতিবন্ধকতা করবেন না।"

বলভদ্র ভয় পেয়ে গেলেন। রত্নবতী তখন তাঁকে বললেন—

"ভয় পেয়ো না। পৌরবৃদ্ধদের সামনে উপস্থিত হয়ে জানাও,—আমার ভার্যা··নিধিপতিদত্তের কন্যা কনকবতী নন ; ইনি বলভীর গৃহগুপ্তের কন্যা ; রত্নবতী এঁর নাম ; পিতৃদত্তা এবং শাস্ত্রমতে আমার বিবাহিতা ভার্যা। যদি বিশ্বাস না হয় এঁর বন্ধু-সমাজে আপনারা চর পাঠান।"

এইভাবে প্রতিবাদ করাতে, জামিনে আবদ্ধ হয়ে রইলেন বলভদ্র। কিন্তু সে আর কটা দিন? পৌরবৃদ্ধদের লিখন পেয়ে, সমস্ত বৃত্তান্ত হৃদয়ঙ্গম ক'রে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে, কালবিলম্ব না ক'রে, খেটকপুরে পদার্পণ করলেন গৃহগুপ্ত। এবং অতি প্রীত হয়ে মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন বলভীতে।

কাণ্ড দেখে, 'রত্নবতী যে কনকবতী'···এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে গেল বলভদ্রের। স্বামীর অতি-সোহাগিনী হয়ে উঠলেন স্ত্রী।

সেই জন্যই আমি বলেছিলুম—
'কাম কি ?·· না, সঙ্কল্প ॥'
তারপরে ব্রহ্মরাক্ষস জিজ্ঞাসা করলেন—
'নিতম্ববতীর বৃত্তান্তটি কি ?'
বললুম,—"শুনুন—

৪। শূরসেন-দেশের মথুরা-নগরীতে জনৈক কুলপুত্র বাস করতেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। বহুগুণান্বিত হ'লেও দুটি শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল তাঁর। শিল্পসিদ্ধা গণিকাদের তিনি ভালবাসবেন-ই; এবং বন্ধু বা বউ নিয়ে মথুরায় কোনো কলহ ঘটলেই তিনি কব্জির জোর দেখিয়ে ঝগড়া মিটোতে দৌড়বেন-ই। কর্কশেরা তাই তাঁর উপাধি দিয়েছিল 'কলহ-কন্টক'। সেই কলহকন্টক একদা,···

নগরীতে নবাগত এক চিত্রকরের হস্তে দেখতে পান একখানি চিত্রপট। যুবতীর চিত্রপট। দেখামাত্রই ছবির সেই যুবতীটি কলহ-কন্টকের চিত্তটিকে কামাতুর ক'রে ফেললেন, এবং চিত্রকরকে কলহ-কন্টক বললেন—

"মহাশয়, আপনার আঁকা এই ছবিটির মধ্যে সবই কেমন যেন আমার উল্টোপাল্টা ঠেকছে। দেহের এমনধারা লাবণ্যপূর্ণ রূপ··· সত্যিই···ঘরের বউদের মধ্যে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ ওঁর ওই নম্রতার মধ্যে ফুটে উঠেছে আভিজাত্যের ছাপ। মুখের রঙ একটু হলদে হ'লেও, দেহটি দেখে মনে হচ্ছে···ইনি তত বেশি যাকে বলে—পরিভোগ-সুলভা নন। একটি প্রৌঢ়ভাব ঘনিয়ে এসেছে এঁর চোখে। প্রবাস-চিহ্ন বেণী নেই, প্রোষিতভর্তৃকা ব'লে মনে হয় না। ডান দিক দিয়ে অঞ্চল ঘুরনো;···এয়োরা-ই প'রে থাকেন। নির্ঘাত ইনি কোনো অকর্মণ্য বুড়ো বেণের বউ। আপনি দেখছি,···উপযুক্ত-সম্ভোগের-অভাবে-উৎপীড়িতা এক গৃহিণীর···ছবি এঁকে ফেলেছেন!

প্রশংসা না ক'রে পারছি না। বাঃ বাঃ, যেমনটি দেখেছেন, অপূর্ব-কৌশলে ঠিক তেমনটি ফুটিয়ে তুলেছেন আপনি।"

কলহকণ্টকের চিত্র-বিচার দেখে ভূয়সী প্রশংসা ক'রে উঠলেন চিত্রকর এবং বললেন—

"যা বলেছেন,—নির্ভুল। অবন্তিপুরী উজ্জয়িনীর সাহুকার অনন্তকীর্তির ইনি স্ত্রী। সার্থক বটে এঁর নাম 'নিতম্ববতী'। সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়ে আমি এঁর ছবিখানি এঁকেছি।"

শোনার পর থেকেই কেমন যেন উন্মনা হয়ে যান কলহকণ্টক। ছবির যুবতীটি ভর ক'রে বসেন তাঁর হৃদয়ে। তাঁকে দেখবার দুরন্ত বাসনায় হৃদয় জুড়ে ছটফট করতে থাকে তীব্র প্রেম। শেষে আর থাকতে না পেরে, তিনি একদিন পরিব্রাজক-বেশে উপস্থিত হলেন উজ্জয়িনীতে। 'ভার্গব' নাম নিয়ে ভিক্ষার ছলে প্রবেশ করলেন··· তাঁর গৃহে এবং তাঁকে···দেখলেন। নিতম্ববতীকে দেখিয়ে দিয়ে··· কলহকণ্টকের চোখের আশা মেটালেন বটে শ্রীমদন, কিন্তু হায়, রক্ত ঝরাতে আরম্ভ ক'রে দিলেন তাঁর হৃদয়ে।

অনন্তকীর্তির গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন কলহকণ্টক। উপস্থিত হলেন পৌরমুখ্যদের সম্মুখে। প্রার্থনা করলেন শ্মশানরক্ষার চাকরি। পেয়েও গেলেন।

শ্মশানে শব আসে, দাহ হয়। কত মানুষে ফেলে দিয়ে যায় শবঢাকা কাপড়-চাদর; আর সেইগুলি তিনি সংগ্রহ ক'রে রাখেন। এক বৌদ্ধ শ্রমণিকা 'অর্হন্তিকা' তাঁর নাম···তাঁকে সেগুলি দান ক'রে পরিতুষ্টা ক'রে তুলতে দেরি করলেন না কলহকণ্টক। তাঁকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তাঁকেই মুখপাত ক'রে, নিতম্ববতীকে করলেন নিমন্ত্রণ। শ্রমণিকা ফিরে এলেন, রূঢ় ভর্ৎসনার মতো একটি ছোট্ট উত্তর নিয়ে

"কুলস্ত্রীর শীল নষ্ট করা দুষ্কর।"

প্রত্যাখ্যান! হতাশা!

কিন্তু কুলপুত্র দমবার পাত্র নন। অর্হন্তিকাকে বললেন,—

"এবার আপনি আমার দূতী হয়ে আবার যান। পাখী-পড়ানোর মতো ক'রে আপনাকে যা শেখাচ্ছি—ঠিক ঠিক সেগুলি বলবেন।—বলবেন,—

"আমার মতো এক ভিক্ষুণী, যিনি সংসারের দোষ আর কদর্যতা দেখে বীতরাগিণী হয়ে এখন সমাধিরাজ্যে পৌঁছেছেন. মোক্ষ যাঁর লক্ষ্য, তিনি কি কখনও কুলবধূদের উপদেশ দিতে পারেন, 'শীলভ্রষ্টা হও' ;···না, কখনও কেউ সেই উপদেশ দেয় ? না, তাও কখনও ঘটে ! আপনার উদার সমৃদ্ধি, অতিমানুষ রূপ এবং যৌবনের উন্মেষ দেখে আপনাকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার সত্যই একটু বাসনা আমার হয়েছিল,···জানতে ইচ্ছা হয়েছিল···ইতর-নারীসুলভ চপলতা আপনাকেও স্পর্শ করে কি না ? দুষ্টভাবে যে আপনি ভাবান্বিতা নন, সেটির উপলব্ধিতে আমি তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু ইদানীং আর একটি শুভ বাসনা আমার হয়েছে ;···আপনার কোলজোড়া সুন্দর একটি ছেলে দেখবার বাসনা। স্নেহের দুরভিসন্ধি। নিশ্চয়ই কোনো দুষ্ট গ্রহের অধিষ্ঠান হয়েছে আপনার স্বামীর শরীরে। তা না হ'লে পাণ্ডুরোগ, এমন দুর্বলতা, ভোগের অক্ষমতা তাঁর আসবেই বা কেন ? বিঘ্নের প্রতিকার না ক'রে সন্তানলাভও সম্ভবপর নয়। তাই, আমি বলছি, আমার কথাটুকু আপনি প্রসন্ন-মনে শুনুন, কাঁটা পড়ুক অকল্যাণের পথে।···একটি মন্ত্র-বাদীকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। বৃক্ষবাটিকায় একাকিনী আপনি যাবেন, আপনাকে শুধু স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে আপনার একখানি চরণ। তিনি কেবল মন্ত্র প'ড়ে দেবেন পায়ে। তারপরে দেখবেন স্বামী···পাশে এলেই, আপনি প্রণয়-কুপিতা হয়ে পড়েছেন, এবং মন্ত্র-পড়া পা দিয়ে প্রহার করছেন আপনার স্বামীর বক্ষঃদেশ। তাতেই আপনার স্বামী নীরোগ হয়ে যাবেন, এবং লাভ করবেন বীরপুত্র-প্রজনন-ক্ষম উত্তম ধাতুপুষ্টি। তাঁর কাছে আপনি দেবী হয়ে উঠবেন। এ বিষয়ে আশঙ্কার কিছু নেই।"*

"দেখবেন, সুন্দরী হয়তো সম্মত হয়ে যাবেন। তখন রাত্রে বৃক্ষ-

বাটিকায় আমাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাঁকেও প্রবেশ করাবেন। এই কাজটুকু ক'রে দিলেই আমি অনুগৃহীত হব।"

দূতী অর্হন্তিকা যথোক্ত কার্যোদ্ধার ক'রে সেই দিনই নিশীথে কলহকণ্টককে প্রবেশ করিয়ে দিলেন বৃক্ষবাটিকায়। ভিক্ষুণীর প্রযত্নে নিতম্ববতীও···তত্র উপস্থিত হলেন···একাকিনী। নির্জন স্থান। কলহকণ্টক···সুন্দরীর একখানি চরণ···করতলে নাড়তে নাড়তে, অকস্মাৎ টেনে খুলে ফেললেন···স্বর্ণনূপুর ; ছুরির ডগা দিয়ে কী যেন দ্রুত লিখে দিলেন উরুমূলে ; এবং পরক্ষণেই সোনার নূপুরখানি মুঠোর মধ্যে নিয়ে নির্বাক বাতাসের মতো মিলিয়ে গেলেন অন্ধকারে।

ভয়ে এবং ভাবনায় অভিভূত হয়ে গেলেন নিতম্ববতী। গালমন্দ করতে লাগলেন নিজের অনাচারকে। শ্রমণিকাকে হাতের কাছে পেলে এখনই তাকে খুন করেন—এমনি হ'ল তাঁর ভাব। কিন্তু কেউ কোথাও নেই! পা থেকে রক্ত ঝরছে ; দীঘিতে নামলেন ; ক্ষতটিকে ধুয়ে ফেললেন ; কাপড় দিয়ে বাঁধলেন ; তারপরে ঘরে ফিরে এলেন। অন্য নূপুরখানিকে খুলে রেখে অসুখের ভান ক'রে গ্রহণ করলেন শয্যা। তিন-চার দিন এমনি ভাবে তাঁর কেটে গেল, একান্তে।

ধূর্ত কলহকণ্টক তখন সময় বুঝে, নূপুর বেচতে উপস্থিত হলেন অনন্তকীর্তির দ্বারে। নূপুর দেখেই চমকে উঠলেন বণিক, বললেন—

"এ নূপুর তো আমার স্ত্রীর। কোথায় পেলেন এই নূপুর ?"

নূপুরের প্রাপ্তিস্থান কিছুতেই ভাঙলেন না কলহকণ্টক। অনেক সাধ্য-সাধনার পর বললেন—

"বলতেই যদি হয়, তা হলে বণিকদের সভায় আমি বলব।"

গৃহিণীর কাছে অনন্তকীর্তি তখনি খবর পাঠালেন—

"সোনার নূপুরজোড়া একবার পাঠিয়ে দাও তো।"

লজ্জায় ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেন নিতম্ববতী। দ্বিতীয় নূপুরখানি পাঠিয়ে দিয়ে ব'লে পাঠালেন—

"রাত্তিরে বিশ্রাম করতে গিয়েছিলুম বৃক্ষবাটিকায়। বাঁধন আল্‌গা

হয়ে সেইখানেই বোধ হয় নূপুরখানা প'ড়ে গেছে···পা থেকে। কোন্ সকাল থেকে নূপুরের খোঁজ করাচ্ছি, কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নি। তাই এই একখানি নূপুর···পাঠালুম।"

নূপুরখানিকে হাতে নিয়ে অনন্তকীর্তি বণিকসমাজে এলেন। অভিযোগান্তে ধূর্ত কলহকণ্টক তখন সবিনয়ে নিবেদন করলেন—

"আপনারা জ্ঞাত আছেন—আমি আপনাদের আজ্ঞাতেই শ্মশান-ক্ষেত্রে রক্ষী হয়ে আছি। ঐ আমার উপজীবিকা। নিকটেই আমার বাসা। কিন্তু ধাপ্পাবাজ বা চোর—যাঁরা দিনদুপুরে আমাকে দেখে ডরান, গভীর রাত্তিরে তাঁরা আসেন কখনও কখনও···লুকিয়ে ; মড়ি পুড়িয়ে পিট্টান দেন। তাই মাঝে মাঝে, রাত্তিরেও আমাকে শুয়ে থাকতে হয় শ্মশানে। সেদিনও আমি শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ চোখ খুলতেই দেখি,···চিতা জ্বলছে, আর শ্যামামূর্তির একটি রমণী···চিতার ভিতর থেকে,—বেশ গায়ের জোর ফলিয়ে,—টেনে বার করছেন একটা আধপোড়া মড়া। সত্য বলতে কি, মহাশয়েরা, আমার মতো মানুষের পক্ষে···অর্থলোভ হওয়াটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাই ভয় ডর চুলোয় দিয়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরি। ধ'রেই ছোট্ট ছুরি দিয়ে তার উরুমূলে বেপরোয়া দাগা মেরে দি। বেটীর পা থেকে ঝটকা মেরে খুলে নিই এই নূপুর। তারপরেই হাত ফসকে, ব্যস বেটী খুর-পায়ে পালায়।—এই হচ্ছে আমার হাতে এই সোনার নূপুরটির আগমন-কাহিনী। বিচারক্ষেত্রে আপনারাই প্রবল।"

পৌরমুখ্যেরা ভেবেচিন্তে একমত হয়ে শেষে বললেন,—

"ঐ রমণী যে একটি শাকিনী সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।"

নিতম্ববতীকে পরিত্যাগ করলেন তাঁর বেণে স্বামী। অতএব, মরণ ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর রইল না। নিশীথে নিতম্ববতী শ্মশানে এলেন ; বহু বিলাপের পর গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাবেন এমন সময় ধূর্ত কলহকণ্টক তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। অনুনয়ের অন্ত রাখলেন না। বললেন—

"সুন্দরি, তোমার রূপ, তোমার গড়ন, আমাকে উন্মাদ ক'রে দিয়েছিল। তোমাকে আমার নিজস্ব করব···জীবনের এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল···সাধনা। তোমাকে পাবার জন্যে কী যে·· না করেছি, জানি না। আভিজাত্য খুইয়েছি, শ্মশানরক্ষী হয়েছি, যোগাড় করেছি ভিক্ষুণী, তাঁর মুখে পাঠিয়েছি নিমন্ত্রণ। যখন কিছুতেই হ'ল না, জীবনমরণ পণ ক'রে তখন আমাকে এই চরম পথ বেছে নিতে হয়েছিল। সুন্দরি, এবার প্রসন্ন হও, আমি তোমার অনন্যশরণ দাস।"

সেই শ্মশান-ক্ষেত্র মুহুর্মুহু চরণপতন, সান্ত্বনাবাণীর সহস্র অনুলেপন, এবং সুন্দরীর অগত্যা-মিলনের মধ্য দিয়ে কলহকণ্টক লাভ করেছিলেন তাঁর ইষ্টসিদ্ধি,···নিতম্ববতীকে বশীকরণ! তাই বলেছিলুম—

"দুষ্করের সাধন করে,—প্রজ্ঞা॥"

রাজকুমার, আমার আখ্যানগুলিকে কর্ণগ্রাহ্য ক'রে ভক্তিমান হয়ে উঠলেন ব্রহ্মরাক্ষস। পূজো আরম্ভ করলেন আমার। আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ···আকাশ থেকে আমার মাথায় ঝ'রে পড়ল···সলিল-বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তোর দানা;···নাগকেশরের কুঁড়ির মতো বড় বড়।

"এ আবার কি?"···উচ্চচক্ষুঃ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি,···একটি রাক্ষস···গগনমার্গে একটি রমণীকে টানতে টানতে ছুটেছে। মুক্তির জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন রমণী।

নৃতির পুত রাক্ষস, অকামা একটা স্ত্রীলোককে চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না,···গগন-গমনের শক্তিও আমার নেই, একখানা অস্ত্রও নেই হাতে,···সমস্ত শরীর রি-রি করতে লাগল আমার। কিন্তু মদীয় ব্রহ্ম-রাক্ষসটি ততক্ষণে 'ওরে পাপ,

দাঁড়া দাঁড়া, কোথায় নিয়ে পালাবি···চুরি ক'রে ?'—প্রচণ্ড গর্জনে ভর্ৎসনা ক'রে লাফিয়ে উঠেছেন আকাশে, এবং রাক্ষসকে করেছেন আক্রমণ।

রাক্ষস আর অপেক্ষা না ক'রে রোষভরে পরিত্যাগ করল রমণীটিকে। অন্তরিক্ষ থেকে পারিজাতের মঞ্জরীর মতো খ'সে পড়লেন রমণী এবং আমিও উন্মুখ দু' বাহু প্রসারিত ক'রে···সদয়-গ্রহণ করলুম রমণীটিকে। গায়ে গা ঠেকতেই অকস্মাৎ যেন সুখে রোমাঞ্চিতা হয়ে উঠলেন রমণী ; কিন্তু তখনও তাঁর চোখ বন্ধ. কাঁপছেন,···কী করি,··· মাটিতে নামিয়ে রাখলুম। একটু বিস্মিত বোধ করলুম। কিন্তু তখন··· গগনে চলেছে দুই মত্ত রাক্ষসের ভৈরব-রণ। ঘুষোঘুষি, লাথালাথি,··· উপড়ে যাচ্ছে বনস্পতি, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের শৃঙ্গ, উড়ছে পাথর। শেষে দেখি, লড়াইয়ে দুটি রাক্ষসই সাবাড়। কী করি,···

ধীরে ধীরে রমণীটিকে তুলে নিয়ে চ'লে এলুম সরোবরের তীরে। নরম মাটির পাড়, ছড়িয়ে রয়েছে ঝরাফুল। রমণীকে শুইয়ে দিয়ে মুখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলুম। ওঃ মা···এ কাকে দেখছি ? এ যে আমার···পরাণপ্রিয় রাজকন্যা,···কন্দুকাবতী !

তাঁকে আশ্বস্ত করলুম। সংবিৎ ফিরে পেয়ে, চোখ বাঁকিয়ে আমার দিকে তিনি চাইলেন, আমাকে চিনতে পারলেন, কেঁদে ফেললেন, শেষে বললেন—

"কন্দুকোৎসবে আপনাকে আমি দেখেছিলুম। চন্দ্রসেনাও আপনার কথা জানিয়ে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল। নিজেকে সঁপে দিয়েছিলুম আপনার হাতে। তারপরে আমি শুনি···আমার নিষ্ঠুর ভাই ভীমধন্বা ···আপনাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছেন।

সখীদের, পরিজনদের আমি জানাই নি ; তাদের ফাঁকি দিয়ে, একাকিনী মরতে গিয়েছিলুম ক্রীড়াবনে। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে এল এক কামরূপী নোংরা রাক্ষস। আমাকে কামনা ক'রে

বসল। ভয়ে কেঁদে উঠলুম। ধূলোয় মিলিয়ে গেল আমার প্রার্থনা। রেগে বাধা দিতে লাগলুম, কিন্তু রাক্ষস আমাকে লুঠ ক'রে উধাও হ'ল আকাশে। সেই উধাও-যাত্রার আজ এইখানেই হয়েছে অবসান। আমার জীবনের যিনি ঈশান,—তাঁর হস্তে দৈবই আমাকে ফেলে দিয়েছেন।"

আমরা দুজনে তখন ফিরে গেলুম বহিত্রে। ফিরতি-হাওয়ায় এবার দামলিপ্তে ফিরে এল সুখের তরণী। নেমেই শুনি, পুত্র-পুত্রী-হীন সুহ্মপতি তুঙ্গধন্বা,···বিকল হয়ে···কলুষনাশিনী গঙ্গার তটাভিমুখে স্বয়ং সকলত্র যাত্রা করেছেন; উদ্দেশ্য···অনশনে দেহত্যাগ। কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে দৌড়ে এলেন প্রজাবৃন্দ, তাঁরা জানালেন—

"অনেক পৌরবৃদ্ধ নগর কাঁদিয়ে মহারাজের সঙ্গে মরতে চ'লে গেছেন।"

যথাসত্বর আমি তখন উপস্থিত হয়ে যাই রাজসমীপে, নিবেদন করি ঘটনা; রাজহস্তে ফিরিয়ে দি পুত্রটিকে এবং পুত্রীটিকে। দামলিপ্তেশ্বর প্রীত হয়ে অধুনা আমাকে তাঁর জামাতা করেছেন এবং তাঁর পুত্র ভীমধন্বা এখন আমার অনুজীবী। আমার আদেশে চন্দ্রসেনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন ভীমধন্বা। তিনি লাভ করেছেন মৃত্যুর অধিক দুঃখ। এবং চন্দ্রসেনা ভজনা করছেন কোশদাসকে।

সিংহবর্মাকে সাহায্যদানের জন্য আজ এখানে আমরা এসেছি। এসেই দেখা পেলেম আপনার।

কাহিনী শুনে আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠল রাজবাহনের নয়ন; বললেন—

"দৈবের গতি বড় চটকদার, অবসর পেলেই দেখছি ফলাও হয়ে ওঠে পুরুষকার।"

এবার রাজবাহন মন্ত্রগুপ্তের হাস্যস্নাত ওষ্ঠের দিকে চাইলেন। মন্ত্রগুপ্ত তখনই হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন নিজের অধরমণি। একদা··· ঐ মণিটিকেই···অতিপীড়িত একখানি চুম্বন দিতে গিয়ে,···দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ফেলে বিপদ ঘটিয়েছিলেন তাঁর ললিতা একটি প্রেয়সী।

ঔষ্ঠ্যবর্ণ-ভ্রান্ত অদ্ভুত ভাষার ঠমকে মন্ত্রগুপ্ত তখন বলতে লাগলেন তাঁর আত্মচরিত।—

সপ্তম উচ্ছ্বাস

মন্ত্রগুপ্ত-চরিত

রাজকুমার, পর্বতের রন্ধ্রপথে আপনি তো অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। ঐ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান। খোঁজ নিতে নিতে তারপরে একদিন এসে পড়ি কলিঙ্গে। নগরের বেশি দূরে নয়, কাছেই শ্মশান; শ্মশানের গায়েই প্রকাণ্ড এক বনস্পতি। এত সবুজ পাতা···তার তলদেশে, যে দেখে মনে হ'ল, কেউ যেন একটি শয্যা রচনা ক'রে এইমাত্র চলে গেছে। আমারও চোখ তখন ঘুমে ঢুলুঢুলু। শুয়ে পড়লুম।

চতুর্দিক অন্ধকার। কেশজাল উৎকীর্ণ ক'রে···থমকে দাঁড়িয়ে আছেন কালরাত্রি। রাক্ষস-চরা রাত্তির। টুপ্‌টাপ ক'রে শিশির ঝরছে। নিতান্ত-শীত নিশীথ। দ্বার রুদ্ধ ক'রে ঘুমিয়ে আছে নগর। এমন সময় অকস্মাৎ,—আমার নয়নচুম্বী নিদ্রার নিকুচি ক'রেই যেন কর্ণে প্রবেশ করল একটা আওয়াজ। কারা যেন কাতরাচ্ছে। অত্যন্ত আতুর হয়ে কে যেন কি বলছে! শালগাছের গহন-শাখার আড়াল থেকেই ভেসে আসছে···শব্দ। কান পেতে শুনতে লাগলুম, একটি কিঙ্কর তাঁর কিঙ্করীকে বলছেন—

"সঙ্গমের বাসনা যখন প্রবল হ'ল, আগল-ভাঙা ভালবাসা যখন মানুষটাকে গিলে ফেলতে লাগল তখন···এই বেটা ভণ্ড পোড়া সিদ্ধ··· যোগীটা তাঁকে জানালেন···এবার তিনি নির্দেশ দেবেন। আর তার পরেই কী মারটাই না তিনি মারলেন মানুষটাকে! খিল হয়ে গেল মানুষটা! যোগী তো নয়, বেটা যেন পাপের নরপতি। বাঁচা যায়, যদি কেউ অনন্তশক্তিমান এ বেটার সিদ্ধিলাভের কাঁটা হয়ে আসেন।"

"কে এই সিদ্ধ, কিসেরই বা সিদ্ধি, কিঙ্করটিই বা কে, কী এখন

করবে—?" দেখবার বড়···সাধ হ'ল। কুতূহল, কৌতুক তখন আক্রমণ করেছে আমার হৃদয়। কিঙ্করটি যে দিকে চ'লে গেলেন, সেই দিকে পা বাড়িয়ে একটু এগোতেই দেখি,—এক যোগী পুরুষ ধ্যানাসনে ব'সে রয়েছেন। কঙ্কালের অলঙ্কার অঙ্গে, চিতাভস্মের অঙ্গরাগ, বিদ্যুৎ খেলছে জটায়, সামনে জ্বলছে আগুন। আগুন তো নয়; যেন একটা দাবানল! বাঁ হাত দিয়ে তাতে তিনি নিরন্তর ঢালছেন তিল সরষে ইত্যাদি, আর ফট্ ফট্ ক'রে সেগুলো ফাটছে। গরাসে গরাসে ইন্ধন ভক্ষণ ক'রে স্ফুলিঙ্গ ঝরাচ্ছেন অগ্নিদেব।

যোগীর সামনে এসে কিঙ্করটি দাঁড়ালেন। কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, —"কি করতে হবে, আদেশ করুন।"

অত্যন্ত নিকৃষ্টাশয় সেই সিদ্ধটি! তখনি আদেশ দিলেন—

"যাও, কলিঙ্গরাজ 'কর্দনে'র ছোট মেয়ে—'কনকলেখা'কে কন্যা-গৃহ থেকে এখানে নিয়ে এস।"

আদেশ পালন করলেন কিঙ্কর। কনকলেখাকে সামনে এনে হাজির করলেন। বিপুল ত্রাসে 'হা তাত, হা জননী' ব'লে রাজকুমারী তখন ভীষণ কাঁদছেন, অশ্রুজর্জর কণ্ঠ, বুকফাটা আর্তনাদ। খোঁপা খুলে গেছে, মাটিতে লুটোচ্ছে মালা।···সিদ্ধটি তখন শিলায় শাণিয়ে নিলেন খড়্গ, তার পর রাজকুমারীর কেশগুচ্ছ ধ'রে মাথাখানা খসিয়ে দিতে গেলেন! বিদ্যুৎবেগে—দৌড়িয়ে গিয়ে, সিদ্ধের হাত থেকে আমি তখনই এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিলুম খাঁড়া এবং খাঁড়ার এক আঘাতেই খসিয়ে দিলুম···মুণ্ড। নিকটেই প্রাচীন শালগাছ ছিল। তারই ফাটলের মধ্যে রেখে দিলুম জটাজুটধারী সেই মুণ্ড। ব্যাপার দেখে কিঙ্কর পুলকিত হয়ে উঠলেন। ক্ষীণ হয়ে এল তাঁর চিন্তা, হাঁপ ছেড়ে বললেন—

"আর্য, এই কদর্যটার জ্বালায়,—উঃ কী যন্ত্রণাটাই না ভুগতে হয়েছে আমাকে! এতটুকুও ঘুম আসতে চায় না চোখে। তর্জন করত, ভয় দেখাত, নিত্য আদেশ দিত;—যত সব অকৃত্যসাধনের আজ্ঞা। মস্ত

বড় কল্যাণ হ'ল যে, আপনি এখন দয়া ক'রে এই মনুষ্য-কাকটাকে··· নারকীয় যাতনার রসজ্ঞান লাভের জন্য···পাঠিয়ে দিয়েছেন সূর্যপুত্র যমরাজের নগরে। তাই, হে দয়ানিধি, হে অনন্ত তেজস্বী, আপনার কাছে আজ্ঞা-ভিক্ষা করছে আমার মতন বিনীত একটি প্রাণী। আদেশ ক'রে কৃতার্থ করুন। বিলম্ব করবেন না।"

নত হয়ে আমাকে নমস্কার করলেন কিঙ্কর। আমিও তাঁকে বললুম—

"সখে, অতি ক্ষুদ্র একটি উপকারের জন্য এত বড় একটা সমাদর ···আপনি যে আমাকে করলেন—এইটিই হচ্ছে সজ্জনসেবিত পথ। তা না হ'লে কখনও আপনি আমার কাছে আদেশ প্রার্থনা করতেন না। চেয়ে দেখুন একবার মেয়েটির দিকে, একেবারে ভেঙে পড়েছে বেচারীর শরীর। কষ্ট সইতে ইনি জন্মান নি। আর কী কষ্টটাই না এঁকে পেতে হ'ল একটা নরাধমের হাতে। এঁকে এবার ওঁর বাড়িতে আপনি রেখে আসুন। ওতেই হবে আমার সন্তোষ।"

রাজকন্যার কর্ণে প্রবেশ করল আদেশ। তিনি তখন আমার দিকে নয়ন বাঁকিয়ে চাইলেন ;—কর্ণ-শেখরের নীল-পদ্মটির মতো তাঁর নয়ন! ফুলধনুর ধনুকের মতো কী সুন্দর তাঁর লতানো ভ্রূ! ললাটের রঙ্গস্থলে অলসলীলায় নৃত্য ক'রে উঠল সেই ভ্রূলতা, যেন একটি লাস্য-নর্তকী। কণ্টকিত হ'ল তাঁর রক্ত-কপোলের রেখা। অনুরাগ আর লজ্জার অন্তরাল-পথে বিচরণ করতে করতে তিনি তখন পায়ের নখ দিয়ে কী যেন লিখতে লাগলেন ধরণীতে। আনন্দিত অশ্রু-ধারায় ভিজে যেতে লাগল···স্তনতটের চন্দন। ঠোঁটের রাঙা পল্লবটিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে, স্তনের আর্দ্র-চন্দনটিকে শুষ্ক ক'রে দিয়ে, বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস। শ্রীমদন···যিনি হৃদয়-লক্ষ্য-দলনদক্ষ·· তাঁর ফুলবাণের মতো আমার কাছে ছুটে এল সেই নিঃশ্বাস। শুনতে পেলুম কলকণ্ঠের কাকলী—

"আর্য, কালের করাল গ্রাস থেকে দাসীটিকে ছিনিয়ে এনে, কেন

আবার তাকে ফেলে দিচ্ছেন অনঙ্গসাগরের আতঙ্কে? আপনার চরণ-পদ্মের রেণু ব'লে আমাকে ভাবলেই আমি সুখী হব। যদি সদয় হন, তা হ'লে আমাকে অনন্যসাধারণ অধিকার দিন আপনার শ্রীচরণ-সেবার। যদি মনে করেন, কন্যাগৃহে প্রবেশ করলে রহস্যক্ষরণের আশঙ্কা রয়েছে—সে ধারণা অমূলক। সেখানে আমার রয়েছে বহু সখী বহু পরিজন—তারা আমার অনুরাগিণী। যাতে জানাজানি না হয়, সে প্রচেষ্টার ত্রুটি হবে না।"

রাজকুমার, আমি তখন অনঙ্গের শরে নিদারুণভাবে আহত হয়ে গেছি···চেতনায়। কটাক্ষের কৃষ্ণ শৃঙ্খলে নিতান্তই বাঁধা প'ড়ে গেছি। এবং চক্রজঘনাটি যেভাবে কথাগুলি আমাকে শোনালেন, তাতে বুঝতে পেরে গেছি, যদি তাঁর কথামতো কাজ না হয়, তা হ'লে আর রক্ষে নেই, মকরকেতন এক মুহূর্তও বিলম্ব সইবেন না, তাঁকে পৌঁছিয়ে দেবেন অকীর্তনীয় একটি দশা-বিশেষে। তাই কিঙ্করের মুখের উপর চোখ রেখে বললুম—

"তা হ'লে···মৃগনয়নার সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চলুন কন্যাগৃহে।"

যথা কথা তথা কাজ। কন্যাগৃহে আমাদের পৌঁছিয়ে দিলেন নিশাচর। সেখানে,—শারদমেঘের মতো শুভ্রসুন্দর একটি চন্দ্রশালার নিভৃত প্রান্তে আমি ব'সে রইলুম···চন্দ্রাননার নির্দেশমতো। কিন্তু কতক্ষণ আর স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকি, ছটছট করতে লাগলুম। কনকলেখা ততক্ষণে নিঃসাড়ে এগিয়ে গেছেন; হাত দিয়ে ঠেলা দিতে দিতে জাগিয়ে দিয়েছেন সখীদের; সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁদের। তাঁরা এলেন; আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল তাঁদের মাথা; অশ্রুকরাল তাঁদের নয়ন। ভ্রমরগুঞ্জিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন—

"প্রভু, আমাদের সখী আপনার মতো একটি নবীন আদিত্যের

'পথে পড়েছিলেম ব'লেই কৃতান্ত তাঁকে গ্রহণ করতে সাহসী হন নি। প্রেমাগ্নিদেবকে সাক্ষী রেখে, সেই মুহূর্তেই রাজকন্যাটিকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন মনসিজ। রত্নশৈলের শিলাতলের মতো আপনার আর্য-হৃদয় স্থির। আমাদের প্রার্থনা,—সেই স্থির হৃদয়টিকে অলঙ্কৃত করুন প্রেম-তরল এই আশ্চর্য-রতনটিকে. ধারণ ক'রে···তুলিয়ে। হৃদয়ের সহচর ক'রে নিন···স্তনতট, গাঢ় আলিঙ্গনের বিধান দিয়ে।"

অনুকূল যেখানে সখীজন, স্ব-ইচ্ছায় যেখানে প্রেমের শিকল পরে হৃদয়, সেখানে বিলম্ব হয় না মিলনের। তুজনে এক হয়ে গেলুম।

তারপরে একদিন বসন্তকালে,—

যখন জায়ার রাহিত্য···আয়াসিত করে চিত্ত ,—

লালসা-ভৃঙ্গের দ্রুতলঙ্ঘনে যখন গ্লান-ঘন হয়ে ওঠে বকুল ; এবং অরণ্যের ভালে ফুটে ওঠে তিলক-ফুলের উদাস সৌন্দর্য ;—

যখন সোনালু-ফুলের স্বর্ণছত্র হাতে নিয়ে ললিত-নায়কের মতো সফরে বেরোন অনঙ্গরাজ ; এবং দক্ষিণে হাওয়ার আঘাত পেয়ে সহকার অঙ্গে ঢ'লে পড়েন ভ্রমর-ওড়া সংজ্ঞাহারা মঞ্জরী ;—

কোকিলের কণ্ঠরাগে সদ্য-রঞ্জিতা হয়ে যখন রতিরণে অগ্রসর হন রক্তাধরার দল ;—

যখন লক্ষ্মী মেয়েদের লজ্জাকেও লঙ্ঘন করে অনুরাগ ; অঙ্গে চন্দন মেখে সুশীতল হয়ে···আচার্য শ্রীঅনিল-দেব তালে তাল ঠোকেন, আর নাচ শেখেন লতিকারা ; চন্দনের গন্ধ নাচে গগনে ;—

সেই হেন বসন্তকালে, রাজকুমার,—আমার কপাল দোষে—মাসখানেকের জন্যে, নিজের মহিষীদের এবং তাঁর ঐ আদরের তনয়াটিকে সঙ্গে নিয়ে চ'লে গেলেন কলিঙ্গরাজ···সাগরতীরে, তাঁর ক্রীড়া-

কাননে। সঙ্গে গেলেন বহু নাগরিক। রৌদ্রের খরতা লঙ্ঘন করতে হ'লে সৈকত-বিহারই নাকি প্রশস্ত,···সাগরতরঙ্গের শীকর-স্নেহ অঙ্গে মেখে তখন নাকি সুশীতল হয়ে ওঠে কানন,···সাগরতটে তখন নাকি বিছিয়ে থাকে ভ্রমর-ঝরা কচি কচি পাতার বিছানা।

তারপরেই আমি হঠাৎ একদিন শুনতে পেলুম,—সেখানে যখন চলছিল অবিশ্রান্ত সঙ্গীত, চলছিল সঙ্গত, চলছিল অঙ্গনা-সহস্রের শৃঙ্গার, হেলাফেলা সারাবেলা কাম-সঙ্ঘর্ষ···অনর্গল; এবং কলিঙ্গরাজ কর্দন যখন সম্পূর্ণ নিমগ্ন ছিলেন কামতন্ত্রে;—অকস্মাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন রন্ধ্রান্বেষী অন্ধ্রনাথ জয়সিংহ; নৌকা-বোঝাই অসংখ্য সৈন্য তাঁর সঙ্গে;···সকলত্র বন্দী করেছেন কলিঙ্গরাজকে। ত্রাস-চঞ্চল-নয়না আমার প্রেয়সী কনকলেখাকে, এমন কি তাঁর সখী-দেরও ধ'রে নিয়ে তিনি চ'লে গেছেন নিজের রাজধানীতে।

রাজকুমার, আমার সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিলেন অনঙ্গ। কোথায় আহার, কোথায় মন! সারাক্ষণ প্রেয়সীর চিন্তা! অথচ কিছুই করতে পারছি না। গ'লে ঝ'রে ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল দেহের লাবণ্য। কেবল ভাবতে লাগলুম—

"কী করি কী করি! জনক-জননীর সঙ্গে শত্রুর খপ্পরে পড়েছেন সুন্দরী। এখন যদি ধৈর্য হারিয়ে কনকলেখাকে লুট করতে ছোটে রাজা! সতী তা কি সইতে পারবেন? তবে কি শেষে বিষ খেয়ে তিনি মরবেন?···তাঁরই যদি এই দশা হ'ল তাহলে এখন আর আমার···বেঁচে থেকে সুখ কী? মদনই দেখছি আমায় মারলেন··· কা গতি!"

কিন্তু দৈবের কৃপায়, এই হেন দুর্দান্ত সময়ে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক ব্রাহ্মণের। তিনি আসছিলেন অন্ধ্রনগর থেকে। কথায় কথায় তিনি আমাকে বললেন—

"রাজা জয়সিংহ হত্যা করতে চান কর্দনকে ; অশেষ যন্ত্রণাও তাঁকে দিচ্ছেন ; কিন্তু···কনকলেখার রূপলাবণ্য দেখে এমনি রাজা মজেছেন যে, প্রেমের রগড়টাই বাঁচিয়ে দিয়েছে কর্দনকে। কনক-লেখাই হয়ে দাঁড়িয়েছেন অকুস্থল···সঙ্কটের। শুনছি, জনৈক যক্ষ নাকি ভর করেছেন রাজকন্যাকে। জয়সিংহ সামনে এলেই, বা তাঁর কোনো পারিষদ্ সামনে এলেই, কন্যাটি নাকি এক পলকও স্থির হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না! অদ্ভুত হয়ে ওঠেন। ঐন্দ্রজালিক-দের আহ্বান করা হয়েছে, যক্ষ-বিদায়ের অনেক প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু সিদ্ধি···বহু দূর।"

ব্রাহ্মণের কথায় আমার যেন···দিক্‌দর্শন হ'ল।

আমি তখন···শঙ্কর-নাচা সেই শ্মশানের জীর্ণ শালগাছটির ফাটল থেকে জটাগুলোকে টেনে বার করলুম, জটা মাথায় যোগী সাজলুম। ছেঁড়া কাঁথায় গা ঢেকে···বসলুম। বেশি দেরি হল না, ·· কতকগুলো শিষ্যও জুটিয়ে ফেললুম। নানান প্রকার অত্যাশ্চর্য বিভূতি দেখিয়ে, ঠকিয়ে-আদায়-করা অন্নবস্ত্র তাদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিয়ে সদ্য পুলকিত ক'রে তুললুম তাদের। তারপর কয়েকটি দিন যেতে না যেতেই সশিষ্য প্রবেশ করলুম অন্ধ্রনগরে। নগরের কাছেই বিশাল এক সরোবর। হাঁস পড়েছে তাতে। কত সারস! ডানার আঘাত লেগে জলে ঝ'রে পড়ছে পদ্মবনের পরাগ। পরাগে চকিত হয়ে রয়েছে জলতল। সায়র-তীরের কাননে রচনা করলুম আশ্রম।

শিষ্যদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল যোগীরাজের বিভূতির ব্যাখ্যা। আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে নাগরিকেরা আসতে লাগলেন আশ্রমে। আমি যে একটি অতিসন্ধান-দক্ষ যোগীপুরুষ—এই কীর্তিকাহিনী ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। যথা :—

১ দল।—"মুনিটি, বুঝেছ হে, বুড়ো-বনটির ধারে···সায়র-তটে

আশ্রম বসিয়েছেন। জলের মধ্যে শুয়ে থাকেন সারাদিন! আর মুনির ঠোঁটের ডগায় নাচেন—সরহস্য ষড়ঙ্গ বেদ; শাখাপ্রশাখা—শাস্ত্রগুলো তো আছেই।

২ দল।—অগাধ পাণ্ডিত্য! যে যা বুঝতে পারছে না,—বুঝেছ ভায়া, তাঁর কাছে একবার গেলেই আপনা হতেই জলের মতো নির্ণয় হয়ে যায় তার অর্থ। এতটুকুও মুখে আটকায় না হে!

৩ দল।—ওঃ হো, অসত্য কথা? তার···লাগই নেই তাঁর মুখে। দয়ার দেহ। ওঁর দয়ার দুফোঁটা শিশির ঝরলেই অচিরে চরিতার্থ হয়ে যায় দীক্ষা! কত লোক যে এল গেল!···ওষুধ নেই এমন রোগ, মাথায় ওঁর পায়ের ধূলো ছড়াতেই···সেরে গেল, নিস্তার হ'ল আতঙ্কের।

৪ দল।—ওঝাদের হাজার বিদ্যে যেখানে নিষ্ফল, সেখানে নিয়ে এস ওঁর চরণ-ধোওয়া জল, একটু ছিটিয়ে দাও মাথায়, ব্যস্, এক নিমিষে ছেড়ে যাবে ভয়ঙ্কর গেরোগুলোর ভূত! উঃ কী শক্তি রে বাবা,···ইয়ত্তাই হয় না।। অথচ এক কণা নেই অহঙ্কার।"

এই-হেন আস্থ-সঞ্চারিণী রটনা···দেখতে দেখতে···আশ্রমে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে এল ক্ষত্রিয় জয়সিংহকে। জয়সিংহের একমাত্র চিন্তা—কনকলেখার ঘাড় থেকে কেমন ক'রে যক্ষটাকে নামানো যায়। তাই অহরহঃ তাঁকে আসতেই হ'ল আশ্রমে। কত আদর কত যত্ন! কত অর্চনা কত পূজাপাঠ! অর্থ দিয়ে মন গলালেন আমার শিষ্যদের! তার পরে সময় বুঝে, তিনি একদিন অভীষ্টসাধনের জন্য ধীরে ধীরে আমার পদপ্রান্তে উপনিষণ্ণ হয়ে প্রার্থনা জানালেন,··· ভিক্ষা চাইলেন। আমি তখন সমাধিস্থ হয়ে ব'সে ছিলুম,···ধ্যান-ধীর। যথাস্থানে যথাজ্ঞানের লীলা দেখিয়ে জয়সিংহের দিকে চোখ তুলে চাইলুম; ভাল ক'রে দেখে শুনে, বাণী দিলুম—

"বৎস, এ ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার অবকাশ রয়েছে বটে। কন্যারত্নটি অশেষ-কল্যাণ-লক্ষণা। সাগর-রশনা গঙ্গাদি-সহস্র-হারবিভূষণা এই

ধরিত্রী সেই সৌভাগ্যবানের, এই লক্ষ্মীটি যাঁর করায়ত্ত। এক যক্ষ··· কন্যাটিতে অধিষ্ঠান ক'রে রয়েছেন। নীলপদ্মের মতো তাঁর এই প্রেয়সীটির উপর কোনো নরনাথের দৃষ্টিপাত···তাঁর পক্ষে অসহ্য। দু-তিন দিবস ন্যূনপক্ষে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি প্রচেষ্টা করে দেখব।"

বাণীলাভ ক'রে কিঞ্চিৎ পুলকিত হয়ে বিদায় নিলেন অভ্রনাথ জয়সিংহ।

রাত্রি এল। চাঁদের কিরণ নেই আকাশে। দশটা দিক্‌কে···যেন গিলে খাচ্ছে নীরন্ধ্র অন্ধকার। নিদ্রার আগল পড়েছে নগরীর নয়নে। আশ্রম থেকে আমি বেরিয়ে এলুম। খন্তা হাতে নিয়ে সরোবরের তীর্থ-শিলার পাশে এসে পৌঁছলুম। তারই একটি প্রান্তে, তটটিতে, কষ্টেসৃষ্টে এমন একটি রন্ধ্র খুঁড়লুম, যার ভিতর দিয়ে লুকিয়ে, ডুব দিয়ে, পৌঁছনো যায় জলের তলদেশে। রন্ধ্রের ঘাঁটিটি,···পাথর আর ইঁট সাজিয়ে এমন ক'রে ঢাকা দিয়ে দিলুম, যাতে ক'রে তীরে দাঁড়িয়ে কেউ না দেখতে পায়, কোনো সন্দেহ না জাগে। আশঙ্কার কারণ যখন রইল না তখন হাঁপ ছেড়ে, ভোরের স্নান সেরে, সংগ্রহ করলুম রক্তকমল। এবং উষালোকে যাতে সবাই আমায় দেখতে পায়, এমনি-ভাবে দাঁড়িয়ে···আরাধনা করতে লাগলুম কার্যাকার্যসাক্ষী সহস্র-রশ্মিকে,—

যিনি নক্ষত্রমালার অগ্ররত্ন;
যিনি অন্ধকার-গন্ধগজের কুম্ভবিদারী কেশরী;
যিনি কনকশৈলশৃঙ্গের রঙ্গস্থলের লাস্যলীলানট;
যিনি গগন-সাগরের তরঙ্গলঙ্ঘী এক-চক্র;
এবং যাঁর কিরণজাল রঞ্জিত হয়ে ওঠে পূর্বদিগ্বধূর রক্ত-চন্দনের অঙ্গরাগে।

আরাধনা শেষ ক'রে আশ্রয় নিলুম আশ্রমে

তিনটি দিন কেটে গেল। সেদিন তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

পর্বতরাজনন্দিনীকে যন্ত্রণা দেবার চপল আগ্রহে···গায়ে অস্তগিরির গৈরিক মেখে···শ্রীমতী সন্ধ্যাদেবী তখন ঢ'লে পড়েছেন শঙ্কর-শরীর আকাশে; এবং সূর্যদেবকে দেখতে হয়েছে···সন্ধ্যার রক্তচন্দন-বিচর্চিত স্তনকুম্ভের মতো;···রাজা জয়সিংহ এই দীনের সায়র-নিকেতনে উপনীত হলেন এবং আমার পায়ের উপর মাথার কিরীটখানি রেখে কৃতাঞ্জলিকরপুটে গ্রহণ করলেন নিম্নাসন। আদেশ নিলেন কর্ণে—

"কল্যাণীয়, দৃষ্টিগত এখন ইষ্টসিদ্ধি। ব্রহ্মাণ্ডে দেখা যায়···নিরীহ দেহধারীকে আশ্রয় করেন না শ্রী। নিরলস হস্তেই···নিখিল শ্রেয়ের নিত্যসান্নিধ্য। আমার চিত্ত···অধুনা আকৃষ্ট হয়েছে তোমার যোগ্যতর সদাচারে, অকলঙ্ক অর্চনায় এবং অত্যাদরে। সেই হেতু, আমি নিজে ···সংস্কার-পূত করেছি সরোবরটিকে। আশা করি তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। অর্ধনিশি গতে গাহনকৃত্য বিধেয়। গাহনান্তর প্রাণায়াম সেরে সলিলের তলদেশে যথাশক্তি শয্যা-গ্রহণ করতে হবে প্রথমে। তারপরে জলসংঘাতের মধ্য দিয়ে অচিরাৎ তোমার কানে এসে পৌঁছবে আমার কিঞ্চিৎ ঘোষণা। মৃণালের কাঁটার আঘাত পেয়ে রাজহংস যেমন ত্রাসজর্জর কণ্ঠে···ধ্বনি তোলে, তেমনি হবে সেই ঘোষণার ধ্বনি। সলিল-ঘোষণা শান্ত হ'লেই ক্লিন্নগাত্র, এবং ঈষদারুণ দৃষ্টি নিয়ে যে মূর্তিতে তুমি সলিল থেকে নির্গত হবে, সেই মূর্তি দেখে নির্ভরানন্দে মুগ্ধ হয়ে যাবে মানব-নয়ন। সেই মূর্তির সম্মুখে এক মুহূর্তও দণ্ডায়মান থাকতে সমর্থ হবেন না যক্ষ। দৃঢ় প্রেমের শৃঙ্খল দিয়ে যে কন্যা-রত্নটিকে তুমি এখন বাঁধতে পারছ না, তিনি তখন হবেন সহনীয়-দর্শনা। তুমি বিজয়ী হবে পৃথিবীর। এ বিষয়ে আমি সংশয়হীন।

"যদি বাসনা হয়, তা হ'লে শাস্ত্রজ্ঞানী হিতৈষীদের আহ্বান ক'রে

এই বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করা তোমার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। তারপরে এক শত ধীবর এবং এক শত সেবক নিযুক্ত ক'রে তোমাকে নিঃশঙ্ক করাতে হবে সরোবর। তীরের তিরিশ দণ্ড দূরে দূরে রক্ষা-রচনা করিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে সৈনিকদের। কে জানে, কোন্ ছিদ্র দিয়ে শত্রুরা আবার কখন আসে!"

জয়সিংহের হৃদয়-হরণ এই হ'ল আমার আদেশ। আদেশটির মধ্যে কোথাও কোনো রকমের ফাঁক দেখতে পেলেন না রাজা! বেচারী তখন হাবুডুবু খাচ্ছেন কনকলেখার প্রেমে। অটল তাঁর সঙ্কল্প। বারণ করলুম, মানলেন না।...আমি তখন আমার যোগাসনে ব'সেই পুনর্বার বললুম—

"অনেক দিন হয়ে গেল, এই জনান্তে রয়েছি। এক স্থানে এতদিন অধিষ্ঠান করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। অভীষ্ট-সিদ্ধির পর আমাকে আর তুমি দেখতে পাবে না এখানে। যে রাজ্যে আতিথ্য নেওয়া যায়, সে রাজ্যের শুভার্থে কিঞ্চিৎ কাজ না ক'রে...প্রস্থান করাটি আর্য-গর্হিত। এতদিন আমার এখানে থাকার ঐ একমাত্র কারণ। অদ্য আমার কার্য সিদ্ধ হয়েছে।

"এখন গৃহে যাও। গন্ধজলে স্নান ক'রে, অঙ্গরাগাদির পর কণ্ঠে শুভ্র-মাল্য ধারণ ক'রে, যথাশক্তি ব্রাহ্মণদের দান ও আরাধনা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, সহস্র সহস্র মশালের আলোকে নৈশান্ধকার দূর করতে করতে এখানে তোমার আগমন বিধেয়; ততঃপর যথাকর্তব্য অনুষ্ঠেয়।"

কৃতজ্ঞতায় আনত হয়ে জয়সিংহ তখন বললেন—

"আর্যের সান্নিধ্য না পেলে অসিদ্ধ রইত সিদ্ধি। যে নিঃসঙ্গতা নিরপরাধ দাসকে ত্যাগ-স্বীকার করায়, যাকে নিষেধ করতে পারে না বহু মিনতি, সে নিঃসঙ্গতা সত্যই বড় কষ্টদায়ক।"

এই ব'লে প্রস্থান করলেন অভ্রনাথ।

নির্জন নিশীথ। নির্গত হলুম। সায়র-তটে উপস্থিত হয়ে লুকিয়ে রইলুম রন্ধ্রমধ্যে। ব'সে রইলুম···রন্ধ্রপথে কান লাগিয়ে। অর্ধেক রাত কেটে গেল। যথাদিষ্ট ক্রিয়াগুলি সমাধা ক'রে রাজা এলেন। স্থানে স্থানে খাড়া করা হ'ল রক্ষী। সায়রতলে যত কাঁটা, যত পাথর, যত ভাঙা লোহা, যত ঝাঁঝি ছিল···জেলেরা সব ছেঁচে তুলে ফেলল। নিঃশঙ্ক হয়ে রাজা তখন সলীলগতিতে,···ডুব দিলেন···সরোবরের সলিলে।

মাথা থেকে জটা ফেলে দিয়ে, নাক কান বুজে, আমিও···হাঙর-লীলায় ডুব দিলুম জলে। হাতী তলিয়ে যায় এত জল!·· জলের তলায় রাজাও শুয়েছেন, আর আমিও কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে ধরেছি তাঁর মুণ্ড-সমেত স্কন্ধ। তরেপরেই যমদণ্ডের নির্দয় প্রহার! মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলেন রাজা। সবশেষ। রাজার দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলুম রন্ধ্রপথে; সেইখানে দেহটাকে রাখলুম। তারপরে পুনর্বার ডুব দিয়ে নির্গত হলুম সরোবরের জলতল ভেদ ক'রে। দৌড়তে দৌড়তে ছুটে এল সৈনিকেরা, ঘিরে দাঁড়াল। রূপান্তর দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেল সকলে। এই কি তাদের রাজার চেহারা!

এই দীন তখন—গজস্কন্ধে সমাসীন হয়ে, শ্বেতচ্ছত্রাদি রাজচিহ্নে রাজিত হয়ে, রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। দণ্ডধারী রক্ষিদল ঘূর্ণিত করতে লাগল দণ্ড, পথ ছাড়ল ত্রস্ত জনতা। রাজভবনে এলুম। তখনও রাত বাকি। নয়ন আমার···ভ'রে রইল ভালবাসার রসে; দূর হয়ে গেল তার ঘুমের সোহাগ।

সকাল হ'ল। দিক্‌হস্তীর লাক্ষা-নিরঞ্জিত কুম্ভের মতো, পূর্ব-দিগ্বধূর রত্নমুকুরের মতো···ধীরে ধীরে দেখতে হ'ল সূর্যমণ্ডলটিকে।

যথাকরণীয় অনুষ্ঠান ক'রে আমি তখন আসন গ্রহণ করলুম সিংহাসনে। রাজার উপযুক্ত বটে সেই সিংহাসন। তাতে এত জ্যোতিঃ-করাল খচিত ছিল রত্ন যে, ঠিকরে পড়ে চোখে। হতভম্ব হয়ে সভাসদেরা ব'সে পড়লেন। লালসার হাঁসের মতো তাঁদের চেহারা.

শঙ্কায় যেন সেঁদিয়ে গেছে তাঁদের হস্ত-পদ। গম্ভীরকণ্ঠে তাঁদের

"আর্ষী শক্তির কী অপূর্ব মহিমা! অজেয় যতিশ্রেষ্ঠ···তাঁর সিদ্ধাইয়ের বলে···এমন আশ্চর্যভাবে নীরজা ক'রে দিয়েছেন আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে যে, ঐ পদ্মসরোবরের কমলের চেয়েও এখন ভ্রমর-ভোলানো এবং দর্শনীয় হয়ে উঠেছে আমার চেহারা। আকারান্তর-সিদ্ধি! আজ লজ্জায় নত হয়ে গেল নাস্তিকদের মুণ্ড।···এখন আপনারা যান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি বিশ্বদেবতাদের মন্দিরে মন্দিরে এবার আরম্ভ হোক নৃত্যগীত, বিপুল অর্চনা। দরিদ্রদের দান করা হোক ধন। তাদের দুঃখ যেন মেটে।"

সভাসদদের চোখে মুখে·· বিস্ময়-রসের বন্যা। "জয় জয় জগদীশ" ধ্বনিতে তাঁরা লোপ পাইয়ে দিলেন দশটা দিক্। আদিরাজদের কীর্তির সঙ্গে তুলনা করতে লাগলেন আমার কীর্তি। তারপরে সকলে মিলে সানন্দে আমার আদেশ পালন করতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

আমি তখন প্রেয়সীর প্রিয়সখীটিকে ডাকলুম। কী একটি কাজের অছিলায় সেই দিকেই আসছিলেন 'শশাঙ্কসেনা'। নিভৃতে তাঁকে বললুম—

"এই মানুষটিকে···কখনো কি আপনি দেখেছেন?"

বেচারী তো আনন্দে হাবুডুবু। আমার দিকে এক-নয়ন দেখলেন। তার পরে···হাসতে হাসতে আঙুল দিয়ে চেপে রইলেন ঠোঁট। কুন্দ দাঁতে হাসির নাচ; চোখে আনন্দের ঝরনা। কাজল গড়িয়ে পড়ল গালে। অভিবাদন ক'রে রসিয়ে বললেন—

"দেখেছি···নির্ঘাৎ। চিনেছি···নির্ঘাৎ। যদি দেখেও না চিনতে শিখি, তা হ'লে এখন দেখছি ভেল্‌কী। বলি, এ যাদু শেখালে কে?"

কৃশকথায় এবার শেষ ক'রে ফেলি ঘটনা।

সব কথা তাঁকে খুলে বলতেই শশাঙ্কসেনা ছুটলেন···সহচরীকে জানাতে। চেতনায় এল আহ্লাদ, হৃদয়ে এলেন দয়িতা—কনকের যেন লেখা!

কলিঙ্গনাথ কর্দন তখন সকল কথা জেনে নিয়ে শেষে আমাকে সম্প্রদান করলেন তাঁর কন্যা। এক-শাসনের অধীন হয়ে গেল অন্ধ্র এবং কলিঙ্গ। আমি হলেম রাজ্যশাসক।

হেনকালে আমরা শুনতে পাই কলিঙ্গরাজের এক শত্রুপক্ষ··· আক্রমণ করেছেন তাঁর মিত্র অঙ্গরাজকে। তাঁর সাহায্যের জন্যই দ্রুতগামী সৈন্য নিয়ে আমি এখানে এসেছি। এসেই···কী দেখলুম! দেখলুম, সখা আমার একলা ব'সে নেই···সব সখা তাঁর সঙ্গে! বলিহারি, এ আনন্দের ধাক্কা সামলানো দায়।"

মন্ত্রগুপ্তের বাক্যশৈলীর কৌশলে চমৎকৃত হয়ে অভিনন্দন জানালেন রাজবাহন; সঙ্গে সঙ্গে সুহৃৎরাও। মৃদুহাসির জ্যোৎস্নায় ভেজা ঠোঁট দুটিকে কাঁপাতে কাঁপাতে রাজবাহন বললেন—

"বলতেই হবে, মহামুনির এই কাণ্ডখানি বড় বিচিত্র। উঃ, কী কঠোর তপস্যাই না কী ফলটাই ফলাল! ওষ্ঠক্ষতির রসের ব্যাপার এখন রাখো। বুঝতেই পারছি, কিসের দংশনে তোমার প্রজ্ঞার, তোমার সত্তার, এত হয়েছে উন্নতি!"

এই ব'লে রাজবাহন বহুশ্রুত 'বিশ্রুতে'র দিকে নিক্ষেপ করলেন চক্ষু;—যেন ছুঁড়ে মারলেন ফুটন্ত একটি পদ্মফুল। বললেন—

"রঙ্গমঞ্চে তা হ'লে এবার অবতরণ করুন মহাশয়।"

অষ্টম উচ্ছ্বাস

বিশ্রুত-চরিত

বিশ্রুত বলতে লাগলেন ঃ—

বিন্ধ্য-বনে আমিও ঘুরতে ঘুরতে একদা···এক ইঁদারার ধারে আট বছরের একটি বালককে দেখতে পাই। ক্ষিদে আর তেষ্টায় ছটফট করছিল বেচারী। ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল তার মুখ। কষ্ট পাবার মতো চেহারা নিয়ে সে জন্মায় নি। আমাকে দেখেই কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে,—

"ভাগ্যিস আপনি এসে গেছেন। জলতেষ্টায় ম'রে যাচ্ছি। জল খুঁজতে এসে কুয়োটা আমরা দেখতে পাই। আমার সঙ্গের বুড়ো মানুষটি···জল তুলতে গিয়ে কুয়োর ভিতর পিছলে প'ড়ে গেছেন। জগতে আর আমার কেউ নেই। তাঁকে কিছুতেই তুলতে পারছি না।"

কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি একগাছি লতা এনে···ফেলে দিলুম ইঁদারার ভিতরে। বৃদ্ধকে উদ্ধার করলুম, এবং বাঁশের চোঙা ডুবিয়ে জল তুলে ছেলেটিকে খাওয়ালুম। এক-তীর-পথ উঁচু,···লকুচ-গাছের মাথা থেকে, পাথর ছুঁড়ে মাটিতে পেড়ে ফেললুম গোটা পাঁচেক ফল। ফল আর জল খেয়ে দুজনে যখন কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করলেন, তখন লকুচ গাছের ছায়ায় ব'সে বৃদ্ধটিকে জিজ্ঞাসা করলুম—

"এই বালকটি আপনার কে হয়? আপনিই বা কে? এমন বিপদেই বা আপনি পড়লেন কেমন ক'রে?"

বৃদ্ধের কণ্ঠ···যেন চোখের জলে ভিজে গেল! বললেন:

"তবে বলি শুনুন। 'বিদর্ভ' নামে জনপদ। সেখানে রাজা ছিলেন 'পুণ্যবর্মা'—ধর্মের অংশাবতার, ভোজ-বংশের অলঙ্কার। তাঁর মতো মহাপ্রাণ, সত্যবাদী, বদান্য, বিনয়ী পুরুষ--বিশ্বে বিরল। প্রজাদের ···তিনি ছিলেন বিশিষ্ট নেতা। ভৃত্যরাও তাঁকে ভালবাসত। কীর্তিমান রাজা। মূর্তিতে এবং বুদ্ধিতে প্রকাশ পেত উত্থানশীলতা, হৃদয়ে বিনয়। শাস্ত্র মেনে চলতেন। যখন কোনো কাজ আরম্ভ করতেন তখন, আগে থেকেই বিচার ক'রে দেখতেন--'শক্য, ভব্য, এবং কল্প'—এই বিধিগুলির বিধান-অনুসারে, (অর্থাৎ স্ব-সামর্থ্য, গণকল্যাণ ও অভঙ্গুর কল্পনার সহযোগিতা বজায় রেখে) কাজটি সুসম্পন্ন করা যায় কি না! বিদ্বানদের গুণ-গ্রহণে, সেবকদের উপর নিজের প্রভাববিস্তারে, বন্ধু-নির্বাচনে, এমন কি শত্রু-দমন ব্যাপারে, যাঁরা অসম্বদ্ধ প্রলাপী তাঁদের কথায় তিনি কর্ণপাত করতেন না। গুণ দেখলেই, গ্রহণ করা তাঁর চাই-ই চাই। কলাবিদ্যায়, ধর্মার্থসংহিতায় অসামান্য ছিল তাঁর জ্ঞান-নৈপুণ্য। যেখানে এতটুকু পেয়েছেন উপকার···সেখানে প্রত্যুপকার করতে তিনি ভুলতেন না। তিনি ছিলেন,—

রাজকোষ এবং বাহন বিষয়ে···গবেষক,
অধ্যক্ষদের···পরীক্ষক,
কৃতকর্মাদের···উৎসাহদাতা,
দৈব বা মানুষী বিপদের···প্রতিকারকর্তা।

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয়,—এই রাজনৈতিক ষড়গুণে তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। মনু-মার্গ অবলম্বন ক'রে তিনি প্রণেতা হয়েছিলেন চাতুর্বর্ণ্যের। পুণ্যশ্লোক···'পুণ্যবর্মা'···যথারীতি পুণ্যকর্মের দাক্ষিণ্যে পূর্ণ আয়ুঃ লাভ ক'রে, এবং প্রজাদের দীনপুণ্য ক'রে একদিন বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন অমরদের রাজত্বে।

পুণ্যবর্মার পরেই রাজা হলেন 'অনন্তবর্মা'। পূর্বরাজার যেন সম্প্রসারণ। কিন্তু গুণগ্রামে সমৃদ্ধ হ'লে হবে কি, দৈব তাঁকে একটি

গুণ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন; তিনি তেমন সমাদর করতেন না রাজনীতি-বিত্তার। অতএব 'বসুরক্ষিত'—তাঁর পিতৃসম্মানিত বৃদ্ধ মন্ত্রী —একদা তাঁকে গোপনে প্রৌঢ়বাণী শোনালেন—

"মহারাজ, আভিজাত্য থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত রকমের আত্ম-সম্পদ্ আপনার রয়েছে। আপনার মধ্যে রয়েছে নিসর্গপটীয়সী বুদ্ধি; শিল্পে, ললিতকলায়, কাব্যে, চিত্রে, নৃত্যগীতবাদিত্রে,···আপনার যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, অন্যের মধ্যে তার কল্পনা অসম্ভব। তথাপি · অর্থশাস্ত্রে আপনার ততটা আত্মসংস্কার নেই ব'লে···তেমন ভাস্বর হয়ে জ্বলছে না এই বুদ্ধি; ম্লান হয়ে রয়েছে···অনগ্নি শোধিত স্বর্ণের মতো। অর্থশাস্ত্রে যে নৃপতির সক্রিয় হয় না মেধা, তিনি পরম ঐশ্বর্যশালী হ'লেও, দেখেও দেখতে পান না, বুঝেও বুঝতে পারেন না, ···কখন তাঁর স্কন্ধে এসে শত্রু চেপে বসল; সাধ্য বা সাধনকে···বিভাগ ক'রে নিয়ে, কোনো কাজই তিনি সুসম্পন্ন ক'রে উঠতে পারেন না। অযথা একটা কাজ ক'রে ফেলে, তাঁকেই শেষে ফিরে পেতে হয় আঘাত···শত্রুর কাছ থেকে, এমন কি নিজের লোকের কাছ থেকেও। হানি ঘটে।

প্রজারা চায়—অলব্ধ অর্থের লাভ, এবং লব্ধ অর্থের রক্ষণ। যে রাজা অর্থশাস্ত্রের এই যোগ-ক্ষেমের তত্ত্ব অবজ্ঞা ক'রে চলেন, তাঁর আজ্ঞা···গ্রহণ করতে চায় না প্রজারা। তারা তখন শাসন লঙ্ঘন করে, যা-তা প্রচার করতে থাকে, যা প্রাণ চায় তাই ক'রে বসে। সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় সমস্ত স্থিতি। মর্যাদাজ্ঞান-হীন জনতা ইহলোকে এবং পরলোকে অনাথ হয়, আত্মভ্রষ্ট হয়।

মহারাজ, আগমের দীপান্বিত পথ ধরেই সংসারে লোকযাত্রা চলেছে···সুখে। যে সব বিষয় দর্শনের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে,··· অথবা যে সব বিষয় দূরপরোক্ষ,···অথবা যে সব বিষয় ভূতভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে জড়িয়ে রয়েছে,···সেই সমস্ত বিষয়ে, শাস্ত্রই একমাত্র দিব্য-চক্ষু। শাস্ত্রের বৃত্তিকে প্রতিহত করা অসাধ্য। এটি যাঁর নেই, তিনি

বিশালাক্ষ হলেও অন্ধের মতো চলতে থাকেন,···যেহেতু তিনি অর্থ-দর্শনে অপারগ। তাই মহারাজ, আমার নিবেদন,·· বাহ্যবিদ্যাগুলিতে আসক্তি ত্যাগ ক'রে ফিরে আসুন আপনার নিজের কুল-বিদ্যায়··· দণ্ডনীতি-শাস্ত্রে। শাস্ত্র-সম্মত কর্মানুষ্ঠান করুন; সঞ্চয় করুন শক্তি। সিদ্ধি অনিবার্য। অস্খলিত-শাসন হয়ে চিরদিন মহারাজ, পালন করুন সমুদ্রমেখলা এই ধরিত্রীকে।"

কথাগুলি···নিবিষ্ট মনে অনন্তবর্মা শুনলেন, বললেন—

"উপযুক্তই হয়েছে গুরুজনের অনুশাসন। পালন করাই আমার কর্তব্য।"

বৃদ্ধ মন্ত্রীকে বিদায় দিয়ে অনন্তবর্মা প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে। প্রমদাদের সঙ্গে সেখানে যখন চলেছে আমোদ আহ্লাদ,···প্রসঙ্গক্রমে অনন্তবর্মা উল্লেখ করলেন বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই উপদেশ-দেওয়ার গল্প। নিকটেই বসে ছিলেন 'বিহারভদ্র'। মহারাজের কুমার-অবস্থা থেকেই তিনি তাঁর সেবক। কান পেতে তিনি সব শুনলেন।

হৃদয়-রঞ্জনী কথা বলবার শক্তি· বা কৌশল মানুষের যে কত রকমের থাকতে পারে, বিহারভদ্রকে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা তা অসম্ভব। মহাত্মার একটিই ছিল সম্পত্তি; সেটি·· রাজার নেক-নজর। নাচে গানে বাজনায় তিনি···যাকে বলে 'ঝনটু'। বারাঙ্গনারা তাঁর প্রাণ। কথায় মোচড় মেরে রঙ্গ ক'রে ভাও বাতলাতে···তিনি সিদ্ধ-পুরুষ। মুখে রাশ নেই। পরের মর্মের খোঁজ রাখা তাঁর পেশা। হাস-কুটে, মহাঘুঁটে। পরনিন্দায়, খলতায়, ক্রূরতায় তিনি মহাপণ্ডিত! ঘুষ নিয়ে তিনি এমন হাত পাকিয়ে ফেলেছিলেন যে, মন্ত্রীদের কাছ থেকেও ঘুষ নিতে···দ্বিধাবোধ তিনি করতেন না। দুর্নীতির উপাধ্যায়! কামতন্ত্রের তরণীখানি ঘাটে ভিড়োনোর কাজে তাঁর মতো দক্ষ কর্ণধার দুনিয়ায় দুষ্প্রাপ্য।

একটি ছোট্ট হাস্য···ওষ্ঠতটে মুচকিয়ে নিয়ে, বিহারভদ্র তখন মহারাজকে বললেন—

"দেবতা, ধূর্তের কথা···মুখে আনবেন না। দৈবানুগ্রহে যদি কোনো মহাত্মা পুরুষ কিঞ্চিৎ বিভূতি লাভ করলেন, অমনি দেখবেন, তথায় হাজির হয়ে গেছেন ধড়িবাজ-মহোদয়েরা,···ভালমন্দ, ছোট বড় নানান কথায় সম্মোহিত ক'রে, হীন প্রলোভন দেখিয়ে, অথবা কদর্থে জড়িয়ে, নিজেদের স্বার্থটি ঠিক হাসিল ক'রে বেমালুম কেটে পড়েছেন তাঁরা।

এই দেখুন না কেন···চালাক-চক্রবর্তীদের কীর্তি !—

সবাই জানে,···মানুষ একদিন মরবে। বেশ, কিন্তু মরবার পরে, ···পরলোকে গিয়ে···মানুষের কী কী লভ্য হতে পারে, কত পরিমাণ লাভ থাকতে পারে, কেমন ক'রে লাভ হতে পারে,কিসে বেশি লাভ হতে পারে,···ইত্যাদির পর্বতপ্রমাণ তালিকা দেখিয়ে, আশা জাগিয়ে, তাঁর জীবদ্দশাতেই এই ধড়িবাজদের দল মুমুক্ষু মানুষটির মাথা মুড়োবেন, কুশের দড়ি দিয়ে হাত বাঁধবেন, হরিণের চামড়া কোমরে পরাবেন, ননী দিয়ে গা মাজাবেন, শেষে অনশনে শয্যাশায়ী করিয়ে নিজেদের মুঠোর মধ্যে টেনে আনবে মূর্খটার সর্বস্ব। আহা, কী চমৎকার !

এঁদের চেয়েও আবার যাঁরা ঘোরতর পাষণ্ডী, তাঁরা সেই মূর্খটিকেই বাধ্য করাবেন—স্ত্রী পুত্র শরীর প্রাণ···সমস্ত বিসর্জন দিতে। মূর্খদের মধ্যে যদি কোনো···সুচতুর-জাতীয় জীব···বেঁকে বসেন, অর্থাৎ নিজের হাতের-পাঁচটিকে মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ভাসিয়ে দিতে না চান, তা হ'লে ···আর যায় কোথা···তাঁকে ঘেরাও ক'রে বসবেন এই সব ধাপ্পা-বাজের দল, শোনাতে থাকবেন বড় বড় কথা, যেন ঋষি-বাক্য। যেমন :—

'এক বুড়ি কড়ি ফেলেই···টানতে হয় হে···লাখ লাখ বুড়ি,'

'অস্ত্র না ধ'রেও শত্তুর নিপাত করা যায় হে,'

'হে মরণশীল মানব, একটিই মাত্র তোমার শরীর।-কিন্তু তাতে

কী আসে যায়? আমাদের উপদিষ্ট মার্গ ধ'রে চল; সম্রাট হওয়া তোমার ঐ নখের ডগায়।'

নিমরাজী হয়ে যজমান আবার যেই প্রশ্ন করবেন—'কী সেই মার্গ?' তখন এঁরা উত্তর ছাড়বেন :—

'বৎসগণ, জেনে রেখো,—রাজবিদ্যা চতুঃপ্রকার, যথা 'ত্রয়ী', 'বার্তা', 'আন্বীক্ষিকী', ও 'দণ্ডনীতি'। এগুলির মধ্যে তিনটি মহতী,··· ধীরে ধীরে ফল ফলায়। সেগুলি কিন্তু অবান্তর। তার চেয়ে সংসারে দণ্ডনীতি অধ্যয়ন করাই প্রশস্ত। মৌর্যদের হিতার্থে আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত ইদানীং ছ'হাজার শ্লোকে সেটিকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন। বৎসগণ, দণ্ডনীতি অধ্যয়ন ক'রে যদি তোমরা তার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পার, তা হ'লেই···যথোক্ত ফল পাবে।'

যজমান তখন বলবেন—'তথাস্তু।'

এবং আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত-প্রণীত সংক্ষিপ্ত দণ্ডনীতি তিনি অধ্যয়ন করতে লেগে যাবেন, অথবা শুনে শুনে শিখতে থাকবেন। অধ্যবসায় করতে করতেই যজমানের দেহে দেখা দেবে জরা। এই শাস্ত্রটি আবার সর্বশাস্ত্রানুবন্ধি। বাঙ্‌ময় সমস্ত কিছুই না জেনে ফেললে এর তত্ত্ব বোঝা ভার। বহুই হোক আর অল্পই হোক, সময়সাপেক্ষ— এই নীতির অধিকার।

যিনি অধিকারী হবেন এই শাস্ত্রের, প্রথম থেকেই তাঁকে কিন্তু বিশ্বাসের বাইরে রাখতে হবে আত্মীয় স্ত্রী পুত্র পরিজন। নিজের ছেলের জন্যেও যদি ভাত রাঁধতে হয়, তা হ'লে দেখবেন,···কতটি তণ্ডুল, কতটি কাঠ লাগছে তিনি নিচ্ছেন তার হিসেব, মান-উন্মান ক'রে তবে·· এতটি-এতটি ক'রে বণ্টন করছেন চাউল।

ধরুন, রাজা ঘুম থেকে উঠলেন। মুখ ধোওয়া হ'ল কি হ'ল না,— তাঁকে বসতেই হবে···নগরের বা গ্রামের হিসাব-পরীক্ষকদের নিয়ে। তাঁদেরই মুঠিতে থাকে কিনা রাজ্যের হিসেব!

দিনের প্রথম প্রহরে রাজাকে শুনতেই হবে বিরাট আয়ব্যয়ের

হিসেব। রাজাও শুনছেন, আর ওদিকে ধূর্তেরাও রাজার চোখে ধূলো দিয়ে ডবল করছেন লুঠ। চাণক্য যেখানে লিখে গেছেন আহরণের চল্লিশটি উপায়,—এই বিকল্প-দ্রষ্টারা···আত্মবুদ্ধির মাহাত্ম্য দেখিয়ে সেখানে উদ্ভাবন করবেন হরণের সহস্র উপায়।

দ্বিতীয় প্রহর। মামলাবাজ প্রজাদের আক্রোশ বা অভিযোগ শুনতে শুনতে কান পুড়ে যাবে রাজার, জীবনধারণটাই মনে হবে··· বিরাট একটি কষ্ট। সেখানেও বিচারপতিরা খুশিমত এঁকে হারাচ্ছেন, ওঁকে জিতোচ্ছেন ; নিজেদের অর্থপূর্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজাকেও জড়িয়ে ফেলছেন···পাপে।

তৃতীয় প্রহর। স্নান করতে ভোজন করতে···অবশ্য একটু অবসর পেলেন রাজা। খেতে বসলেন রাজা,···ওজন-করা ভোজন! কিন্তু তাও কি সুস্থির মনে খেতে পাবেন? অসম্ভব ভয়। বিষ মেশায়নি তো অন্নে?

চতুর্থ প্রহর। নৃপতির শাস্তি বড় কম নয়। হিরণ্য-প্রতিগ্রহের জন্য হস্ত প্রসারণ ক'রে ঠায় ব'সে থাকুন তিনি।

পঞ্চম প্রহর। মন্ত্রীর সঙ্গে গূঢ় মন্ত্রণার সময়। রাজার পক্ষে সেটি কিন্তু একটি বিরাট যন্ত্রণা। সেখানে দেখবেন,—মন্ত্রীরাই···অহো··· মধ্যস্থ! সড় ক'রে ইনি এঁকে, উনি ওঁকে, একবার করছেন দোষী, একবার করছেন গুণী ; দূতের বাক্য, গুপ্তচরের তত্ত্বকথা, দেশ কাল ও কার্যের অবস্থা, কিছু ঘটুক বা না ঘটুক,—সমস্ত কিছুকেই মন্ত্রীরা নিজেদের ইচ্ছামত নিছক পরিবর্তন ক'রে ফেলছেন! উপজীবিকার পথ খুলে রাখছেন···নিজের বা পরের মিত্র, এমন কি শত্রুমণ্ডলের জন্যেও! প্রয়োজন-মতো বাইরে বা ভিতরে রাজার বিরুদ্ধে গোপনে ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়ে,···প্রকাশ্যে আবার রাজস্বামীর সামনে সেই অগ্নি-টিকেই নিবিয়ে দিয়ে,···রাজাকেই তাঁরা বন্দী ক'রে রাখছেন নিজেদের সুমধুর বশ্যতায়

ষষ্ঠ প্রহর। রাজার ছুটি হ'ল। এবার যেমন খুশি বিহার করুন

মহারাজ, যেমন খুশি গালগল্প করুন মহারাজ। যে স্বৈরবিহারের মাত্র দেড়টি ঘণ্টা সময়—সে পোড়া…বিহারের বালাই নিয়ে তিনি মরুন।

সপ্তম প্রহর। রাজার তখন মহা খাটুনি…চতুরঙ্গবল পর্যবেক্ষণ।

অষ্টম প্রহর। সেনাপতির সঙ্গে একত্রে বসে…বিক্রম-চিন্তাক্লেশ। আদিতে ক্লেশ, অন্তে ক্লেশ…সমস্তই ক্লেশ।

তার পরে…অহো, কী সৌভাগ্য মহারাজের! সন্ধ্যা নামলেন। সন্ধ্যাহ্নিক করবেন রাজা। কিন্তু রক্ষে নেই! উপাসনাশেষেই রজনীর প্রথম ভাগেই ··মহারাজকে দর্শন দিতে হবে গূঢ় পুরুষদের কাছে। কোথায় উপাসনা, আর কোথায় ভদ্রবেশী গুপ্তচর! এই সব ভয়ঙ্করদের, নৃশংসদের…গোপনে প্রেরণ করতে হবে নৃশংসতম রাজকার্যে; তাঁরা শাস্ত্রমারক, অগ্নিমারক, বিষমারক।

রাত্রির দ্বিতীয় ভাগে—মহারাজের ভোজন-পর্ব। তারপরেই শ্রোত্রিয়দের নিয়ে স্বাধ্যায়ের আরম্ভ।

তৃতীয় ভাগে,…তুর্যনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে…শয়নে চলুন মহারাজ।

চতুর্থে ও পঞ্চমে,…কী পরিপাটী ব্যবস্থা। পরিশ্রান্ত নরপতিকে ঘুমোতেই হবে;—সময় তিন ঘণ্টাকাল। অজস্র চিন্তাভারে বিহ্বল-মস্তিষ্ক রাজা-বেচারীর আবার নিদ্রাসুখ!

ষষ্ঠে,…রাজামহাশয়কে আরম্ভ করতে হবে…শাস্ত্রচিন্তা, কার্যচিন্তা।

সপ্তমে,…মন্ত্রগ্রহ! দূতদের অভিপ্রেষণ! চমৎকার মহাশয়-ব্যক্তি এই সব রাজদূতেরা। দোতরফা তোষামোদ ছড়িয়ে পারিতোষিক সংগ্রহ ক'রে তাঁরা বেরিয়ে পড়বেন। পথে তাঁদের ভোগ করতে হয় না শুল্ক-বাধা; অতএব বাণিজ্য চলতে থাকে পথে, বাড়তে থাকে লক্ষ্মী। অত্যন্ত কাজের লোক এঁরা; কাজ না থাকলেও, গতর খাটিয়ে তাঁরা খুঁজে বার করবেনই…কাজ। তারপর সেই কাজ নিয়ে অবিশ্রান্ত কী ঘোরাঘুরি, ভ্রমণ! ভ্রমণমূলেই এঁরা করেন অর্জন।

রজনীর অষ্টম ভাগে,…শুভাগমন হবে পুরোহিতদের। সাশীর্বাদ তাঁরা বলবেন—

'মহারাজ, অদ্য দুঃস্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে গ্রহগণ দুঃস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। লক্ষণগুলিও সাতিশয় শুভ বলিয়া বিবেচিত হয় না। শান্তিস্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। সৌবর্ণ হোম-সাধনই বিধেয়। অত্র উপস্থিত ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণগণ যদি স্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠান করেন, কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। পরন্তু এই ব্রাহ্মণগণ দরিদ্র, বহুসন্ততি-যুক্ত, যজ্বন্ এবং বীর্যবান্; অদ্যাপি কাহারও নিকট দান-প্রতিগ্রহ করেন নাই। শান্তি-পাঠান্তে তণ্ডুল বিকীর্ণ হইলেই·· সুফল ফলিবেক। মহারাজ লাভ করিবেন—দীর্ঘায়ুঃ, স্বর্গ এবং অরিষ্টনাশ।'

এই রকমের অনেক কিছু জ্ঞানগভীর আশীর্বাচনের উৎপীড়নে রাজাকে জর্জরিত ক'রে, ঐ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগুলোকেই মুখপাত ক'রে পুরোহিত মহাশয়েরা নিজেরাই একান্তে করতে থাকবেন তাদের সর্বস্ব ভক্ষণ। * * *

অহর্নিশি…অশ্রান্ত নিন্দা, অবিরাম ক্লেশ! সুখের লেশমাত্র কোথাও নেই; আহা, রাজা আমার রাজত্ব করছেন! এই ধরনের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে যে-রাজাকে অভ্যাস করতে হয় দণ্ডনীতি, সেই নীতিজ্ঞের পক্ষে রাজচক্রবর্তী হওয়া তো দূরের কথা, নিজের আত্মীয়মণ্ডলকেই রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্রজ্ঞদের আজ্ঞায় যদিই বা রাজা কিছু দান করেন, বা কিছু মেনে চলেন, বা প্রিয় ভাষায় কিছু বলেন,—সেই সমস্তের পিছনে থাকবেই অতি-সন্ধান,…অতএব অবিশ্বাস। অবিশ্বাস্যতাই জন্মভূমি অলক্ষ্মীর। লোকযাত্রার জন্য যতটুকু নীতির প্রয়োজন, ততটুকুই এঁদের কাছে সিদ্ধ। পুরো শাস্তোর আবার নাকি ফল দেয় না! যদি ফলই দেবে, তা হ'লে তো যে কোন মূর্খ বলতে পারে—'মা, তুইও আমার মতো দুধ খা!'

মহারাজ, সেই জন্যে বলছি, ঐ দণ্ডনীতির যন্ত্রণাভোগ ছেঁটে ফেলে

দিয়ে পাঁচ-পাঁচটা ইন্দ্রিয় যে সুখগুলো দান করে, যথেষ্ট ভোগ করুন সেই সব সুখ। ঐ যাঁরা উপদেশ দিচ্ছেন—

জিতেন্দ্রিয় হওয়া কর্তব্য ; কামক্রোধাদি পরিত্যাজ্য ;
শত্রুমিত্র উভয়েতেই সাম-দান-দণ্ড-ভেদ অজস্র-প্রযোজ্য ;
সুখের অবকাশ না দিয়ে জীবনের স্বল্প সময়টি···সন্ধি-বিগ্রহ
ইত্যাদির চিন্তায় ব্যয়িতব্য ;—

তাঁরাই, ঐ বকধার্মিক মন্ত্রীগুলোই···মহারাজ দেখবেন,···রাজধানী লুঠ ক'রে রাজভোগে লুটোচ্ছেন···দাসী-বাঁদীদের ঘরে ঘরে! এই নিরপরাধগুলি কাঁরা? শুক্র, অঙ্গিরস, বিশালাক্ষ, বাহুদন্তিপুত্র, পরাশরাদি মন্ত্রকর্কশ শাস্ত্রতন্ত্রকার মুনি-ঋষিদের মতো, তাঁদেরও কি জয় করতে হবে···ষড়রিপু? তাঁদেরও কি অনুষ্ঠান করতে হবে শাস্ত্র? কাজ আরম্ভ হয়ে গেলে তাঁরা কেবলমাত্র দুটি জিনিস দেখেন—সিদ্ধি আর অসিদ্ধি। এমন শাস্ত্রে যাঁরা পাঠ নিচ্ছেন, তাঁদেরও সন্ধি পাততে হয়···অপাঠীদের সঙ্গে। * * *

"মহারাজ, আপনি দেবতাবিশেষ। আপনার কুল বিশ্ববরেণ্য, নবীন আপনার বয়স, চেহারা দেখলে নয়ন ভোলে, পরিমাণ সেই বিভূতির; বৃথায় খোয়াবেন না এই অসামান্য ধন,···স্বরাষ্ট্র-চিন্তন তন্ত্রের পিছনে, বৈর চিন্তন মন্ত্রণার পিছনে। ওগুলো অবিশ্বাসের জনক; সুখের উপভোগের প্রতিবন্ধক। ও দুটির মধ্যে এত বেশী পথ্-ভেদ যে, সমস্ত কাজেই দেখা দেয় সংশয়। আর তাও বলি, কেনই বা আপনি খোয়াতে যাবেন জীবনের আনন্দ? কী অভাব রয়েছে আপনার? আপনার রয়েছে দশ হাজার হাতী, তিন লাখ ঘোড়া, অনন্ত সৈন্যবল। স্বর্ণে-রত্নে পূর্ণ রয়েছে আপনার সহস্র সহস্র রাজকোষ। এত আছে যে, সহস্র যুগ ভোগ ক'রেও মানুষ রিক্ত করতে পারবে না আপনার কোষাগার। এতও কি পর্যাপ্ত নয়? তবে কেন···আরও অর্জনের জন্যে আপনাকে স্বীকার করতে হবে···আয়াস? এইটুকু তো জীবন, চার-পাঁচ দিনের খেলা। তার মধ্যে

দাঁড়িয়ে আছেন···ভোগ্যযোগ্য এই এক টুকরো বয়েস···অল্পেরও অল্প! অর্জনের নেশায় মেতে অপণ্ডিতরাই ধ্বংস করেন নিজেদের যৌবন। ধন যখন কাঁড়ি হ'ল, তখন সেই ধনের এক কণা আস্বাদ করবার চেষ্টাও···তাঁদের আর থাকে না।

কত আর বলব, মহারাজ, দয়া ক'রে এবার রাজ্যের গুরুভার সমর্পণ ক'রে দিন,···ভার-বহন-পটুদের হাতে·· ভক্তিমানদের হাতে, ···যাঁরা আপনার অন্তরঙ্গ, তাঁদের হাতে। তারপরে ব্যস্, চলুন সেখানে···যেখানে রয়েছেন অপ্সরাদের পালটরূপিণীরা, অন্তঃপুর-মোহিনীরা,···রয়েছে ঋতুতে ঋতুতে আনন্দ,···রয়েছে গীত সংগীত; আর রয়েছে···পানশালা। লাভ করুন নব কলেবর।"

এই ব'লে পাঁচটি অঙ্গ দিয়ে মাটি ছুঁয়ে, মাথার চূড়োয় অঞ্জলির চুমো দিতে দিতে, কাত হয়ে গড়িয়ে শুয়ে পড়লেন বিহারভদ্র। হোঃ-হোঃ ক'রে হেসে উঠলেন প্রমদারা। প্রীতির অরুণ ফুল ফুটে উঠল সবার চোখে।

হাসতে হাসতে জননাথ বললেন—

"বলি, ও বিহারভদ্র, আপনি যে দেখছি হিতোপদেশ আওড়াতে আওড়াতে গুরুমশাই হয়ে উঠলেন! এবার মাটি ছেড়ে দিয়ে দয়া ক'রে তবে উঠুন। লোকে যে শেষে অপবাদ দেবে,···বলবে, গুরুত্বের বিপরীতটিকেই আলিঙ্গন করেছেন চাঁদ!"

বিহারভদ্রকে ভূমিশয্যা থেকে উঠিয়ে, ক্রীড়ারসের নির্ভরতার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললেন অনন্তবর্মা।

দিন যায়। লোক-বন্দ্য অর্থশাস্ত্রে রাজার মনখানিকে ফিরিয়ে আনতে বহু চেষ্টা করেন বৃদ্ধ মন্ত্রী। বাক্য দিয়ে রাজা সমর্থন করেন তাঁর প্রস্তাব, কিন্তু মনে মনে বলেন—"মন্ত্রী মহাশয় মানুষের মন বোঝেন না।" অবজ্ঞা করেন।

মন্ত্রীরও মনে শেষে ধীরে ধীরে দেখা দিল···বিবেকের বিচার :—

"এ আমার একরকম মোহই বলতে হবে। তা না হ'লে আর এমন বোকামি আমি করি! রাজার অরুচি হয়েছে আমার উপদেশ। আমি···তাঁর যেন একটি চোখ-ঠারানো হাস্য হয়ে দাঁড়িয়েছি। স্পষ্টই বুঝতে পারছি। এমন তো কই আগে মহারাজ ছিলেন না! আমাকে এখন আর স্নেহের চক্ষে দেখেন না। হেসে কথা বলেন না। গোপন করেন রহস্য। আগে হাত দিয়ে আমার গা ছুঁতেন, এখন··· ছোঁন না। আপদে-বিপদে অনুকম্পা করতেন, এখন···করেন না। উৎসব হ'লে নিমন্ত্রণ আসত, এখন···সে অনুগ্রহটুকুও নেই। দু-একটা ভাল-মন্দ আদরের জিনিস পাঠানো,···সে রেওয়াজ উঠে গেছে। হয়তো অনেক চেষ্টায় একটা ভাল কাজ করলুম·· গণনাতেও এখন আনেন না। বাড়ির খবর, কে কেমন আছে···জিজ্ঞাসাবাদ করেন না। মৎ-পক্ষীয়দের···ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেন না। আসন্ন কর্মে···ভিতরে আমাকে নেন না। অন্তঃপুরেও···সঙ্গে ক'রে আমায় আর নিয়ে যান না।

সবই এখন উল্টো শ্রী! অযোগ্য কাজগুলোতেই আমায় নিয়োগ করছেন। ওঁর গোপন অনুজ্ঞা লাভ ক'রেই···অন্যেরা আক্রমণ করতে সাহস করছে আমার আসন। যারা আমার শত্রু, তাদের উপর দেখাচ্ছেন বিশ্বাসী প্রণয়। প্রশ্নের উত্তর দেন···কদাচিৎ। সমানদোষে যেখানে সকলেই দোষী, অপবাদের অমৃতটুকু অধুনা আমার ভাগেই দেখি, পড়ছে। মর্মে মর্মে আমার উপহাস! আমার মতামতের··· কোনো মূল্য নেই, হাসি-ঘেন্নায় পায়ে ঠেলেন। মহার্ঘ উপহার পাঠালেম, সম্প্রতি মন ভিজল না মহারাজের। আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে···নীতিজ্ঞদের দিইয়ে অপমান করালেন, মূর্খদের দিয়ে। চাণক্য বলেছেন,—'চিত্ত বা জ্ঞানের অনুকূল হ'লে, অনর্থমূলক কাজগুলোও প্রিয় হয়, প্রতিকূল হ'লে সৎকাজও মন্দ হয়।' এখন বুঝছি তাঁর কথাই ঠিক।

কী করি! অনন্তবর্মার বাপ-ঠাকুরদার আমি সামিল; অবিনীত হ'লেও তাঁকে তো আর আমি···পরিত্যাগ করতে পারি না, আমার পক্ষে উচিতও নয়।

এদিকে আমাকে ত্যাগও করবেন না, ওদিকে কথাও কানে নেবেন না! এ ক্ষেত্রে আমি কী উপকার করতে পারি তাঁর?

রাজ্যটি দেখছি গোল্লায় যাবে।···একদিন না একদিন ··অশ্মকরাজ 'বসন্তভানু'র হাতেই গিয়ে উঠবে। হঠাৎ যদি একটা বিপদ ঘটে, তবেই এক···প্রকৃতিস্থ হ'তে পারেন আমাদের অনন্তবর্মা।

অপরাধমূলক একটা-কিছু ঘটিয়ে দিয়ে অনর্থের সৃষ্টি করা··· আমার পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু ফলে·· ঘরের মধ্যে শত্তুর ডেকে আনা হবে। নাঃ, আমার ওতে রুচি নেই।

ঘটুক, অনর্থই ঘটুক, যাঁর কপাল তাঁরই মাথাব্যথা। আমার কর্তব্য,···পিশুন জিহ্বাটিকে এখন নিজের মুখের মধ্যে স্তম্ভিত ক'রে রাখা; এবং চরণ দুটিকে কোনো প্রকারে স্বস্থান-ভ্রষ্ট হতে না দেওয়া।"

মন্ত্রীর যখন এই ধরনের মনোবৃত্তি, এবং রাজার যখন এই রকমের কামপ্রবৃত্তি, তখন অশ্মকরাজার অমাত্য 'ইন্দ্রপালিতে'র পুত্র,— 'চন্দ্রপালিত'—একদা উদয় হলেন বিদর্ভে। কুকর্মের জন্য পিতৃনির্বাসিত হয়েছেন,···এই ছদ্ম-কাহিনী প্রচার ক'রে দিয়ে তিনি প্রথমেই ঠকালেন বিদর্ভকে। তাঁর সঙ্গে এল বহু চারণ, বহু ছদ্ম-কিঙ্কর, বহু গুপ্তচর;···এবং সুনিপুণা একদল শিল্পকারিণী। মন-ভোলানো নানান দান চেলে চন্দ্রপালিত সত্বর আত্মসাৎ ক'রে ফেললেন বিহারভদ্রকে এবং সেই পরিচয়ের সূত্র ধ'রে অচিরেই স্থান লাভ করলেন রাজদরবারে। লব্ধ-রন্ধ্র চন্দ্রপালিত তখন ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লেগে গেলেন—সপ্ত-সংখ্যক বিলাসের প্রকরণটির। বর্ণনার সে কী বাহাদুরি! আওড়ালেন:—

"মহারাজ, শিকার-খেলার চেয়ে···ঔপকারিক···আর কিছু নেই। এই বিলাসটির দোসর নেই বিশ্বে। গুণ ফলটি একবার বিচার ক'রে দেখুন ঃ—

আপনাকে নিঃসন্দেহে বলতেই হবে শিকার একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। আপদ আসুক, নিজেই দেখবেন,···জোরে পা চালিয়ে লম্বা পথ এক লহমায় উল্লঙ্ঘন করবার বিপুল শক্তি···জঙ্ঘায় আপনার জেগেছে ;···পুরোদস্তুর।

এ রকম একটি নয়, দশটি প্রধান গুণ রয়েছে মৃগয়ার।

কফের অপচয় ঘটায় মৃগয়া। ফিরিয়ে আনে আরোগ্যের মূলকারণ ···অগ্নি-দীপ্তিটিকে।

মেদের অপকর্ষ ঘটায় মৃগয়া। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নিয়ে আসে ···স্থিরতা, লঘুতা, আর খরখরে একটা ভাব।

কনকনে ঠাণ্ডা, কাটফাটা রোদ, ঝড়বাদল, ক্ষিধেতেষ্টা···সমস্তই সইয়ে দেয় · শিকার।

অবস্থাভেদে···জন্তুজানোয়ারদের কী রকমের হৃদয়-গত ভাবখানি হয়,···সে বিষয়ে বিপুল জ্ঞানোদয় করিয়ে দেয়···শিকার।

বুনো মোষ, গবয়, হরিণ···রাজ্যের শস্যলোপ করছে। মারতে হবে ক্ষেত্র-দস্যুদের ;···ডাকো শিকারী।

নেকড়ে বেরিয়েছে, বাঘ বেরিয়েছে ! স্থলপথের ঐ নখর উৎপাত-গুলোকে শোধরাতে হবে ;···ডাকো শিকারী···মারুক।

পার্বত্যপ্রদেশে, অরণ্যপ্রদেশে খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে ; পাঠাও শিকারী···খুঁজবে।

জঙ্গল পার হতে, আহা, ভয় পায় গাঁয়ের মানুষ···মাভৈঃ··· পাহারায় বসুক শিকারী।

উৎসাহশক্তিতে সন্ধুক্ষিত করিয়ে, শত্রুর সন্ত্রাস হয়ে দাঁড়ায়··· মৃগয়া। মহারাজ, গুণ অনেক···মৃগয়ার। * * *

জুয়োখেলাকেও অনেকে দোষেন, বলেন বিলাস। কিন্তু কেউ কি কখনও ভেবে দেখেছেন…এর গুণাবলী? অন্ততঃপক্ষে নব-গুণে গুণশালিনী এই দ্যূতক্রীড়া।—

এক মুহূর্তে, মানুষ তৃণবৎ…নির্বিবাদে পরিত্যাগ করে শত শত দ্রব্য। একি কম কাণ্ড! অনুপম এক ঔদার্যের, মহদাশয়ের… পরিচয় পাওয়া যায় এই খেলায়।

জুয়ো খেলুন, দেখবেন…হর্ষ-বিষাদের আপনি অতীত হয়ে গেছেন। কারণ, জয়-পরাজয়ের অবস্থান নেই জুয়োতে।

জুয়ো খেলুন, আপনার মধ্যে বেড়ে উঠবে শত্রুঞ্জয় ক্রোধ।…এই ক্রোধের একমাত্র হেতু হচ্ছেন পৌরুষ।

জুয়ো খেললে মহারাজ, খোল্‌তাই হয় মানবের বুদ্ধি। কারণ তাঁকে তখন চার-চোখে দেখতে হয়…জুয়োড়ীর হাত-সাফাই, পাশা-চালার দুর্লক্ষ্য কুট কৌশল। বুদ্ধি খুলতেই হবে।

জুয়ো খেললে, মানুষের চিত্তে জন্মায়…অত্যন্ত-অর্চনীয় একটি একাগ্রতা। কারণ, তখন একটিমাত্র বিষয়েই…বিভোর হয়ে থাকে তার চিত্ত।

জুয়ো খেলুন, আপনি অসমসাহসিক হয়ে উঠবেন। কারণ সাহসের বন্ধু হচ্ছেন অধ্যবসায়।

জুয়ো খেলুন, দেখবেন,…আপনি অনন্য-ধর্ষণীয় হয়ে উঠেছেন, মান সম্মান আপনার কাছে তুচ্ছ; এবং অকৃপণভাবে…আপনার চলেছে শরীরযাত্রা। কেন জানেন? এ খেলা খেলতে হ'লে,…আপনাকে যে লড়তে হবে,…মিশতে হবে…চলতে হবে…কাঠ-কর্কশ পুরুষদের সঙ্গে। * * *

মহারাজ, মানুষে…কী না বলে? বলে,—রমণীপ্রসঙ্গ একটি পাপের বিলাস। কিন্তু হায়…মানুষ ভুলে যায়, উত্তম অঙ্গনা-ভোগের ভিতর দিয়েই…একমাত্র সফল হয়ে ওঠে ধর্ম এবং অর্থ; পূর্ণ-স্ফীত হয়…পুরুষত্বের অভিমান। নায়ক লাভ করেন…ভাবজ্ঞানের কৌশল।

তাঁর কোনো প্রচেষ্টাকে,···ক্লিষ্ট করে না লোভ। চৌষট্টি কলাবিদ্যার চেয়ে অনেক-অধিক বিদ্যায়···বিচক্ষণ হয়ে ওঠেন নায়ক। পটু হয়ে ওঠে তাঁর বুদ্ধি এবং বাক্য।

যাঁকে পাওয়া যায় না তাঁকে পাওয়া,

যখন পাওয়া গেল, তাঁকে···আতুপুতু-ক'রে রক্ষে-করা,

যাঁকে রক্ষা-করা গেল তাঁকেই আবার ভোগ-বাসনা-করা,

যাঁকে ভোগ করা গেল তাঁরই পিছনে আবার গুপ্তচরের মতন লেগে থাকা,

রুষ্টা প্রেয়সীর···সেধে সেধে···মানভাঙানো,—

ইত্যাদি-ব্যাপারের অজস্র প্রয়োগ-পদ্ধতি রচনা করতে করতে··· পাকতেই হবে মনুষ্য-নায়কের বুদ্ধি আর বুলি।

বরাঙ্গনা ভোগ করুন, দেখবেন,—আপনার পোশাকপরিচ্ছদ বাহারী হয়ে উঠেছে, সমাজ আপনাকে খাতির করছে, বন্ধুরা ভালবাসছে, মহাখুশী হয়ে উঠেছে ভৃত্যবর্গ। কারণ, ভোগই নিয়ে আসে শরীরের উৎকৃষ্ট সংস্কার। তখন দেখবেন, আপনি হেসে হেসে কথা কইছেন, উদ্রিক্ত হয়ে উঠছে আপনার বীর্যবত্তা, বাঁ হাত জানতে পারছে না ডান হাতের দাক্ষিণ্য, এবং অপত্যোৎপাদনের ফলে আপনি লাভ করছেন ইহলোক এবং পরলোকের কল্যাণ। পণ্ডিত-মূর্খেরা বোঝেন না স্ত্রী-সংসর্গের রত্নোজ্জ্বল এই অবদান। * * *

স্ত্রীসংসর্গ, মৃগয়া, জুয়া···যদি আপদ্ ব'লে গণ্য না হয়, তা হ'লে জগৎ-কে মানতেই হবে···"পান"ও দোষের নয়। অসম্ভব গুণপ্রসূ এই মদ্য-পান। বয়সটিকে অটুট রাখতে এমন উপকারী বস্তু আর দুটি নেই। নানান রোগের এটি মহৌষধ।

পান করুন,···হুঙ্কার দিয়ে উঠবে অহঙ্কার··তিরস্কৃত হবে জীবনের প্রভূত দুঃখ।

পান করুন,···অঙ্গে জ্বলবে অনঙ্গের দীপ, দীপ্ত হবে উপভোগের ক্ষমতা, তৃপ্তা হবেন অঙ্গনারা।

পান করুন,···দেখবেন, আপনি মার্জনা ক'রে দিচ্ছেন সহস্র অপরাধ, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার মন থেকে উন্মুলিত হয়ে যাচ্ছে মন্ত্রণার কণ্টক।

পান করুন,·· দেখবেন, অনর্গল প্রলাপ বকলেও আপনার উপর বেড়ে যাচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ; কারণ, শঠ হয় না···মাতাল।

পান করুন,···উপভোগ করবেন একটানা আনন্দ ; কারণ, হিংসুটে হয় না মাতাল।

পান করুন,···আপনার মধ্যে আসবে···শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতি।

পান করুন,···দেখবেন, আপনি আকর্ষণ করছেন হাজারো বন্ধু। কারণ···বেঁটে-তুনেই···মাতাল খুশী ; তুঃখ-সুখের অংশীদার তাঁর প্রাণ।

মহারাজ, মদ্যের কল্যাণে কী না হয়? অনুপম হয় অঙ্গের লাবণ্য ; লোকোত্তর ব'লে মনে হয় সমস্ত বিলাস ; রণক্ষেত্রেও লোপ পেয়ে যায় মৃত্যুভয়, মৃত্যুযন্ত্রণা···আসে রণজয়ের ক্ষিপ্রক্ষুধা। * * *

'বাক্‌পারুষ্য'—'দণ্ডপারুষ্য'—'অর্থদূষণ',···এই তিনটি রয়েছে তথাকথিত মহাপাপ। কিন্তু যদি অবকাশ বুঝে মহারাজ, এগুলিকে কাজে লাগান, তা হ'লেই সহজে উপলব্ধি করবেন এদের উপকারিতা। মহারাজ,···যিনি মনুষ্যপতি,—তাঁর কাজ শত্রুজয়, লোকতন্ত্রের অবলম্বন। মুনি-ঋষির মত নিষ্কাম হয়ে ব'সে থাকাটি ·· কাজ নয় রাজার।"

চন্দ্রপালিত থামলেন। বাহবা দিয়ে উঠলেন সকলে। এ যেন গুরুর উপদেশ। মুগ্ধ হয়ে গেলেন অনন্তবর্মা, সাদরে গ্রহণ করলেন চন্দ্রপালিতের মতবাদ ; অনুবর্তী হলেন মতবাদের। অতএব,—

যে সব প্রজা নিত্য অনুসরণ ক'রে চলতেন রাজ-শীল, দেখতে দেখতে তাঁরাও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। সকলেই ব্যভিচারী,·· সকলেই সমান পাপী,···কাজেই কে আর কার খুঁজে বেড়াচ্ছেন ছিদ্র?

যেমন রাজা তেমনি প্রজা। সুতরাং, তন্ত্রাধ্যক্ষেরা (Departmental Heads) নির্বিবাদে ভুঞ্জন করতে লাগলেন নিজের কর্মফল।

দেখতে দেখতে ভাঙো-ভাঙো হয়ে এল রাজার আয়ের দ্বার। বিটমহাশয়দের সুশিক্ষ্যতায়…দিন দিন হাঁ হয়ে যেতে লাগল ব্যয়ের মুখ।

সকলেরই স্বভাবচরিত্র সমান ; সকলেই রাজার হলায়-গলায়। রাজ্যের সামন্তেরা, রাজধানীর প্রধান প্রধান মুখিয়ারা, স্বকীয় স্ত্রী-রত্নদের সঙ্গে নিয়ে যোগ দিতে আরম্ভ করলেন রাজকীয় পানগোষ্ঠীতে। ভিতরের লোক হয়ে গেলেন তাঁরা। অন্তরঙ্গ হয়ে গেলেন রাজার স্বেচ্ছাচারের। নরেন্দ্রও তাঁদের অত্যুত্তম স্ত্রীরত্নদের নিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে লিপ্ত হয়ে উঠলেন গুপ্তভোগে। রাজ-উপভোগের আদর্শ অনুসরণ ক'রে রাজার অন্তঃপুরিকারাও অবলম্বন করলেন ভিন্নবৃত্তি। ভেঙে গেল তাঁদের ত্রাস। তাঁরা গা ভাসালেন বিলাসের, রতিসুখের স্রোতে।

কুলাঙ্গনারাও ব্যবহার করতে লাগলেন কুলাঙ্গারদের ভাব ভঙ্গি ভাষা ; ধ'সে গেল তাঁদের যন্ত্রণা-নামীয় সতীত্ব। স্বামীগুলো যেন খড়কুটোর সামিল ! আচ্ছা, বল্ তো সই, কে আবার কবে কানে তোলে পতিদেবতাদের কথা ? তাঁরা কেবল মধুমদিরার ভিতর দিয়ে শুনতে লাগলেন…জারদের কাম-জর্জর গুঞ্জন।

এই মূল থেকে গজিয়ে উঠল রেষারেষি…ঝগড়া-ঝাঁটির গাছ। যাঁরা বলশালী তাঁরা পিষে মারতে লাগলেন দুর্বলদের। চোর-ডাকাত বাড়ল, চুরি হতে লাগল ধনীদের ঘরে। চোরের ধন বাট্‌পাড়ে খেলো। খুনখারাপি হতে লাগল। খুলে গেল নরকের পথ।

কারোর বন্ধু খুন হ'ল…কারোর সর্বস্ব রসাতলে গেল,…কেউ শূলে চড়ল,…কেউ পচতে লাগল কারাগারে,…সম্পূর্ণ আতুর হয়ে উঠল প্রজাবৃন্দ, মুক্তকণ্ঠে তারা কাঁদতে লাগল। অযথা প্রণীত হতে লাগল দণ্ড। চৌদিকে ভয়, সর্বত্র ক্রোধ। লোভের অন্ত রইল না শীর্ণ

কুটুম্বদের। যাঁরা তেজ দেখাতে গেলেন, তাঁদের অপমান-লাঞ্ছনার ইয়ত্তা রইল না···মান নিয়ে তাঁরা পুড়তে লাগলেন। অপকর্মের হাট বসল, হেঁটে বেড়াতে লাগল ষড়যন্ত্র-সঙ্কুলবিভীষিকা।

বিদর্ভ রাজ্যের যখন এই রকমের অবস্থা, তখন অবসর বুঝে অশ্মক-রাজ বসন্তভানু বিদর্ভে পাঠালেন অসংখ্য গুপ্তচর।

মৃগ-বাহুল্য হয়েছে, প্রতিরোধ করতে হবে,···এই অজুহাতে গুপ্তচরেরা প্রথমে প্রবেশ করল বিদর্ভের মৃগদাবগুলিতে। পাহাড়ের পাকদণ্ডী দিয়ে মৃগ পালায়,···কাজেই বন্ধ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল নির্গম পথ,···অতএব পথগুলির মুখে মুখে,···শুকনো বাঁশ, পাতা, ঝোপঝাড়ের কূট রচনা ক'রে তারা আগুন ধরাতে লাগল।

শিকার-বিলাসে প্রোৎসাহিত ক'রে তারা ডেকে আনতে লাগল নগরের শিকার-রসিকদের; বাঘের মুখে ফেলিয়ে তাদের··· মারল।

ক্ষুধায় পিপাসায় ছটফট করছেন শিকারীরা; তাঁদের তারা স্বচ্ছ-সলিল কুয়োর লোভ দেখিয়ে, দূরে নিয়ে···মারল।

বড় বড় গর্ত খুঁড়ে লতা-পাতার ফাঁদ বিছিয়ে গর্তের মুখগুলো তারা ঢেকে রাখল; শিকারীরা টুপটাপ ক'রে পড়তে থাকেন গর্তে, আর চিরদিনের মতো অদৃশ্য হয়ে যান!

আহা, পায়ে কাঁটা ফুটেছে? দাঁড়ান, তুলে দিচ্ছি।···এই রকমের বাহানা ক'রে···বিষ-মুখো ক্ষুর বুলিয়ে চরের দল অনেককে করল চিরদিনের মতো নিষ্কণ্টক। যাঁরা দলছাড়া হয়ে একলা পড়েছেন, সে সব শিকার-বীরদের সাবাড় করতে আর কতক্ষণ!

হরিণ পালাচ্ছে, মার বাণ।···কিন্তু সেই বাণেই মরতেন গিয়ে বিদর্ভের নাগরিক!

বাজি ফেলে, তারা শিকারীদের চড়াতে লাগল দুর্গম পাহাড়ের চুড়োয়।···কেউ যখন দেখছে না, তখন···মার ধাক্কা। হায় হায়, অপঘাতে মরলেন অতবড় শিকারী!

বনচর সেজে, তারা রাজসৈন্যের ছোট্ট ছোট্ট দলগুলোকে বনে বনে ঘেরাও করতে লাগল।

নগরে, কারো বাড়িতে সজীব পাশা চলছে, কারো বাড়িতে নির্জীব জুয়ো চলছে, কোথাও বা পাখীর লড়াই হচ্ছে, কোথাও বা যাত্রাদি উৎসব হচ্ছে…জোর ক'রে তারা ঢুকে পড়ত তাঁদের বাড়িতে। তার পরেই রেষারেষি ঘটিয়ে…এক নাগরিককে দিয়ে অন্য নাগরিকের মুণ্ডপাত!

গূঢ় উপায়ে তারা বিদর্ভে নিত্য ঘটাতে লাগল একটা না একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা। তারপরে অপ্রিয় ব্যাপারগুলোকে প্রকাশ ক'রে দিয়ে সাক্ষীসাবুৎ পটিয়ে, জড়িয়ে ফেলত নাগরিকদের। দুষ্কীর্তি-গুপ্তির অছিলায় শেষ পর্যন্ত তাদের উপরেই ফলাত ফপরাক্রম।

পরস্ত্রীদের জার জুটিয়ে দিয়ে, জারটাকে এবং স্বামীটাকে অথবা দুটোকেই গুম্‌খুন ক'রে, পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিত খুনীর অপরাধ।

মায়াবিনী পথচারিণীদের টোপে গেঁথে সহৃদয় নাগরিকদের তারা ভুলিয়ে নিয়ে আসত সঙ্কেতস্থানে। সেখানে প্রথম থেকেই লুকিয়ে থাকত নিজেরা, তার পর পিছন থেকে দৌড়ে এসে…খুন!

লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে, অনেককেই তারা নিয়ে আসত গুপ্তধনের সন্ধানে…সুড়ঙ্গের মধ্যে, অথবা কোনো মন্ত্রসাধন স্থানে। তার পরেই …হায় কপাল, বিঘ্ন ঘটল, তাই,…তাঁরা মারা গেলেন!

বাজি ধরে নাগরিক চেপেছেন মত্তগজে। কী সাংঘাতিক! তাঁর মৃত্যু-রোধের জন্যে এদের ছোটাতেই হ'ল নিজেদের বজ্জাত হাতী! এখন, হাতী বেটা যে ক্ষেপে গিয়ে নগরমুখিয়াদের চাপা দিয়ে দৌড়বে, তার আর এরা কি করতে পারে? অতএব মুখিয়াগণ… মরলেন!

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তারা পাকেপ্রকারে মামলা বাধিয়ে দিত। তারপর একজনকে গুপ্ত হত্যা ক'রে অন্যের ঘাড়ে খুনের দায় চাপিয়ে দেওয়া…সত্যিই এত সহজ ব্যাপার! সামন্তদের মধ্যে, পৌরজনদের

মধ্যে যাঁরা যথেচ্ছাচারী তাঁদের গুপ্তহত্যা ক'রেই তারা ঘোষণা ক'রে দিত তাঁদের শত্রুদের নাম-ধাম।

দিবারাত্তির ব্যভিচারিণী যোগ্যাঙ্গনা জুটিয়ে দিয়ে, তারা নগরের শিথিল-মস্তিষ্কদের মধ্যে এনে দিতে লাগল রাজযক্ষ্মা।

বস্ত্রে, অলঙ্কারে, অঙ্গরাগে, ফুলের মালায়,—কৌশলে বিষরস মাখিয়ে অনেককে পাঠাতে লাগল পরলোকে।

এমন কি···চিকিৎসা-মুখে রোগ বাড়িয়ে দিয়ে, নগরবাসীদের যমালয়ে পাঠাতে দ্বিধা করল না তারা। এই রকমের অভাবনীয় কৌশলের এবং বীভৎস ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে অশ্মকরাজ বসন্তভানুর তীক্ষ্ণ-রসদেরা (poisoners) এবং গুপ্ত-ঘাতকেরা ধীরে ধীরে জর্জরিত ক'রে ফেলল অনন্তবর্মার কটক, শীর্ণ ক'রে আনল বিদর্ভের বীরবরদের সংখ্যা।

বসন্তভানু যখন দেখলেন, বিদর্ভে উদ্ভাবিত হয়েছে বিপুল বিশৃঙ্খলা, তখন তিনি···"বনবাসী"-রাজ ভানুবর্মাকে বিদ্রোহ-ঘোষণা করতে প্রোৎসাহিত করলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন অনন্তবর্মা। রাষ্ট্র-সীমান্তে হানা দিয়েছে শত্রু, তাঁকে লড়তেই হবে, অতএব অনন্তবর্মা আদেশ দিলেন—"বলসমুত্থান হোক।" সামন্তচক্রের মধ্যে অশ্মকেন্দ্র বসন্তভানুই তখন সর্বাগ্রে উপস্থিত হয়ে গেলেন অনন্তবর্মার সহায়তায় এবং প্রিয়তর হয়ে উঠলেন তাঁর। অন্য সামন্তরাও এলেন, মিলিত হলেন তাঁর সঙ্গে। শত্রুর বিরুদ্ধে ছুটে গেলেন বসন্তভানু এবং নর্মদা-নদীর তীরে·· স্থাপনা করলেন শিবির।

ইত্যবসরে ··এক বিলাসভরা রজনীতে···অনন্তবর্মা একটি নাচ দেখলেন। যাঁর নৃত্য দেখলেন তিনি কুন্তল-দেশের মহাসামন্ত "অবন্তিপতি"র···আত্মনাটকীয়া ; অর্থাৎ খাস-নর্তকী। চন্দ্রপালিতকে দিয়েই তাঁকে ডাকিয়ে আনিয়েছিলেন অনন্তবর্মা। অপূর্ব, অনিন্দ্য তাঁর

নৃত্য-কৌশল !···যেন পৃথিবীর তিনি উর্বশী। নাচ দেখে প্রেমে বহ্নিমান হয়ে গেলেন রাজা,·· অঙ্কশায়িনী করলেন মধু-পান-মত্তা নর্তকীকে।

বসন্তভানু তখন অবন্তিপতিকে একান্তে আহ্বান ক'রে জানিয়ে দিলেন সংবাদ। বললেন,—

"রাজাটি তো প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন। আমাদের বউ-ঝি···ছুঁচ্ছেন। কতদিন আর এই অবজ্ঞা···সহ্য করা যায়? আমার কাছে এক শো হাতী, আপনার আছে পাঁচ শো। আসুন, আমরা দুজনে মিলে ···এইবার জপিয়ে দলে ভেড়াই···মুরলেশ "বীরসেন"কে, ঋষীকেশ্বর "একবীর"কে, কোঙ্কণপতি "কুমারগুপ্ত"কে এবং নাসিক্যনাথ "নাগপাল"কে। নিশ্চিত তাঁদেরও অসহ্য হয়ে উঠেছে রাজার অবিনয়। আমাদের প্রস্তাব নিশ্চয় তাঁরা সমর্থন করবেন। বনবাসী-রাজ ভানুবর্মা আমার পরম মিত্র। ভানুবর্মা যখন সম্মুখ থেকে আঘাত করবেন ঐ দুর্বিনীত অনন্তবর্মাকে, আমরাও তখন একত্রে আঘাত করব তাঁকে···পৃষ্ঠদেশে। কোশবাহন বিভাগ ক'রে নেব।"

সন্ধিস্থাপনা হয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

হৃষ্টচিত্তে অশ্মকরাজ তখন সামন্তদের নিকটে উপঢৌকন পাঠালেন বিংশতি-থাল বরাংশুক, এবং পঞ্চবিংশতি-থাল কাঞ্চন-কুঙ্কুম-কম্বল। সঙ্গে পাঠালেন আপ্তজন। তাঁরা গুপ্ত-বাণী ব'য়ে নিয়ে গেলেন। শুভমন্ত্রণার শেষে সকলেই অনুমোদন করলেন বসন্তভানুর প্রস্তাব।

পরের দিন যখন জ্ব'লে উঠল যুদ্ধের আগুন, তখন সামন্তদের এবং বনবাসী-রাজের মিলিত বাহিনীর আঘাতে আমিষ হয়ে গেলেন দণ্ডনীতি-দ্বেষী অনন্তবর্মা।

অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে বসন্তভানু কিন্তু অনন্তবর্মার অবশীর্ণ কোশবাহন স্বাধিকারে এনে ফেললেন এবং সামন্তদের বললেন—

"যথাবল, যথাপ্রয়াস,···আপনারা বিভাগ ক'রে গ্রহণ করুন

কোশবাহন। আপনাদের অনুজ্ঞায়, যে কোনো একটি অংশ পেলেই আমি তুষ্ট হব।"

শঠতার আশ্রয় নিয়ে···সামন্তদের সঙ্গে প্রিয় ব্যবহার করতে লাগলেন বসন্তভানু; এবং ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েই তাঁদের মধ্যে বাধিয়ে দিলেন উগ্র কলহ। একে একে সামন্তদের সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে স্বয়ং গ্রাস ক'রে ফেললেন তাঁদের সর্বস্ব। এবং বনবাসী-রাজকে যৎকিঞ্চিৎ একটি অংশ-দানের অনুগ্রহ দেখিয়ে, আত্মসাৎ ক'রে বসলেন অনন্তবর্মার সমস্ত রাজ্য।

বৃদ্ধমন্ত্রী বসুরক্ষিত, কিন্তু ইত্যবসরে দু-চারজন মৌল-মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সরিয়ে ফেলেছিলেন এই বালক-রাজপুত্র "ভাস্করবর্মা"কে, এঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ত্রয়োদশবর্ষীয়া "মঞ্জুবাদিনী"কে, এবং এঁদের মাতা মহাদেবী "বসুন্ধরা"কে। কিন্তু এমন কপাল, ভাবনা-চিন্তায় বৃদ্ধের এল দাহজ্বর। তিনি দেহরক্ষা করলেন। আমাদের মিত্রবর্গ তখন অনন্তবর্মার বৈমাত্রেয় ভাই "মিত্রবর্মা"র কাছে,···স-পুত্রকন্যা মহাদেবীকে নিয়ে গেলেন মাহিষ্মতী-নগরীতে। মিত্রবর্মা দর্শন করলেন মহাদেবীকে,··· এবং স্থান দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনার্য মিত্রবর্মা আর্যা মহাদেবীর প্রতি অন্যথা-ব্যবহার করতে চাইলেন। ভর্ৎসনায় আহত হয়ে মিত্রবর্মার মস্তিষ্কে ঘনাল কুটিল চিন্তা,—

"ইনি দেখছি অখণ্ডচরিত্রা···আর, এঁর ছেলেটিও দেখছি রাজা হবার উপযুক্ত। তা হ'লে···ছেলেটিরই মঙ্গল এখন উনি চান। চাওয়াচ্ছি।"

অতএব দয়ামায়া ভুলে স্থির করলেন – বালকটিকেই খুন করবেন। কিন্তু মহাদেবী জানতে পেরে গেলেন চক্রান্তটি। আমাকে ডেকে আদেশ দিলেন—

"নালীজঙ্ঘ, কুমারকে নিয়ে এমন কোথাও পালাও, যেখানে পৌঁছতে পারবে না খুনীর হাত। যে ক'রে হোক, একে বাঁচাও। যদি বাঁচি, অনুসরণ করব। নিরাপদ হয়ে কুশল জানিও।"

রাজকুল থেকে বহু ক্লেশে রাজবালকটিকে উদ্ধার ক'রে আমি উধাও হই, প্রবেশ করি বিন্ধ্য-বনে। বেচারী রাজার ছেলে, তায় বাচ্চা, পায়ে হাঁটতে কষ্ট পায়, জিরিয়ে জিরিয়ে চলেছি। গয়লা-পাড়াতেও দু-চার দিন আমাদের কাটাতে হয়েছে। সেখানেও ভয়, কখন না জানি রাজপুরুষেরা চড়াও হন। পালাই। আজ আমরা পায়ে হেঁটেছি অনেক পথ। এইখানে পোঁছে, দারুণ পিপাসায় আর্ত হয়ে···কুয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে, পা পিছলে প'ড়ে গিয়েছিলুম। তারপরেই অকস্মাৎ এল আপনার অনুগ্রহ। অসহায় এই রাজপুত্রটির আপনিই এখন শরণ।"

এই ব'লে নালীজঙ্ঘ হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালেন।

প্রশ্ন করলুম—"আচ্ছা, এঁর মা কোন্ জাতির মেয়ে?"

নালীজঙ্ঘ বললেন—

"পাটলিপুত্রের বণিক 'বৈশ্রবণে'র মেয়ে 'সাগরদত্তা'র সঙ্গে বিবাহ হয় কোশলরাজ 'কুসুমধনু'র। তাঁদের কন্যাই এই রাজপুত্রের মা।"

বৃদ্ধকে আমি তখন সস্নেহে আলিঙ্গন ক'রে বললুম—

"তাই যদি হয়, তা হ'লে···এঁর মা আর আমার বাবা...তাঁদের একই মাতামহ।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—

"সিন্ধুদত্তার ছেলেদের মধ্যে কোন্‌টি আপনার পিতা?"

আমি বললুম—

"সুশ্রুত।"

পুলকিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। কী তাঁর আনন্দ! আনন্দের আতিশয্যে আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলুম—

"দণ্ডনীতির অহঙ্কার নিয়ে যখন অনর্থ ঘটিয়েছেন অশ্মকরাজ, আমিও তখন ঐ দণ্ডনীতিই প্রয়োগ ক'রে উন্মুলিত করব শঠটাকে এবং এই বালকটিকেই প্রতিষ্ঠাপিত করব পৈতৃক রাজ্যে।"

এর পরেই আমাদের গ্রাস করল চিন্তা,—

"জল ছিল, পিপাসা মিটিয়েছি ; এখন কেমন ক'রে মেটাই আমাদের দুর্জয় ক্ষুধা ?"

চিন্তার মধ্যপথেই দেখি,···দু-দুটো হরিণ !···ব্যাধের তিন-তিনটি বাণকে অতিক্রম ক'রে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে চ'লে গেল। ধাওয়া করে এল ব্যাধ। ব্যাধের হাত থেকে শেষ দুটো বাণ আর ধনুক ছিনিয়ে নিয়ে, অব্যর্থসন্ধানে ঘায়েল করলুম দুটো হরিণকেই। একটি বাণ পুঙ্খপর্যন্ত প্রবেশ করল, অন্যটি নিষ্পুঙ্খ হয়ে দেহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে গেল। একটি হরিণ···ব্যাধকে দিয়ে দিলুম। অন্যটির খাল-লোম ছাড়িয়ে,···ক্লোম, গুলি, গাঁট ইত্যাদি ভাল ক'রে কেটে বার ক'রে সাফ ক'রে ফেললুম। টাঙ, গর্দানা, দাবনা থেকে যথারীতি খামি খামি মাংস কেটে শূলে বিঁধলুম। কাঠ এনে···আগুন জ্বালিয়ে ···পুড়িয়ে নিলুম শূল্য মাংস। তারপরে প্রাণভরে আশ মিটিয়ে ভুলে ফেললুম আমাদের দুর্দান্ত ক্ষিদে। রন্ধনকর্মে আমার সৌষ্ঠব দেখে আহ্লাদে অবাক হয়ে গেল ব্যাধ। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—

"ওহে, মাহিষ্মতীর খবর কিছু রাখো ?"

ব্যাধ বললে—

"রাখি না আবার ? এই তো মশাইরা, সেখান থেকেই আমি আসছি। আজই তো সেখানে বিক্রি ক'রে এসেছি খানকয়েক বাঘছাল, আর গোটাকতক চামড়ার মশক। চণ্ডবর্মার ছোট ভাই,··· ঐ যাঁর নাম প্রচণ্ডবর্মা,···তিনি নাকি আসছেন অনন্তবর্মার মেয়ে মঞ্জুবাদিনীকে বিয়ে করতে। নগরে খুব ধুমধাম।"

বৃদ্ধ নালীজঙ্ঘের কানে কানে বললুম—

"মিত্রবর্মা দেখছি···বড় ধূর্ত। মঞ্জুবাদিনীর উপর···তাঁর এসেছে বিশেষ প্রতিপত্তি। মেয়েটির বিবাহ দিয়ে···তিনি বিশ্বাসের পত্তন করতে চান মায়ের হৃদয়ে, এবং মেয়েটিকেই মুখপাত ক'রে তিনি

ফিরিয়ে আনতে চান ছেলেটিকে। অবশ্য বালকটিকে খুন করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। আপনি এখন এক কাজ করুন। মহাদেবীর কাছে যত শীঘ্র পারেন,…ফিরে যান। কুশল জানিয়ে গোপনে আমার এবং রাজপুত্রের কথা মাকে জানাবেন এবং তার পরে প্রকাশ্যে রটিয়ে দেবেন—'রাজপুত্রকে বাঘে খেয়েছে।' দুর্মতি মিত্রবর্মা নিশ্চয় মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠবেন, কিন্তু বাইরে তিনি প্রকাশ করবেন… দুঃখের কাতর রূপ, মহাদেবীকে সান্ত্বনা দিতে যাবেন।…এ সুযোগ তিনি কখনই ছাড়তে পারেন না। দেবীকে দিয়ে আপনি তখন তাঁকে বলাবেন,—

'আপনার কথা শুনি নি, উপেক্ষা করেছিলুম ; আমার পাপেই নিশ্চয় আমার কুমার মরেছে। এখন থেকে আমি আপনার আদেশচারিণী হয়েই রইব।'…মিত্রবর্মা হাতে পাবেন স্বর্গ। দেবীর হাতে আপনি তখন এই মহাবিষ 'বৎসনাভ'…তুলে দেবেন। মহাবিষটি জলে মিশিয়ে, তিনি যেন সেই জলেই ডুবিয়ে নেন একগাছি ফুলের মালা। বিষাক্ত মাল্য দিয়ে দেবীকে আঘাত করতে হবে মিত্রবর্মার বুক এবং মুখ, এবং বলতে হবে—

'আমি যদি সত্যিই পতিব্রতা হই, তা হ'লে তোর মত পাপীর মুখে এই মাল্যপ্রহার যেন অসি-প্রহার হয়।'

এতে যেন ভুল না হয়। আর দেখবেন—মাল্যপ্রহারের ঠিক পরেই দেবী যেন মাল্যখানি পরিষ্কার জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নেন, এবং মালাটিকে সঁপে দেন মঞ্জুবাদিনীর হাতে। মিত্রবর্মা মরবেন। দেবী যেন নির্বিকার হয়ে থাকেন। প্রজারা তাঁর সতীত্বের প্রশংসা করবে। কেউ বিশ্বাস করতেই পারবে না…মাল্যাঘাতে মিত্রবর্মা মরেছেন!

আপনি তখন প্রচণ্ডবর্মাকে সংবাদ দেবেন। তাঁকে বোঝাবেন—

'অনায়ক হয়ে পড়েছে রাজ্য। রাজ্যের সঙ্গে মঞ্জুবাদিনীও আপনার গ্রহণীয়া।'

আমরা দু' ভাই কিন্তু ততদিন কাপালিকের ছদ্মবেশে পুরার বাহরে

শ্মশানের নিকটেই বাস করব, দেবী আমাদের ভিক্ষা দিয়ে যাবেন প্রতিদিন। কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে দেবী যেন আর্যপ্রায় পৌরবৃদ্ধদের, আপ্তজনদের এবং মন্ত্রিবৃদ্ধদের আহ্বান করে নিভৃতে বলেন —

"পূজায় প্রসন্না হয়ে দেবী বিন্ধ্যবাসিনী আজ আমাকে স্বপ্নাদেশ করেছেন—

> 'আজ থেকে চতুর্থ দিনে প্রচণ্ডবর্মার মৃত্যুযোগ। পঞ্চম দিনে রেবানদীর তীরবর্তী আমার মন্দিরে, পূজারীগণ পরীক্ষান্তে নির্জন মন্দির পরিত্যাগ করলে,···কপাট খুলে যাবে। তোমার পুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে উদ্‌ঘাটিত দ্বারপথে নির্গত হবেন একটি দ্বিজকুমার। তিনিই অনুপালন করবেন রাজ্য এবং তোমার পুত্রকে প্রতিষ্ঠাপিত করবেন রাজ-পদে। ব্যাঘ্রীর রূপ ধরে আমি তোমার পুত্রকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে, সম্প্রতি স্থাপন করেছি গূঢ়প্রদেশে। তোমার কন্যা মঞ্জুবাদিনী দ্বিজকুমারের পত্নী হবে। এই আমার কল্পনা।'

এখন আশা করি, আপনারা এই অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি গোপনে রাখবেন···যতক্ষণ না···ঘটনা কিছু ঘটে।"

অতি প্রীত হয়ে নালীজঙ্ঘ তখন প্রস্থান করলেন মাহিষ্মতী-নগরীতে। যেমনটি আমরা ভেবেছিলুম, ঠিক তেমনটিই দ্রুত ঘটল। মিত্রবর্মা মরলেন। সহস্র মুখে ছড়িয়ে পড়ল মাল্যবৃত্তান্ত—

"অহো, সতীত্বের কী অমোঘ মাহাত্ম্য! মাল্যপ্রহার তো নয়, এ যে একেবারে সত্যি সত্যি অসিপ্রহার! ছিটেফোঁটাও নেই কুট-কচলামি। তাই যদি হবে, তা হ'লে মেয়েটাও তো মরত! তিনিও তো সেই মাল্যটি দিয়েই মণ্ডিত করেছিলেন নিজের স্তন! পতিব্রতার শাসন যে পাষণ্ড না মানে, তাকে, হতেই হবে বাবা,···ছাই।"

তার পরে রাজপুত্র এবং আমি কাপালিক-বেশে প্রবেশ করলুম মাহিষ্মতীতে। ভিক্ষা করছি; আমাদের দেখতে পেলেন মহাদেবী। আনন্দে বুঝি উথলে পড়ে তাঁর বুকের দুধ! উঠে এলেন, বললেন—

"ভগবন্, গ্রহণ করুন আমার কৃতাঞ্জলি নমস্কার। অনুগ্রহ করুন অনাথাকে। আমি···স্বপ্নাদেশ পেয়েছি। আমাকে বলুন···সে স্বপ্ন··· সত্যি, না, মিথ্যে?"

বললুম—

"স্বপ্নফল অদ্যই দৃষ্ট হবে।"

তিনি বললেন—

"দাসীর সৌভাগ্য—যদি তাই হয়! সেই স্বপ্নে···গাঁথা হয়ে আছে আমার এই মেয়েটির বিবাহের আকাশকুসুম।"

কন্যাটির দিকে চেয়ে দেখলুম। মঞ্জুবাদিনীর গাল···হঠাৎ লজ্জায় কেমন যেন রাঙা হয়ে উঠল। তাঁকে দিয়ে আমাকে প্রণাম করালেন দেবী। তারপরে আনন্দটিকে ঢাকতে পুনর্বার বললেন—

"যদি মিথ্যা হয়, তা হ'লে আপনার এই শিশু-কাপালিকটিকে কাল কিন্তু আমি···আটক করব।"

এদিকে, আমার তখন এক অধীর অবস্থা। মঞ্জুবাদিনীর অনুরাগ-বিলীন ডাগর চোখের চাহনি আমার ধৈর্যের তখন ক্ষিপ্র-লেহন করছে রস; আর আমি···অন্তঃসারশূন্য হয়ে আসছি। দেরি না ক'রেই বললুম—

"তথাস্তু।"

এবং সত্বর ভিক্ষাগ্রহণ ক'রে, নালীজঙ্ঘকে ইঙ্গিতে আহ্বান জানিয়ে প্রস্থান করলুম। ধীরপদক্ষেপে নালীজঙ্ঘ পিছনে পিছনে আসতে লাগলেন। প্রশ্ন করলুম—

"সেই প্রসিদ্ধ অল্পায়ুঃটি—সেই প্রচণ্ডবর্মাটি—এখন কোথায়?"

তিনি বললেন—

"রাজ্য এখন আমার,—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তিনি এখন রাজকীয় আনন্দে নিঃশঙ্কে বিশ্রাম করছেন···আস্থানমণ্ডপে। তাঁকে উপাসনা করছে কুশীলবের দল!"

"বলেন কি? তা হ'লে এই উদ্যানেই আপনাকে কিছুক্ষণ এখন অপেক্ষা করতে হয়···আমি আসছি।"

এই ব'লে রাজপুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে···প্রস্থান করলুম। উদ্যানের পাঁচিলের পাশেই···বিজন একটি দেউল। ধড়াচূড়ো ছেড়ে সেখানে রাজপুত্রটিকে পাহারায় বসিয়ে রাখলুম। তার পরে কুশীলবের নাটকীয় সাজসজ্জা সংগ্রহ ক'রে, পরিপাটীভাবে ভোল বদলিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলুম প্রচণ্ডবর্মার আস্থানমণ্ডপে। নতুন রাজা,·· মন গলাতে বিশেষ কষ্ট পেতে হ'ল না।

দেখতে দেখতে গড়িয়ে এল বেলা, রক্তের মত লাল হয়ে উঠল রৌদ্রের রঙ। জনসমাজের জ্ঞানোপযোগী আমি তখন আরম্ভ ক'রে দিলুম নৃত্য। স্তম্ভিত হয়ে সকলে দেখতে লাগলেন নৃত্য, শুনতে লাগলেন গীত। পশুপক্ষীর ডাকের অনুকরণ ক'রে কত যে ডাক ডাকলুম, তার ঠিকানা নেই। আর সে কি যে-সে নাচ!

আকাশে পা, মাটিতে দুটো হাত···চক্রাকারে নাচলুম 'হস্তচংক্রমণ'; হাত দিয়ে মাটি ছুঁয়ে, পা দিয়ে আকাশ চিরে, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে দেখালুম 'ঊর্ধ্বপাদ'-করণ;

তার পরে এক পা তুলে, এবং অন্যটিকে কুঞ্চিত ক'রে···তির্যক-গতিতে নেচে দেখালুম 'অলাতপাদ'-করণ;

দক্ষিণ চরণখানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পঞ্চতালে দিতে লাগলুম··· 'আপীড়'-স্থানক;

স্বস্তিক-হস্ত দুটিকে হঠাৎ দ্রুতগামী হংসপক্ষের মত বি-প্রকীর্ণ ক'রে···নেচে দিলুম 'বৃশ্চিক-লঙ্ঘন', 'মকরলঙ্ঘন'-করণ;

মাছের মত উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে এঁকেবেঁকে নৃত্যে প্রকাশ করলুম ···'মৎস্যোদ্বর্তন'-করণ।

তার পরে আসন্নবর্তী পরিষদের গায়ে গা মিলিয়ে নাচতে নাচতে একের পর এক খুলে নিলুম তাঁদের ক্ষুরিকা। তার পরে দেখালুম, আরও দুটি নাচ। অতি বিচিত্র এবং অতি দুষ্কর। 'শ্যেনপাত'-করণটিতে···আকাশচারী নৃত্যের প্রযোজনার মধ্য দিয়ে আমি দেখালুম···অকস্মাৎ আকাশ থেকে বাজপাখীর কেমন ক'রে হয় অভিপাত; এবং শেষে সামুদ্রিক ঈগল-পাখীর প্রখর-পতনের মত 'উৎক্রোশ-পাত'-করণটি দেখাতে দেখাতে, হঠাৎ বিশ-ধনুক দূর থেকে প্রচণ্ডবর্মার বুকের পাটায়···ছুঁড়ে মারলুম···ক্ষুরিকা। সঙ্গে সঙ্গে ···চীৎকার দিয়ে উঠলুম—

"বেঁচে থাক···হাজার বছর···বসন্তভানু।"

পলকের মধ্যে...গুপ্ত-সান্ত্রীর আঙুলে লাফিয়ে উঠল তলোয়ার। কিন্তু দুরাশা। আমিই তার পীবর স্কন্ধে ছুঁড়ে মারলুম ছোরা। বেচারী জ্ঞান হারিয়ে পড়তে না পড়তেই, বিহ্বল জনতার চোখগুলোকে কপালে চড়িয়ে দিয়ে, এক লাফে পার হয়ে গেলুম দু-মানুষ-প্রমাণ প্রাকার। নামলুম এসে উপবনে। নালীজঙ্ঘকে বললুম—

"এখনি ফেউগুলো পথ চিনে আসবে। মিলিয়ে দিন পায়ের দাগ।"

ব'লেই হাওয়া হয়ে গেলুম তমালগাছের বীথির মধ্য দিয়ে। পিছন ফিরে দেখি, নালীজঙ্ঘ···বালির উপর পরিস্ফুট আমার পদচিহ্ন-গুলিকে সমান ক'রে মিলিয়ে দিচ্ছেন। যাক, পাঁচিলের গা ঘেঁষে ছুট দিলুম পূবদিকে। হঠাৎ ডান দিকে ফিরতেই দেখি,···আরও একটি পাঁচিল। ইঁট খ'সে যাওয়াতে সিঁড়ির ধাপের মত হয়ে গিয়েছিল সেটি। পা গুটিয়ে···এক লাফ,···পাঁচিল পরিখা···পার। বিজন দেউলে এসে পৌঁছলুম। কুশীলবের সাজপোশাক ছেড়ে মুহূর্তে হয়ে গেলুম কাপালিক।

রাজদ্বারে ততক্ষণে তুমুল হয়ে উঠেছে কোলাহল। রাজপুত্রকে

সঙ্গে নিয়ে, অতি কষ্টে···পথ কাটতে কাটতে···শ্মশানের কাছে এসে পৌঁছলুম। শ্মশানের কাছেই দুর্গামন্দির ; প্রতিমা রয়েছেন মন্দিরে। আগে থেকেই প্রতিমার বেদীর তলা পর্যন্ত আমি খুঁড়ে রেখেছিলুম··· এক সুড়ঙ্গ। কাণা-ভাঙা প্রকাণ্ড একটা পাথর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম সুড়ঙ্গের মুখ। রাজবাড়ির এক ক্লীব কঞ্চুককে দিয়ে আগে থাকতেই আনিয়ে রেখেছিলুম মহার্ঘ রত্নভূষণ, পাগড়ি, পোশাক। মাঝ রাত যখন গ'লে গেল,···দুজনে তখন প্রবেশ করলুম সুড়ঙ্গে। চুপ দিয়ে ব'সে রইলুম।

আগের দিনই কিন্তু, মহাদেবী যথোচিত অগ্নিসংস্কার করিয়ে ফেলেছিলেন মালব প্রচণ্ডবর্মার ; এবং চণ্ডবর্মার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন,—

"এই হত্যাকাণ্ড···অশ্মকরাজ বসন্তভানুর কীর্তি।"

পরের দিন সকাল হতেই, মহাদেবী···রেবাতীরের দুর্গামন্দিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন পূর্ব-সঙ্কেতিত পৌরামাত্য এবং সামন্ত-বৃন্দেরা। ভগবতীর পূজা সাঙ্গ ক'রে সর্বসমক্ষে তিনি পরীক্ষা করালেন মন্দির। দেবীগৃহ জনশূন্য করিয়ে রুদ্ধ করিয়ে দিলেন দ্বার। তারপরে মন্দিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আদেশ দিলেন—

"দামামা বাজাও।"

সুড়ঙ্গের শীর্ণ রন্ধ্রপথে আমার কানে ভেসে এল···নাদসংজ্ঞা। মাথায় চাড়া দিয়ে আমি তখনি উৎক্ষিপ্ত করলুম প্রতিমা-সহ লৌহ-পাদপীঠ। সেটি এত ভারী যে, একজন মাংসল পুরুষের পক্ষে ওঠানো কঠিন। দু' হাত দিয়ে সেটিকে তুলে ধ'রে এক পাশে সরিয়ে রাখলুম। বেরিয়ে এলুম। কুমারকেও উঠিয়ে নিলুম। তার পর দুর্গাপ্রতিমাটি স্বস্থানে স্থাপিত ক'রে উদ্ঘাটিত করলুম মন্দির-দ্বার।

আমাদের দর্শন করল জনতা। চোখ ঠেলে তাদের বেরিয়ে এল বিশ্বাস, চামড়া ফুঁড়ে যেন ফুটে উঠল রোমাঞ্চ, রূঢ়বিস্ময়ে আপনা

হতেই অঞ্জলি বাঁধল···হাজার হাত। যেন এক দৈবত বিস্ময়কে প্রত্যক্ষদর্শন ক'রে স্বয়ং রাজ্য নিবেদন করলেন নমস্কার। গম্ভীর কণ্ঠে আমি বললুম—

"দেবী বিন্ধ্যবাসিনী আমার মুখ দিয়ে এই আদেশ দিচ্ছেন আপনাদের ঃ—

'ব্যাঘ্রীরূপ ধারণ ক'রে যে রাজপুত্রটিকে আমি কৃপা-বশে তিরস্কৃত করেছিলাম, এই সেই রাজপুত্র। অদ্য, তোমাদের হাতে একে আমি দিলাম। এর মাতৃপক্ষ দুর্বল নন, যেহেতু এ মৎপুত্র।'

ভদ্রমণ্ডলী, দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর আদেশ শিরোধার্য ক'রে আজ থেকে, আশা করি, রাজপুত্রকে আপনারা গ্রহণ করবেন। দুর্ঘটনার ঘনঘটা, শাঠ্য, ও নির্মম অশ্মকরাজের ঘন-ঘট্টন থেকে, কুমারকে আমি রক্ষা করেছি। রক্ষার পুরস্কার-স্বরূপ কুমারের সু-ভ্রূ ভগিনীকে আমায় সম্প্রদান করেছেন দেবী বিন্ধ্যবাসিনী।"

দিব্যাদেশ শুনে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলেন সকলে। প্রীত প্রজাদের সে কী অনাবিল উচ্ছ্বাস!—বললেন,—

"ভাগ্যবান্ বটে ভোজবংশ, যেখানে আজ শোভমান...আর্যাদত্ত নাথ। আহা, মা দিয়েছেন।"

আর আমার শাশুড়ীমাতা! তাঁর হর্ষ তখন স্পর্শ করেছে বাক্যের অগোচরত্ব। সেই দিনই তিনি যথাবিধি আমার হাতে সম্প্রদান করলেন মঞ্জুবাদিনীর পাণিপল্লব; এবং সেই রাত্রেই আমি সন্তর্পণে ভরাট ক'রে ফেললুম সুড়ঙ্গটিকে। সন্দেহের ছিদ্র রাখলুম না কোথাও।

কিন্তু মানুষের মন ভরানো···মহাদায়। আমি যে দেবতার অংশ-বিশেষ, তার পরীক্ষা দিতে হ'ল আমাকে। আমাকে দেখাতে হ'ল; —নষ্ট জিনিস কোথায় আছে···আমি ব'লে দিতে পারি;—মুষ্টির মধ্যে কী রয়েছে,···আমি ব'লে দিতে পারি;—আপনি কী চিন্তা

করছেন,....আমি ব'লে দিতে পারি। নগরবাসীরা তখন সমর্থন করল আমার দিব্যাংশতা। দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর আজ্ঞা অমান্য করতে সাহসী হ'ল না কেউ। রাজপুত্রও যে আর্যাপুত্র—দেবী-মাহাত্ম্যে এ প্রসিদ্ধিও ছড়িয়ে পড়ল। শুভদিন দেখে পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে, সমাধা করালুম রাজকুমারের চূড়াকরণ, উপনয়ন। নিজ-হস্তে তুলে নিলুম রাজ্যশাসনের মহান্ ভার।

রাজকার্যের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে আমাকে পেয়ে বসল—রাজ্যের চিন্তা। ভাবতে লাগলুম—

"ত্রিশক্তির আয়ত্তাধীন হচ্ছে রাজ্য। মন্ত্রশক্তি, প্রভাবশক্তি ও উৎসাহশক্তি। এই শক্তি পরস্পর পরস্পরকে অনুগ্রহ দেখায় বটে, কিন্তু কাজের বেলায়...এ ওকে অতিক্রম করতে চায়। বাধা ঘটে। সর্বার্থসাধনের,...বিনিশ্চয়তা ঘটায় মন্ত্রশক্তি, প্রারম্ভ ঘটায় প্রভাবশক্তি, এবং সম্পূর্ণতা আনে উৎসাহশক্তি। অতএব দণ্ডনীতি-স্বরূপ এই বনস্পতিটি,—

যার মূল—পঞ্চাঙ্গমন্ত্র (১);
যার দুটি স্কন্ধ—দ্বিরূপতা ও প্রভাব (২);
যার চতুঃশাখা—চতুর্গুণ উৎসাহ (৩);
পত্র—বাহাত্তর রকমের প্রজা (৪);
কিসলয়—ছুটি গুণ (৫);
পুষ্প—শক্তি;
এবং ফল—সিদ্ধি;—
উপকার করে নেতার।

(১) পঞ্চাঙ্গ-মন্ত্র = সহায়, সাধনোপায়, দেশবিভাগ, বিপত্তি-প্রতিকার-সিদ্ধি
(২) দ্বিরূপতা = সমৃদ্ধ অর্থ নৈতিক রূপ, সমৃদ্ধ মানবতার রূপ।
(৩) দেহ, মন, ভাষা এবং কর্মের উৎসাহ।
(৪) মধ্যম, বিজিগীষু, উদাসীন, শত্রু ইত্যাদি। (কৌটিল্য– VI, 2-97)
(৫) সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়। (কামন্দক– XII, 25)

নীতিশাস্ত্রেরও আবার বহু অধিকরণ। যিনি সহায়হীন, তাঁর পক্ষে ঐ নীতিশাস্ত্রটিকে নিয়ে টিঁকে-থাকাই এক দুরূহ ব্যাপার।···এখন কী করা যায়? অবস্থা তো এই। নাম শুনেছি বটে···মিত্রবর্মার মন্ত্রী 'আর্যকেতু'র। কোশলের তিনি অভিজন, অতএব আমাদের রাজকুমারের তিনি মাতৃপক্ষ। গুণবান মন্ত্রী। তাঁদের মত মন্ত্রীর সৎ-পরামর্শ অবজ্ঞা করার ফলেই ধ্বংস হতে হয়েছে মিত্রবর্মাকে। আর্য-কেতুকে যদি পাই, তা হ'লেই এখন মঙ্গল।"

নালীজঙ্ঘকে নিভৃতে আহ্বান ক'রে শিক্ষা দিলুম···

"দেখুন, আর্যকেতুর নিকটে আপনাকে উপস্থিত হয়ে গোপনে কতকগুলি প্রশ্ন করতে হবে তাঁকে। যেমন—'এই মায়াপুরুষটি কে, ···যিনি এখানকার রাজ্যলক্ষ্মীকে ব'সে ব'সে উপভোগ করছেন?··· রাজকুমার নেহাতই বালক···একটা ভূজঙ্গ তাঁকে জড়াল?···যদি বিষ ঢালে, গ্রাস করে?'···ইত্যাদি।

তিনি কী বলেন সেটি আমার জানা···প্রয়োজন।"

কিছুদিন পরে ফিরে এলেন নালীজঙ্ঘ, বললেন—

"অনেক উপাসনা ক'রে, অনেক ভেট পাঠিয়ে, অনেক উদ্ভট কথার সৃষ্টি ক'রে, হাত পা টিপে, তবে সেদিন কৌশলে উত্থাপন করতে পেরেছিলুম আপনার প্রশ্ন। তিনি বললেন ঃ

'মহাশয়, অমন কথা বলবেন না। আপনাদের ঐ মায়াপুরুষটির মধ্যে আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি,—বিশুদ্ধ আভিজাত্য, অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য, অতিমানুষ প্রাণবল, অপরিমিত ঔদার্য, অত্যাশ্চর্য অস্ত্র-কৌশল, অনল্প শিল্প-জ্ঞান, অনুগ্রহসিক্ত হৃদয়, অসহনীয় তেজ, এবং অতি-দুর্ধর্ষ শত্রুঞ্জয় সাহস। এতগুলি গুণ তো দূরের কথা, মানুষের মধ্যে এদের একটিকেই খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। শত্রুর কাছে ইনি বর্ষপক্ক বেল-গাছ; বিনীতের কাছে ইনি সুগন্ধি চন্দন। মহাশয়, অশ্মকরাজ

নিজেকে একদা মনে করতেন মহানীতিজ্ঞ। তাঁকেও ইনি উন্মূলিত ক'রে···রাজকুমার ভাস্করবর্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন পৈতৃক পদে ;···এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ···কোথায়' ?"

নালীজঙ্ঘের মুখে এই শুভ সংবাদ পাওয়ার পর নানান ছলে আমি আর্যকেতুর আরও পরীক্ষা করলুম সততা। শেষে তিনি হলেন আমার পরামর্শদাতা সখা। আমি তখন ধীরে ধীরে সৃষ্টি করলুম কয়েকটি শুদ্ধসত্ত্ব অমাত্য এবং বহুরূপী প্রভৃত গুপ্ত-সেবক। তাঁদের সাহায্যে আমি গোপনে জেনে নিতে লাগলুম,···প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কে কে লুব্ধ, কে কে সমৃদ্ধ, কে উদ্ধত এবং কে প্রায়-বিদ্রোহী। তাঁদের দিয়েই আমি প্রচার করালুম অলুব্ধতা, উদ্ভাবন করলুম কণ্টক এবং ব্যর্থ করালুম শত্রুর চাতুরালি। এবং তাঁদের সাহায্যেই আমি অবিলম্বে স্থাপনা করলুম···স্বধর্মকর্মে চাতুবর্ণ্য। সমাহরণ করি অর্থ।

আজ হে রাজকুমার,···হে দিগ্বিজয়ী বীর, এইভাবেই এসেছে আমার অর্থযোগ, এবং আপনার আশীর্বাদে,···আমার সুখাবস্থান। রাজনৈতিক কর্মারম্ভের মূলই হচ্ছে···অর্থ। রাজনীতি ক্ষেত্রে দৌর্বল্যের চেয়ে মহাপাপ···আর নেই।

অসম্পূর্ণ গ্রন্থের সমাপ্তি

মহাকবি দণ্ডী

কথাকার মহাকবি 'দণ্ডী'র আবির্ভাব কাল নিয়ে পণ্ডিত সমাজে রয়েছে অন্তহীন মতান্তর। আচার্য উইলসন, পিটার-সন, বুহ্লার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং আগাশে, সুশীল-কুমার দে, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর প্রমুখ ভারতীয় বিদগ্ধজনের সমালোচনার সারসংক্ষেপ করলে দণ্ডীর কালসীমা গিয়ে দাঁড়ায় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

ভারতীয় সুধী সমাজে একটি সুপ্রচলিত প্রশংসাবাণী আছে, 'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্'। সুললিত শব্দবিন্যাসে, ভাষার পারিপাট্যে, রচনার মধ্যে রস ও লাবণ্য সঞ্চারে দণ্ডী ছিলেন সিদ্ধহস্ত। চরিত্র চিত্রণে, হাস্যরস পরিবেশনে, সমাজ-চিত্র অঙ্কনে মহাকবি দণ্ডীর ছিল অনায়াস দক্ষতা। তিনি তাঁর যুগের এক বিকারগ্রস্ত সমাজের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-চিত্র অঙ্কন করেছেন। কাহিনীর রস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই অসংযত সামাজিক জীবন-চিত্রগুলির স্বাদ আমাদের কাছে অসামান্য ও অভূতপূর্ব বলে মনে হয়।

এই পরিণত প্রজ্ঞাবান ও রসরসিক সাহিত্যস্রষ্টা সংস্কৃত সাহিত্য জগতের এক অনন্য কথাকাররূপে চিহ্নিত।

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মন্দাকিনীধারাকে যে সকল ভগীরথব্রতী অনুবাদক বাংলা ভাষার খাতে প্রবাহিত করে লাভ করেছেন অক্ষয় অমরতা, হর্ষচরিত, দশকুমার চরিত, কাদম্বরী, কুমারসম্ভব, ঋকবেদ প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর সেই কৃতকীর্তি অনুবাদকদের অন্যতম উত্তরাধিকারী। ঐতিহ্যবাহী ঠাকুর পরিবারের সন্তান তিনি। সাহিত্য শিল্পের দরদী পৃষ্ঠপোষক রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর তাঁর পিতা। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পে। পিতৃদত্ত প্রতিভা, ঠাকুর পরিবারের গুণাবলী তাঁকে দান করেছে দুর্লভ কলানৈপুণ্য।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রবোধেন্দুনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁদের কলকাতার ভদ্রাসনে। সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি কলেজীয় শিক্ষার গণ্ডি। কিন্তু চিরাচরিত অধ্যয়নধারা ধরে রাখতে পারেনি তাঁর প্রতিভাকে। তাই শিল্পে, সাহিত্যে, অভিনয়ে উৎসারিত হয়েছিল তাঁর সর্বজননন্দিত শতমুখী প্রতিভার প্রবাহ। জ্ঞানান্বেষণে তিনি ভ্রমণ করেছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, অবনীন্দ্র পরিষদ, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার, কর্মদক্ষতার সাক্ষ্যবাহী হয়ে আছে। এই প্রতিভাধর পুরুষের কাছ থেকে বাঙালী তার সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক বেশী প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে বিধাতার অমোঘ নিয়মে প্রবোধেন্দুনাথ পরলোক গমন করায় সে আশা আর পূর্ণ হলো না।

॥ ধর্মতত্ত্ব ॥

কৃষ্ণকথা চিরন্তনী—কালীপদ সরকার
মুখবন্ধ : শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
[ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান :
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] ১২.০০

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ—ডঃ সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত ১২.০০

সৎ চিৎ আনন্দময় [শ্রীঅরবিন্দ ভাষ্য]—
ডঃ সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত ৫.০০

রম্য রচনা ॥

রাস্তা—প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় [প্রাক্তন প্রধান
বিচারপতি : কলকাতা হাইকোর্ট] ৮.০০

নাট্য সঙ্কলন

উমাবনম্—গোপীনাথ নন্দী ১০.০০

॥ অপরাধ-বিজ্ঞান ॥

অপরাধ ও অপরাধী—ডঃ সুকুমার বসু
মুখবন্ধ : শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
[প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি : কলকাতা হাইকোর্ট] ১২.০০

●

॥ আমাদের আগামী প্রকাশন ॥

সমাজ সংস্থা আশা নিরাশা (২য় সংস্করণ)—অশোক মিত্র [প্রবন্ধ]

আরব্য রজনী (১ম, ৪র্থ থেকে ৯ম খণ্ডের ২য় মুদ্রণ ও
পরবর্তী খণ্ডসমূহ)—তারাপদ রাহা [গল্প-সংগ্রহ]

●